কৃষ্টি এবং সৃষ্টি

দেবেন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

সৃষ্টি প্রকাশন

কলকাতা-৯

'সৃষ্টি'র কথা

উনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় বইয়ের শতক। বিংশ শতাব্দীর গর্ব, তা নাকি ফিল্মের, আর একবিংশ শতাব্দী পূর্বচিহ্নিত হয়ে রয়েছে টেলিভিশনের জন্য। এই বাতাবরণে দাঁড়িয়ে একটা কথা এখন প্রায় স্লোগানে দাঁড়িয়ে গিয়েছে— বই আর কেউ পড়তে চায় না। ওটা সেকেলে অভ্যেস। বই পড়ুন, বই পড়ান— পোস্টার নিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের পদযাত্রা সেই ভাবনাকেই আরও উসকে দেয়।

আমরা কিন্তু এই ভাবনার শরিক নই। আমরা বিশ্বাস করি, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার আগুনে পুড়তে পুড়তেও ফিনিক্স পাখির মতো বেঁচে থাকবে, ডানা মেলে আকাশে উড়বে এবং দিগন্তের মৃত্তিকা স্পর্শ করবে বই। বিদেশে গ্রন্থপাঠের সাম্প্রতিক প্রবণতা আমাদের বিশ্বাসকেই বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করে। এই চিন্তা থেকেই জন্ম সৃষ্টি প্রকাশনের— সৃষ্টি পরিবারের প্রথম সন্তান। জন্মলগ্নেই যে শুনেছে প্রকাশকের কান্না, চোখ খুলেই যে অনুভব করেছে লেখকের হাহাকার। জ্ঞান হওয়ার আগেই যার মনে হয়েছে বাংলা প্রকাশন আজ মুমূর্ষু শিল্পের অন্তর্গত।

অথচ এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না। বাংলা ভাষায় সাহিত্যসেবীরা যে বিশ্ববন্দিত সে কথা আজ আর অজানা নয়। সেই সুমহান ঐতিহ্যকে মাথায় রেখেই সৃষ্টি প্রকাশন তাদের কাজ শুরু করেছে। আমাদের ব্রত বাংলা প্রকাশনা জগতের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনা। আমরা বিশ্বাস করি, যে জমি একদা সুফলা ছিল তা কখনও বন্ধ্যা হতে পারে না। দরকার যুগোপযোগী সার দিয়ে তাকে উর্বর করে তোলা, যাতে নবীন-প্রবীণ লেখকেরা শুধু তাঁদের সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধ থেকে লেখার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। বাকি দায়িত্ব তো আমাদের। আমরা মনে করি, বাংলা বইয়ের পাঠক ছিল, আছে, থাকবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি যাতে বাংলা প্রকাশনা জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে।

লেখকের কথা

বঙ্গীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে প্রধান তিন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব অবলম্বনে এই বই। তিনজনেরই আবির্ভাব সুমহান সেই উনবিংশ শতাব্দীতে। প্রথমজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র আর তৃতীয় মানুষটি রবীন্দ্রনাথ। এঁদের সৃষ্টিকর্ম বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই ; কিন্তু এঁদের সৃজনের পিছনে যে মন ও মনন নিত্য ক্রিয়াশীল তা-ই আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সাহিত্যরচনার মাধ্যমে কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই এঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। সাহিত্যসাধনা ও জ্ঞানান্বেষণের মাধ্যমে তাঁরা দেশের কৃষ্টি বা সংস্কৃতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁদের জীবনচর্যার মধ্যে সর্বদাই ছিল এই কালচার। শিক্ষায় সভ্যতায় সংস্কৃতিতে দেশের মানুষকে পরিমার্জিত ও সমৃদ্ধ করার ঐকান্তিক প্রয়াস ছিল তাঁদের চিন্তা ভাবনা ও কর্মসাধনার মধ্যে। এঁরা উনিশ শতকে জন্মগ্রহণ করলেও জাতিকে দেশকে দুই তিন শতক সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখতেন। কেবল নিজের কলমটুকু দিয়ে যে একটা দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করা যাবে না তা'ও তাঁরা বুঝেছিলেন ; আর তা বুঝেছিলেন বলেই মহর্ষি প্রকাশ করেন মাসিক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বঙ্কিম ছাপালেন বঙ্গদর্শন আর রবীন্দ্রনাথ সম্পাদন করলেন সাধনা। শুধু এই তিনটি মানুষ নন, এই মনস্বীত্রয়ীকে ঘিরে দেশের সমগ্র শিক্ষিত সমাজ ক্রমেই কৃষ্টিমনস্ক হয়ে উঠেছিল। সমষ্টির সেই সমৃদ্ধ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আজ এই একবিংশ শতাব্দীর মঞ্চে অনেকটাই যে শিথিল ঢিলেঢালা ও লঘু হয়ে গিয়েছে সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিক কালের তুলনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মেঘদূত' নিবন্ধে বলেছিলেন 'সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে।' বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি এক, আর সভ্যতা সংস্কৃতি আর এক। আমাদের কালের মনোবৃত্তি ও সংস্কৃতি যদি সত্যই অপভ্রংশতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে তবে তাকে রাজনীতি সরকার বা মন্ত্রীমহোদয়ের দ্বারা নয়—তাকে রক্ষা করার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার অবশ্যই সৃষ্টি ও কৃষ্টিশীল লেখক ও তাঁদের সাহিত্য এবং সাময়িকপত্র-পত্রিকা ও তার সম্পাদকমণ্ডলী। সাহিত্যের সরণী বেয়ে আজও আমরা শুভ্র সমুজ্জ্বল উনবিংশ শতাব্দীকে প্রত্যক্ষ করার অবকাশ পাই—সেখান থেকে বর্তমান আধুনিক কালে আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি তারও একটা দিশা পাওয়া যায়। মহর্ষির কর্মপ্রয়াসে, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় ভাবনায় এবং রবীন্দ্রনাথের মনস্বিতায় বঙ্গীয় কৃষ্টি ও মনন-আভিজাত্যের একটা সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে ওঠে। পিছনে ফেলে আসা সেই ছবিটাই খুঁজতে চেয়েছি আমার এই লেখাগুলির মধ্য দিয়ে।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

তত্ত্ববোধিনীর প্রকাশ ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ

'রামতনু! রামতনু!' নতুন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটি কপি হাতে নিয়ে কিছুটা বিস্মিত পুলকে সতীর্থ রামতনু লাহিড়ীকে ডেকে দেখালেন সুবিখ্যাত ডিরোজিয়ান, 'ইংরেজিওয়ালাদিগের অনভিসিক্ত রাজা—আনক্রাউন্‌ড কিং' — রামগোপাল ঘোষ।

বাংলা ভাষায় তখন পড়বার মত সামগ্রী বিশেষ কিছুই ছিল না। 'তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল ; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না।' [১] ' "রসরাজ", "যেমন কর্ম তেমনি ফল" প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও "প্রভাকর" ও "ভাস্করের" ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্রসকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত, যাহা ভদ্রলোক ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না।' [২]

ঠিক এইরকম এক সময়ে, দিনপঞ্জীর হিসেবে সার্ধশতবর্ষ পূর্বে, ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট (১৭৬৫ শকের ১ভাদ্র) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবর্তনায় তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হল মাসিক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

রামগোপাল ঘোষ রামতনু লাহিড়ীকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাটি দেখিয়ে সপ্রশংস কণ্ঠে বললেন— 'বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ।' [৩] শুধু তাই নয়, এ-কথা বলেই পত্রিকা থেকে তিনি আবার রচনাবিশেষ পড়ে শোনাতে লাগলেন বন্ধুকে। বাংলা ভাষায় ভাল লেখা পড়ার আনন্দ তাঁর চোখে-মুখে। শুধু নব্যপন্থী রামগোপাল রামতনু লাহিড়ীর দলই নয়, দলমত নির্বিশেষে দেশের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত মানুষই সেদিন আকৃষ্ট হয়েছিলেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই অভিনব বড় আয়তনের মাসিক পত্রিকাটির প্রতি—যে পত্রিকা নিজের অস্তিত্ব না হারিয়ে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল প্রায় একটি শতাব্দীকালব্যাপী।

কী ছিল এই পত্রিকায়? কেন কৌতূহলী ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন নতুন এই সাময়িকপত্রটির প্রতি তৎকালীন বিদ্বৎসমাজ? হঠাৎ এমন একটা পত্রিকার আবির্ভাবের কারণটাই বা কী ছিল সেদিন? শুধু যে কেবলই 'সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয়

চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র' [৪] তা-ই নয়, একটা দেশের এক-একটা সাময়িকপত্রের আবির্ভাবের পিছনেও থাকে সেই দেশের অবস্থা ও তার জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন এবং প্রভাব।

১৮১৫ সালে রামমোহন রায় 'আত্মীয় সভা' নামে একটি আলোচনা সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভায় শুধু যে শাস্ত্রীয় আলাপ-আলোচনা বেদপাঠ ব্রহ্মসংগীত প্রভৃতি হত তা-ই নয়, তা ছাড়াও জাতিভেদ সমস্যা, বালবিধবাদের সমস্যা, বহুবিবাহ সমস্যা, পৌত্তলিকতার সমস্যা ইত্যাদি সামাজিক নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হত। বলা যেতে পারে বাঙালীর উদ্‌যোগে প্রতিষ্ঠিত সভাসমিতির মধ্যে 'আত্মীয় সভা'ই সর্বপ্রথম। এই সভার সভ্যরা সকলেই ছিলেন রামমোহনের আদর্শের সঙ্গী ও সুহৃৎ। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও নন্দকিশোর বসু ছিলেন এই সভার সদস্য। এই দুই রামমোহন-অনুগামীর দুই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যখন একত্রিত হতে দেখি তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে গিয়েছে। বলা হয়নি, নন্দকিশোর বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন ডিরোজিও-পরবর্তী হিন্দু কলেজের যশস্বী ছাত্র রাজনারায়ণ বসু।

'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠার দু' বছর পরেই রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ প্রমুখের উদ্‌যোগে ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। দ্বারকানাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে রামমোহনের অনুরোধে এই হিন্দু কলেজে না দিয়ে রামমোহনের 'অ্যাঙ্গলো হিন্দু স্কুলে' ভর্তি করেন। স্বয়ং রামমোহন বালক দেবেন্দ্রনাথকে নিজের গাড়ি করে স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮২৬ থেকে ১৮৩০, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর নয় থেকে তের বছর বয়স পর্যন্ত রামমোহনের বিদ্যালয়ে পড়েন। এই সময়-পর্বে ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন প্রতিভাবান তরুণ ডিরোজিও সাহেব। হিন্দু কলেজের ছাত্র তথা ইয়ংবেঙ্গলদের উপর এই অসাধারণ শিক্ষকের অসামান্য প্রভাব ইতিহাসবিদিত। পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চা থেকে আহৃত যে যুক্তিবাদ ছাত্রেরা পেয়েছিলেন, তার দ্বারা প্রচলিত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার কাটিয়ে, ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ ও ধর্মের বিচার করতে অত্যুৎসাহী হয়ে উঠলেন নব্যবঙ্গের যুবকবৃন্দ। ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিবাদের আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করে বিভিন্ন বিষয়ে আরও মুক্তভাবে আলাপ-আলোচনা করার জন্য ১৮২৮ সালে ডিরোজিও তাঁর নিজের বাড়িতে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন করলেন—কলেজ চত্বরের বাইরে এক উদার উন্মুক্ত বিতর্ক সভাকেন্দ্র। ডিরোজিওর উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ ছাত্ররা হলেন রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী। রামগোপাল ঘোষ, এই অ্যাসোসিয়েশনেই ভবিষ্যতে ইংরেজি ভাষায় অসামান্য বক্তা হয়ে ওঠার প্রথম তালিম পেয়েছিলেন। 'সেখানে ইংরেজি ভাষায় ফোয়ারা ছুটত, দেশীয় বাংলা ভাষা বিশেষ আমল পেত না।' [৫] এই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনই ছিল ইয়ংবেঙ্গলদের আসল ট্রেনিং স্কুল। এই সভা থেকেই বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ডিরোজিওর ছাত্র তথা ডিরোজিয়ানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

চিৎপুর রোডে একটি বাড়ির বৈঠকখানা ভাড়া নিয়ে উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দুধর্মশাস্ত্র মন্থন করে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রামোহন রায় ১৮২৮-এর ২০ আগস্ট স্থাপন করেন ব্রাহ্মসমাজ। শুধু ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন নয়, সামাজিক বিষয়ে তাঁর আচার-ব্যবহার হিন্দু সমাজের লোকদের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে। কলকাতার বুকে সেদিন একই সময়ে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও অপরদিকে ইয়ংবেঙ্গল দলের অভ্যুদয়। সব মিলিয়ে মহানগরীর আবহাওয়ায় তখন উৎসাহ ও উদ্বেগ, সংগ্রাম ও সংশয়, ঐতিহ্যানুরাগ ও সংস্কারমুক্তির অস্থিরতা।

বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর। ১৮৩০-এর ১৭ জানুয়ারি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মিশনারি, রামমোহন ও ডিরোজিওর শিষ্য সম্প্রদায়ের হাত থেকে সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে স্থাপন করলেন 'ধর্মসভা'। ২৩ জানুয়ারি ব্রাহ্মসভাকে রামমোহন নবনির্মিত গৃহে স্থাপন করেন। জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনামন্দির রূপে এর প্রতিষ্ঠা ঘটল। এ দিকে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে এ-বছর ২৭ মে তারিখে কলকাতায় সস্ত্রীক এসে পৌছলেন মিশনারি পাদ্রী আলেকজান্ডার ডাফ্।

পূর্বেই বলেছি বালক দেবেন্দ্রনাথ ১৮২৬-১৮৩০ রামমোহনের অ্যাঙ্গলো হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৮৩০-এর ১৯ নভেম্বর বিলেত যাত্রা করেন রামমোহন। এর অল্প পরেই নতুন বছরের জানুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সংবাদ প্রভাকর প্রকাশিত হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাক্রমে ডিরোজিওকে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হতে হয় এ-বছর। ২৫ এপ্রিল ১৮৩১ তিনি হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন।

ওই বছরে এর অল্প পরেই দেবেন্দ্রনাথ ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। বছর তিন-চার সেখানে পড়েন।

১৮৩২-এর ২৫ মে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকরের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৭ অক্টোবর খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ডিরোজিওর শিষ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন এমন জনরব উঠেছিল যে, হিন্দু কলেজের সব ভাল ভাল ছাত্রই বুঝি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবেন।

ডিরোজিওর ছাত্র নন দেবেন্দ্রনাথ। ডিরোজিও প্রবর্তিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিপত্তি লক্ষ্য করেই যেন পাল্টা একটা পরিষদ গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করলেন দেশী সংস্কৃতির অনুরাগী বাংলা ভাষানুরাগী হিন্দু কলেজের ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ—বয়স তখন সবেমাত্র পনের। অ্যাঙ্গলো হিন্দু স্কুলের দুই প্রাক্তন ছাত্র—দেবেন্দ্রনাথ ও রামমোহন-পুত্র রমাপ্রসাদ—হিন্দু কলেজে পাঠকালে ১৮৩২-এর ৩০ ডিসেম্বর অ্যাঙ্গলো হিন্দু স্কুলে 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' স্থাপন করলেন। এ সভা ছিল সম্পূর্ণরূপে ছাত্রদের একটি বিদ্বৎসভা। সম্পাদক হন দেবেন্দ্রনাথ, সভাপতি রমাপ্রসাদ

রায়। বঙ্গভাষানুশীল ও তার সমৃদ্ধির প্রয়াসই হয় এ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। সভার প্রথম অধিবেশনেই সভ্যদের জানানো হয় যে, 'এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত হয় নাই' বলেই এরূপ একটি সভা স্থাপনের প্রয়োজন হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বললেন, 'ইহা চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা হইতে পারিবেক এক্ষণে ইংগ্লন্ডীয় ভাষা আলোচনার্থ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তত্তৎ সভার দ্বারা উক্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব মহাশয়েরা বিবেচনা করুন গৌড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার্থ এই সভা সংস্থাপিত হইলে সভ্যগণেরা ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন।' সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, 'বঙ্গভাষা ভিন্ন এ সভাতে কোন কথোপকথন হইবেক না।' [৬]

পনের বছরের যে কিশোর ছাত্রাবস্থায় বাংলা ভাষার প্রেমে কলকাতা মহানগরীর বুকে গৌড়ীয় বিদ্যাচর্চার জন্য এমন একটি বঙ্গীয় সমিতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, একমাত্র তাঁর পক্ষেই বুঝি সম্ভব ছিল এর সাত বছর পরে ১৮৩৯-এ তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করা এবং তার চার বছর পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবর্তন। মনের কোন্ অনুরাগ কোন্ বাসনা কোন্ স্বপ্ন যে একদিন তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার রূপ নিয়ে দেখা দিল, তার ইতিহাস খুঁজতে গেলে বাংলা বিদ্যানুরাগী ও ঐতিহ্যানুরাগী সেই কয়েকটি তরুণের গড়া 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা'র কথা বিস্মৃত হলে চলবে না।

এই সভা প্রতিষ্ঠার ঠিক পরের ডিসেম্বরে, ১৮৩৩-এর ২৭ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডে রামমোহন রায়ের প্রয়াণ ঘটে।

দেবেন্দ্রনাথের চেয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তিন বছরের ছোট। তরুণ ছাত্র যখন বাংলা ভাষার উন্নতির আকাঙক্ষায় সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত, তখন অন্যদিকে কবিযশপ্রার্থী বালক অক্ষয়কুমার বিদ্যাচর্চার ফাঁকে আদিরসাত্মক কবিতা রচনায় আত্মমগ্ন। ১৮৩৪-এ মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর কবিতাপুস্তক 'অনঙ্গমোহন' প্রকাশিত হয়। সে সময় কলকাতায় সাধারণ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সমাজে বিদ্যাসুন্দর জাতীয় গ্রন্থের সবিশেষ সমাদর। বালক অক্ষয়কুমার কাব্যরচনাকর্মে তাকেই সেদিন আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টিকর্মের এই পথ পরিত্যাগ করতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। অধুনালুপ্ত এটিই তাঁর প্রথম ও শেষ কাব্যগ্রন্থ।

অনঙ্গমোহন প্রকাশের বছর পাঁচেক পরে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই অক্ষয় দত্তের পরিচয় করিয়ে দেন দৈনিক সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত।

সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকর প্রথম পর্যায়ে এক বছর কয়েক মাস চলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাপ্তাহিকের প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৮৩১-এর ২৮ জানুয়ারি। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংবাদ প্রভাকর আবার ছাপা হয় ১৮৩৬-এর ১০ আগস্ট থেকে। এবার পত্রিকাটি হল বারত্রয়িক, অর্থাৎ সপ্তাহে তিনটি করে সংখ্যা। এভাবে তিন বছর চলে ১৮৩৯-এর ১৪ জুন তারিখ থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্ররূপে সংবাদ প্রভাকর মুদ্রিত হতে থাকে।

এই বছর, ১৮৩৯-এর ৬ অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হয়।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তর পরিচয় তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হওয়ার আগে থেকেই হয়েছিল। দ্বারকানাথের সঙ্গেও ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ পরিচয় ছিল।

'অনঙ্গমোহন' কাব্যের রচয়িতা অক্ষয়কুমার দত্তকে গদ্যশিল্পীরূপে আবিষ্কারের প্রথম কৃতিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের। তিনিই পরে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই গদ্যশিল্পীর পরিচয় ঘটান। প্রভাকরের আর্টিকেল রচয়িতা একদিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত করেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কথা প্রসঙ্গে প্রথমেই তত্ত্ববোধিনী সভার কথা আসে। কারণ এই পত্রিকাটি ছিল মুখ্যত ওই সভার মুখপত্র। তাই পত্রিকার পাতায় প্রবেশের পূর্বে একবার সভাস্থলে যাওয়া যাক।

১৮৩৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ অধ্যয়ন শুরু করেন। এই অধ্যয়নের ফলে তিনি অমৃতাস্বাদন লাভ করেন, তা অপরকে বিতরণের জন্য তাঁর চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখনও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগ হয়নি। রামমোহনের বিলেত যাত্রার পর থেকেই ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা শোচনীয় হতে থাকে। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও আর কয়েকজনের পৃষ্ঠপোষকতায় মুমূর্ষু সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। এই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকায় উপনিষদ-বেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য তিনি নিজেই একটি নূতন সভা প্রতিষ্ঠার আন্তরিক আকুলতা অনুভব করেন। প্রথমে নিজের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও ভাইদের নিয়ে একটি সভা স্থাপন করেন। সভার নাম রাখা হয় 'তত্ত্বরঞ্জিনী'। প্রথম দিনে সভার সভ্যসংখ্যা ছিল দশ। পরে ক্রমেই তা বাড়তে থাকে। তত্ত্বরঞ্জিনী সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে মুমূর্ষু ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে নিয়ে আসা হয় এবং তাঁকে এই সভার আচার্যপদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি সভার নূতন নাম দেন 'তত্ত্ববোধিনী'। নূতন নামে ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন, ৬ অক্টোবর ১৮৩৯ তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ বলেন, 'ইহার উদ্দেশ্য, আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্তে-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম।...বেদান্তদর্শনকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না ; যে-হেতুক, তাহাতে শঙ্করাচার্য জীব আর ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে। যদি উপাস্য উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহার উপাসনা করিবে? অতএব বেদান্তদর্শনের মতে আমরা মত দিতে পারিলাম না। আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী।'[৭]

শুধু ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই সভার দান অসামান্য। সভার প্রায় সূচনাকাল থেকেই এর সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। সভা প্রতিষ্ঠার মাস দুয়েকের মধ্যেই ১৭৬১ শকের ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৮৩৯ সালের ৪

ডিসেম্বর ঈশ্বর গুপ্ত এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন।

প্রভাকরের প্রতিভাবান জ্ঞানানুরাগী মনস্বী তরুণ লেখক অক্ষয়কুমার দত্তকে এক সন্ধ্যায় তত্ত্ববোধিনী সভায় নিয়ে এসে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন প্রভাকর-সম্পাদক। তাঁর উৎসাহে অক্ষয় দত্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য হন ১৭৬১ শকের ১১পৌষ, ১৮৩৯-এর ২৮ ডিসেম্বর।

সভার কার্যধারা প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'The Tattwabodhini Sabha used to hold weekly and monthly meetings. Papers were read and discussed at the weekly meetings and divine service used to be held once a month.' [৮]

তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠার পরেই ১৮৪০-এর জুনে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা নামে কলকাতায় এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 'তাহাতে ছাত্রদিগকে রীতিমত বেদান্ত শিক্ষা দেওয়া যাইত। তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব এই যে, যখন দেশের শিক্ষিত দলের মধ্যে প্রতীচ্যানুরাগ প্রবল, সকলেই পশ্চিমদিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তখন তিনি এ দেশের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পত্তির প্রতি মুখ ফিরাইলেন ; এবং বেদ বেদান্তের আলোচনার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। তিনি ধর্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু আপনার কার্যকে জাতীয়তারূপে ভিত্তির উপর স্থাপিত রাখিতে ব্যগ্র হইলেন। এই বিশেষত্ব তিনি চিরজীবন রক্ষা করিয়াছেন।' [৯]

তত্ত্ববোধিনী পাঠাশালার উদ্দেশ্য ছিল, 'ইংরাজি ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খ্রিস্টীয় ধর্মকে পৈতৃক ধর্মরূপে গ্রহণ—এই সকল সাংঘাতিক ঘটনা নিবারণ করা, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় প্রকার শিক্ষা প্রদান করা।'

১৮৩৯-এর ডিসেম্বরে সভার সদস্যপদ গ্রহণ, আর ছয় মাসের মধ্যেই ১৮৪০-এর জুনে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক-পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। দেবেন্দ্রনাথ যে ১৮৪৩-এর আগস্টে অক্ষয় দত্তকে মাসিক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার দিয়েছিলেন তা কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্তপ্রসূত ঘটনা নয়। কেবল একটি রচনা পরীক্ষা করেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পিত উচ্চাঙ্গের একটি পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচন করে ফেলেছিলেন—ঘটনাটা শুধু এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে। রচনা পরীক্ষাটা মনে হয় একটা ফর্মালি ব্যাপার ছিল!

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক অক্ষয় দত্তকে ১৮৪০ ডিসেম্বরে দেখি বিজ্ঞানদায়িনী সভায় 'এদেশ ইংরাজদিগের হস্তগত হওয়াতে বাঙ্গালিরা সুখি কি না' বিষয়ের মুখ্য বক্তারূপে। ভাষণটি সেই সময়ের সংবাদ প্রভাকরে মুদ্রিত হয়েছিল। এই ভাষণের মধ্য দিয়েই যুক্তিবাদী অক্ষয় দত্তের সঙ্গে আমরা প্রথম পরিচয়ের সুযোগ পাই। বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, মুসলমান রাজত্ব অপেক্ষা ইংরেজ রাজত্বে দেশে ন্যায় নীতি শৃঙ্খলার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 'আনন্দের বিষয় ইংরাজের অধিকারে সুনিয়ম স্বরূপ অস্ত্র

দ্বারা এই সমুদয় কণ্টকবন এতদ্দেশ হইতে প্রায় উচ্ছিন্ন হইয়াছে, দেশময় সুচারু পথ সমূহ নির্ম্মাণ এবং স্থানে স্থানে বাজার হাট গঞ্জ প্রভৃতি সংস্থাপিত হওয়াতে পথিকেরা দেশের সকল স্থানেই প্রায় অনায়াসে গতি ও অবিস্থিতি করিতে পারেন, তবে শান্তিরক্ষা যদিস্যাৎ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হয় তথাচ পূর্ব্বাপেক্ষা অধুনা লোকেরা স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে কালযাপন করিতেছে তাহারদিগের মনোমধ্যে দিবসে ডাকাইতি ও বর্গির হ্যাঙ্গামা ক্ষণকালের নিমিত্ত আর জাগরুক হয় না।' [১০]

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার আনুকূল্যে মুদ্রিত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত প্রথম বাংলা গদ্যপুস্তক—বিজ্ঞানের বই 'ভূগোল' প্রকাশিত হয় ১৮৪১ সালে। বলা যায় অক্ষয় দত্তই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দেশীয় সমাজে সজ্জিত করেছিলেন এবং তিনিই মুখ্যত প্রথম বাঙালী যিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। 'ভূগোল' গ্রন্থে পৃথিবীর আকৃতি, পরিমাণ, গোলত্ব, জলস্থলের বিবরণ, বিভিন্ন মহাদেশের প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক বিবরণ এবং আদিবাসীদের ধর্ম ও ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। [১১]

বইয়ের ভূমিকায় গ্রন্থকার লেখেন, 'ইদানীং দেশহিতৈষি মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদ্দ্বারা বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়।' এই জন্য লেখক বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্বক বহু ইংরেজি গ্রন্থ মন্থন করে সরল বোধগম্য সুশিক্ষার উপযোগী এই ভূগোল গ্রন্থ রচনা করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে গ্রন্থকার লেখেন, 'এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়া উপায়াভাবে কিয়ৎকাল অপ্রকটিত ছিল। পরে তত্ত্ববোধিনী সভা বিশেষরূপে সুপ্রসন্না হইয়া স্বীয় বিত্তব্যয় দ্বারা ইহাকে প্রকাশিত করত যে প্রকার কৃপা বিতরণ করিলেন, তাহাতে সাহসপূর্ব্বক কহিতে পারি, উক্ত সভার এরূপ অনুগ্রহ না হইলে এই পুস্তক সাধারণ-সমীপে কদাচ এরূপে উদিত হইতে পারিত না ; অতএব চিত্তমধ্যে এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরূক রাখিয়া, তাহার কৃপামূল্যে বিক্রীত থাকিলাম।' [১২]

এই আনুকূল্যের কথা তিনি যে জীবনভর মনে রেখেছিলেন—তা অনুভব করা যায় পরবর্তী পর্যায়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সম্পাদকের অকল্পনীয় ও অনন্য কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে।

তত্ত্ববোধিনী সভার সাংবাৎসরিক উৎসব ১৮৪১-এর ১৪ সেপ্টেম্বর খুব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রি ঠিক আটটায় অনুষ্ঠান শুরু হয় ; এবং বেদপাঠ বক্তৃতা ব্যাখ্যা ও সংগীতে অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত দুটো বেজে যায়। বহু লোক সমাগম হয়েছিল এই সমাবেশে। বেদপাঠ শেষ হয় রাত দশটায়। তারপর দেবেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতে উঠে বলেন, 'এইক্ষণে ইংলন্ডীয় ভাষার আলোচনায় বিদ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই, এবং এতদ্দেশস্থ লোকের মনের অন্ধকারও অনেক দূরীকৃত হইয়াছে।

এইক্ষণে মূর্খ লোকদিগের ন্যায় কাষ্ঠ লোষ্ট্রেতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া তাহাতে পূজা করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। বেদান্তের প্রচার অভাবে, ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য-স্বরূপ, সর্বগত, বাক্য মনের অতীত, ইহা যে আমাদের শাস্ত্রের মর্ম, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। সুতরাং আপনার ধর্মে এ প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান না পাইয়া অন্য ধর্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্রে তাহা অনুসন্ধান করিতে যায়। তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় আছে যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কেবল সাকার উপাসনা ; অতএব এ প্রকার শাস্ত্র হইতে তাহাদিগের যে শাস্ত্র উত্তম বোধ হয়, সেই শাস্ত্র মান্য করে। কিন্তু যদি এই বেদান্ত-ধর্ম প্রচার থাকে, তবে আমাদিগের অন্য ধর্মে কদাপি প্রবৃত্তি হয় না। আমরা এই প্রকারে আমাদিগের হিন্দুধর্ম রক্ষায় যত্ন পাইতেছি।' [১৩]

এই সভায় অক্ষয় দত্তও বক্তৃতা করেন।

দ্বারকানাথ বিলাত যান ১৮৪২-এর ৯ জানুয়ারি। এই বছর দেবেন্দ্রনাথ অবসন্ন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি ভাবলেন, 'যখন ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মোপাসনার জন্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন ইহার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার যোগ দিলে আমাদের সংকল্প তো আরও অনায়াসে সিদ্ধ হইবে।' [১৪] এইরূপ চিন্তা করে এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের মিলন ঘটান। সেটা ১৮৪২-এর এপ্রিল মাস।

ওই মাসেই প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ The Bengal Spectator নামে ইংরেজি-বাংলা এক দ্বিভাষিক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। 'এই পত্রে নব্য যুবকদল সাধ মিটাইয়া আপনাদের উদার মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন।' [১৫] পাঁচ মাস মাসিক পত্রিকারূপে চলে সেপ্টেম্বর থেকে পাক্ষিক, এবং ১৮৪৩ মার্চ থেকে সাপ্তাহিক হয়ে নভেম্বরে বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৪৩-এর জুন মাসে একদিকে দেখি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু ; অন্যদিকে দেখি বাংলা ভাষায় নূতন একখানি মাসিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। টাকী-নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় অক্ষয়কুমার দত্ত 'বিদ্যাদর্শন' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন এই জুন (আষাঢ়) মাসে। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়—

'এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্দ্বারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্ত্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে, যত্নপূর্ব্বক নীতি ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক।' [১৬]

বিদ্যাদর্শন পত্রিকা মাত্র ছয় মাস চলেছিল। প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারের আদর্শ সুপরিচালিত এই পত্রিকার প্রতিটি রচনায় সুপরিস্ফুট। [১৭]

দ্বারকানাথের বিলেত যাত্রার কথা কিছু আগেই বলেছি। সেই বিলেতে বসেও বাংলাদেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তাঁর মনের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায়। বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রের ১ নভেম্বর ১৮৪২ সংখ্যার একটি সংবাদের কিছু অংশ উদ্ধৃত করি :

'শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর আগস্ট মাসে স্কটলন্ড দেশ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন ; এডেনবর নগরের কৌন্সেলিরা এক মহাসভা করিয়া উক্ত বাবুর যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়াছেন এবং তত্রস্থ ম্যাজিস্ট্রেট ও কৌন্সেলিরা নূতন পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়া এবং লার্ড প্রবোষ্ট সাহেব ঐ বাবুর সুখ্যাতির বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া তাঁহাকে নগরবাসির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, এবং বাবুও উত্তম বক্তৃতা করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তিনি কহিয়াছেন যে আমার শ্রোতারা আমাকে যে সম্ভ্রম প্রদান করিলেন ইহাই আমার জন্মদেশের উপকারের চিহ্নস্বরূপ, এবং যাহাতে বাঙ্গালা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় এতাদৃশ কর্ম্মে তাঁহারা উৎসাহী হইবেক, এমত যদি জানিতে পারি তবে আপনকারদিগের দত্ত এই সম্ভ্রমকে অতিশয় কিস্মতীয়রূপে গণনা করিব।' [১৮]

প্রিন্স দ্বারকানাথের এই জন্মভূমিপ্রীতি এই দেশানুরাগ পরে বংশানুক্রমে তাঁর পরিবারে সঞ্চারিত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

অক্ষয় দত্তের বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় দেখি, শেষ তিন সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর) ধারাবাহিক মুদ্রিত হচ্ছে দ্বারকানাথ লিখিত বিলাত যাত্রাকালীন মনোরম পত্রভ্রমণবৃত্তান্ত। এই তিন সংখ্যায় মোট নয়টি দীর্ঘ চিঠি মুদ্রিত। সূচনায় সম্পাদক লিখেছেন, 'শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ইউরোপ গমনকালীন পথিমধ্যে স্থান স্থান হইতে যে সকল পত্র কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন, তৎসমুদয় দেশস্থ লোকের মনোরঞ্জন অথচ জ্ঞানদায়ক হইবেক, এজন্য আমরা ঐ সকল লিপি অনুবাদ পূর্ব্বক আমারদিগের পত্রের একধারে ক্রমশ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।' [১৯]

সম্পাদকীয় নোট থেকে মনে হয় এই তর্জমা স্বয়ং সম্পাদকের। মনে হয় কলকাতায় প্রেরিত দ্বারকানাথের পত্রগুলি অক্ষয় দত্ত দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে পেয়ে থাকবেন।

শুধু সংবাদ প্রভাকরের আর্টিকেলে নয়, ভূগোল পুস্তকের পাতায় নয়, তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতাতে নয় ; অক্ষয়কুমার দত্তকে দেবেন্দ্রনাথ আরও একবার আবিষ্কার করার সুযোগ পেলেন পিতার লেখা পত্রাবলীর সুদক্ষ তর্জমাকর্মের মধ্য দিয়ে।

১৮৪২ ডিসেম্বর থেকে বিদ্যাদর্শনের প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। আর ওই মাসে বিলেত থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন স্বয়ং দ্বারকানাথ।

ইতিমধ্যে ২ অক্টোবর তত্ত্ববোধিনী সভার আর একটি সাংবাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। 'তদ্দিবসীয় সভাতে প্রথমত সভাপতি শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদান্ত দর্শনের প্রতি বক্তৃতা করেন, তৎপরে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা করণের আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন।' [২০] এবার বক্তা হিসেবে অক্ষয় দত্তকে পাই না। তিনি কি তখন তাঁর নিজের পত্রিকার সংকটে খুবই ব্যস্ত ছিলেন? সে-রকমটা হওয়া অসম্ভব নয়। নভেম্বরের পর ওই পত্রিকা চালানো আর তাঁর সম্ভব হয়নি।

॥ দুই ॥

'১৮৪৩ সাল বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয়।' [২১] শিবনাথ শাস্ত্রীর এই কথাটা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছরের গোড়ায় ৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিলেন মধুসূদন দত্ত ; আর বছর শেষ না হতে ২১ ডিসেম্বর (১৭৬৫ শক ৭ পৌষ) তারিখে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। আর এই বছরেরই মাঝামাঝি, ১৬ আগস্ট (১ ভাদ্র ১৭৬৫ শক) তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র মাসিক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হল অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায়। ইতিমধ্যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলকাতা থেকে বাঁশবেড়ে গ্রামে উঠে গেছে ৩০ এপ্রিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কী ছিল? কী ভেবেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ?

'আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না ; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি।' [২২]

পত্রিকার জন্য তখন একজন সম্পাদক নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিল। কে সম্পাদক হবেন? স্থির করা হল 'বেদান্ত ধর্মানুযায়ী সন্যাস ধর্মের ও সন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করে দেবেন্দ্রনাথের কাছে পাঠাতে হবে। যাঁর রচনা সর্বোৎকৃষ্ট হবে তাঁকেই এই সম্মানিত পদের দায়িত্বভার দেওয়া হবে। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু রচনা পরীক্ষা করে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয় দত্তকেই এই পদের জন্য নির্বাচিত করেন। এই পদ 'গ্রন্থ-সম্পাদকতা' বলে অভিহিত হত।

দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ওই কার্যে নিযুক্ত করিলাম।' [২৩] পত্রিকা সম্পাদনার কাজে সেদিন অক্ষয়চন্দ্রের জন্য বেতন ধার্য হয়েছিল মাসে তিরিশ টাকা। ক্রমে এই বেতন বৃদ্ধি পেয়ে পঁয়তাল্লিশ হয়ে শেষে ষাটে পৌঁছয়। এই সময়ের অন্য একটি পত্রিকার সম্পাদকের বেতনের সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্য অক্ষয় দত্তের মাসিক এই অর্থ-প্রাপ্তিকে খুব 'অধিক বেতন' বলতে পারি না। ১৮৫১ সালে কলকাতার ভার্নাকিউলার লিটারেচার কমিটি থেকে মাসিক 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' প্রকাশিত হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সম্পাদক করে। এজন্য ওই কমিটির কাছ থেকে

রাজেন্দ্রলাল মাসে মাসে আশি টাকা পেতেন।

যাই হোক, সম্পাদকরূপে অক্ষয়কুমার দত্তকে পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ খুশি হন।

'অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। ...আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহাঁর দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব।...ফলতঃ, আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনা সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল ; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।' [২৪] 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল ; তাহা কেবল এক অক্ষয় বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।' [২৫]

ধর্মচর্চা মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এই পত্রিকা সাহিত্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান জীবনী অর্থনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ ও আলোচনাদি নিয়মিত প্রকাশ করে বাংলা সাংবাদিকতা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নূতন পথ প্রদর্শন করে।

সম্পাদক অক্ষয় দত্ত সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, 'তত্ত্ববোধিনী সম্পাদনা ভার গ্রহণ করাতে যে মানুষ যে কার্যের উপযোগী যেন তাঁহার হস্তে সেই কার্যই আসিল। ...তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা কি ছিল, অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না।' [২৬]

সেই সময় পত্রিকার জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন, 'People, all over Bengal, awaited every issue of that paper with eagerness.' [২৭]

এ সবই সম্ভব হয়েছিল অক্ষয় দত্তের অসামান্য সম্পাদকীয় দক্ষতার জন্য। তরুণ এই সম্পাদকের মধ্যে ছিল Encyclopeadic একটা বিশ্বগ্রাসী জ্ঞানানুশীলনের আকাঙ্ক্ষা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনকালে তিনি অতিরিক্ত বিদ্যার্থী রূপে মেডিকেল কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেন।

অক্ষয় দত্ত সম্পাদক হলেন, আর তাঁকে সাহায্য করার জন্য একটা Paper Committee বা প্রবন্ধ নির্বাচনী সভার ব্যবস্থা করলেন দেবেন্দ্রনাথ। পাঁচজন সদস্যের এই কমিটি। সদস্যদের 'গ্রন্থাধ্যক্ষ' নামে অভিহিত করা হত। বিভিন্ন সময়ে এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ। বিদ্যাসাগর ১৮৪৮ সালে এই সভার সদস্য হন। সম্পাদক অক্ষয় দত্তও এই পেপার কমিটির সদস্য ছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী নামে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বড় আয়তনের মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ বঙ্গ সংস্কৃতির পক্ষে ছিল এক পরম শুভক্ষণ। দুই কলামে অতিশয় পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচির

মুদ্রণ ও প্রকাশন এই পত্রিকা। প্রথম সংখ্যায় পৃষ্ঠা ছিল আট। পরবর্তী কালে পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রয়োজনানুসারে বৃদ্ধি পায়। পত্রিকার নাম-লেটারিংও অত্যন্ত পরিশীলিত সুগঠিত ও দৃষ্টিনন্দন। এই অক্ষরবিন্যাসের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট আভিজাত্যের লক্ষণ প্রকটিত।

পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার সম্পাদকীয়তে বিবৃত হয়েছে।

প্রথম অনুচ্ছেদটি এই :

'কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎপত্রিকার সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এস্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।' [২৮]

বস্তুতপক্ষে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে পত্রিকা প্রকাশ বিষয়ে যে অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করে গেছেন, সেই অভিপ্রায়ের কথাগুলিই পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিবৃত।

প্রথম এক বছরের মত পরিকল্পনা নিয়ে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল।

'এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন এক বৎসর কাল পর্যন্ত প্রতি মাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এবং তাহারদিগের বন্ধুগণের মনোরঞ্জন করিবেন। যদি তাহারদিগের স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া যাইবেক।' [২৯]

যে-পত্রিকা দ্বিতীয় বছরে পা দেবে কিনা সে-বিষয়ে পত্রিকা-পরিচালকদের মনে শঙ্কা সংশয় ছিল, সেই পত্রিকা যে এই ক্ষণজীবী সাময়িকপত্রের দেশে প্রায় একটা শতাব্দী জুড়ে মাসে মাসে প্রাকশিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করল—তা আর তাঁরা দেখে যেতে পারেননি।

পরবর্তী কালে এই পত্রিকা যাঁরা বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনা করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি নাম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ মোট চার বছর (১৯১১ এপ্রিল—১৯১৫এপ্রিল)[৩০] এই মাসিকপত্র সম্পাদন করেছিলেন।

পত্রিকার প্রথম বছরের আট মাস পেরতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চলছে এবং চলবে। ১৭৬৬ শক বৈশাখের সম্পাদকীয় নিবন্ধে পাঠকদের জানান হল :

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অদ্য নূতন বৎসরে সংপ্রবেশ করিলেন।...এদেশে কোন বিষয়, যাহা সাধারণ সাহায্যের প্রতি নির্ভর করে তাহা সম্পন্ন হওয়া যে কিরূপ দুষ্কর তাহা সকলেরই বিদিত আছে। এই হেতু এ পত্রিকা প্রকাশের ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কৃতকার্য্য না হইবার প্রতি অত্যন্ত আশঙ্কা হইয়াছিল, এবং কেবল তজ্জন্য ইহার পরমায়ু এক বৎসর নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞান হইতেছে যে সে আশঙ্কার সময় অন্ত

হইতেছে, এবং বিদ্যালোচনার বাহুল্য দ্বারা লোকের অন্তঃকরণে প্রচুর রূপ জ্ঞানের উদ্রেক হইতেছে। অতএব ভরসা হয় যে স্বদেশীয় লোকের সাহায্য দ্বারা ইহা জীবনের পূর্ব্ব সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দীর্ঘায়ু প্রদানে শক্য হইব।' [৩১]

১৭৬৫-৬৬ শকে (১৮৪৩-৪৫ খ্রি) অর্থাৎ প্রথম দুই বছরে পত্রিকাটি হয়ে উঠেছিল তত্ত্ববোধিনী সভার প্রায় একান্তই মুখপত্র। ধর্মতত্ত্ব ও বেদান্তের চিন্তাভাবনা চর্চা, তত্ত্ববোধিনী সভায় বা ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত ভাষণের প্রতিমুদ্রণ, প্রাসঙ্গিক সংবাদাদি প্রকাশ প্রধানত এই সকল ছিল পত্রিকার প্রথম দুই বছরের মুদ্রিত বিষয়।

পত্রিকার একেবারে প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচী কেমন ছিল দেখা যেতে পারে।

পত্রিকা প্রকাশের ভূমিকা পৃ-১, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান পৃ-২, ঐ পৃ-৩, বংশবাটী গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপন বিষয়ে 'শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা' পৃ-৪, বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করা গৃহস্থ ব্যক্তির কর্তব্য পৃ-৬, রামমোহন রায় বাজসনেয়-সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক পৃ-৭-পৃ-৮।

দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা ছিল পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ।

আশ্বিন ১৭৬৫ শক (সেপ্টেম্বর ১৮৪৩) সংখ্যায় মুদ্রিত অক্ষয় দত্তের ভাষণ মূল্যবান। কলকাতা থেকে উঠে বংশবাটীগ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দ্বিতীয় বক্তা অক্ষয় দত্তের প্রদত্ত তেজস্বী ভাষণ এই সংখ্যায় মুদ্রিত। বিদেশী প্রভাব ও সকল বিষয়ে অনুকরণপ্রিয়তা বিষয়ে বক্তা গভীর খেদ প্রকাশ করেন। কার্ত্তিক সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে, কথোপকথনের মাধ্যমে আলোচনা। তা ছাড়া ধর্মবিষয়ক অন্যান্য লেখা। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এই প্রথম একটি রচনা প্রকাশিত হয় লেখকের নামোল্লেখ সহ। ইতিপূর্বে কোনো স্বাক্ষরিত রচনা তত্ত্ববোধিনীতে বেরয়নি। তবে স্বাক্ষর সম্পূর্ণ নয় ; আদ্য অক্ষর—অ. কু. দ. লেখা। বলা বাহুল্য ইনি স্বয়ং সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত। এই প্রবন্ধে পৃথিবীর সৃষ্টিকৌশলের মধ্যে স্রষ্টার অসীম জ্ঞানের পরিচয়ের কথা বিধৃত। তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্তের প্রথম স্বাক্ষরিত রচনা হিসেবে লেখাটি মূল্যবান।

১ পৌষ (১৭৬৫ শক, ডিসেম্বর ১৮৪৩) প্রকাশিত হল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম বছরের পঞ্চম সংখ্যা। এই সংখ্যায় স্বদেশীয় বিজ্ঞ যুবকদের প্রতি উপদেশ, জগতের আশ্চর্য রচনা, রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক, সত্য বিষয়ক বক্তৃতা, যৌবনকাল বিষয়ে লেখা ও পরমেশ্বরের অশরীরী বিষয়ে মন্তব্য। এর মধ্যে একমাত্র যৌবনকাল বিষয়ক রচনাটি স্বাক্ষরিত—লেখক অ. কু. দ.—অক্ষয়কুমার দত্ত।

এই মাসের ৭ তারিখ—৭ পৌষ দিনটি সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয়। এই ৭পৌষ (১৭৬৫ শক, ২১ ডিসেম্বর ১৮৪৩) বৃহস্পতিবার দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয় দত্ত প্রমুখ তৎকালীন একুশজন বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার দিনটির ছবি মহর্ষির কলমে সুন্দর ধরা পড়েছে :

'তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই একদিন, আর অদ্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের এই আর এক দিন! ১৭৬১ শক [১৮৩৯ খ্রি] হইতে ক্রমে ক্রমে আমরা এত দূর অগ্রসর হইলাম যে, অদ্য ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলাম। এই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া আমরা নূতন জীবন লাভ করিলাম। আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে?'

'ব্রাহ্মসমাজে এ একটা নূতন ব্যাপার। পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম ব্যতীতও ব্রহ্ম লাভ হয় না। ধর্মেতে ব্রহ্মেতে নিত্য সংযোগ। সেই সংযোগ বুঝিতে পারিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলাম। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া আমরা ব্রাহ্ম হইলাম, এবং ব্রাহ্মসমাজের সার্থক্য সম্পাদন করিলাম।' [৩২]

অবিস্মরণীয় ৭ পৌষের দীক্ষা গ্রহণের ওই দিনটি রবীন্দ্রনাথের রচনায় গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে:

'একদিন যাঁর চেতনা বিলাসের আরামশয্যা থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল—এই ৭ই পৌষ দিনটি সেই দেবেন্দ্রনাথের দিন। এই দিনটিকে তিনি আমাদের জন্যে দান করে গিয়েছেন। রত্ন যেমন করে দান করতে হয় তেমনি করে দান করেছেন।...সেই সাধকের জীবনের ৭ই পৌষকে আজ উদ্‌ঘাটন করার দিন, সেই নিয়ে আমরা আজ উৎসব করি।

'এই ৭ই পৌষের দিনে সেই ভক্ত তাঁর দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন ; সেই দীক্ষার যে কতবড়ো অর্থ আজকের দিন কি সে কথা আমাদের কাছে কিছু বলছে? সেই কথাটি না শুনে গেলে কী জন্যেই বা এসেছি আর কী নিয়েই বা যাব?'

'সেই যেদিন তাঁর জীবনে এই ৭ই পৌষের সূর্য একদিন উদিত হয়েছিল, সেই দিনে আলোও জ্বলেনি, জনসমাগমও হয়নি—সেই শীতের নির্মল দিনটি শান্ত ছিল, স্তব্ধ ছিল। সেই দিনে যে কী ঘটছে তা তিনি নিজেও সম্পূর্ণ জানেননি, কেবল অন্তর্যামী বিধাতা পুরুষ জানছিলেন।'

'সেই যে দীক্ষা সেদিন তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেটি সহজ ব্যাপার নয়। সে শুধু শান্তির দীক্ষা নয়, সে অগ্নির দীক্ষা। তাঁর প্রভু সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, "এই যে জিনিষটি তুমি আজ আমার হাত থেকে নিলে এটি যে সত্য—এর ভার যখন গ্রহণ করেছ তখন তোমার আর আরাম নেই, তোমাকে রাত্রিদিন জাগ্রত থাকতে হবে। এই সত্যকে রক্ষা করতে তোমার যদি সমস্তই যায় তো সমস্তই যাক। কিন্তু সাবধান, তোমার হাতে আমার সত্যের অসম্মান না ঘটে!"... এই দীক্ষা শুধু যে দুর্দিনের দারুণ আঘাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছিল, তা নয়—প্রলোভনের দারুণতর আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিল।' [৩৩]

১৭৬৭ শক থেকে (১৮৪৫ খ্রি) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শুধু একটি বিশেষ সভার মুখপত্র মাত্রই হয়ে সীমাবদ্ধ রইল না, সে-পত্রিকা একটি বহুবিষয়িনী সচিত্র আদর্শ সাময়িক পত্রিকার রূপ গ্রহণ করল। সচিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহের অনেক পূর্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মাসিক সচিত্র পত্রিকা রূপে নিজেকে প্রকাশ করে সাময়িকপত্রের ইতিহাসে স্বীয়

কীর্তি স্থাপন করে গিয়েছে। বিজ্ঞানকে বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় করে তোলার পিছনে অক্ষয়কুমার দত্ত ও তাঁর সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দান অসামান্য। আজও যে বাংলা সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক-পত্রগুলিতে বিজ্ঞানচর্চার একটা গুরুত্ব দেখি তার সূচনা দেড়শ বছর আগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রথম ঘটেছিল। এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবৎকালপর্বে যখনই সে একান্তই ধর্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, তখনই সে সাধারণ পাঠকসমাজের কৌতূহল ও আকর্ষণ হারিয়েছে। অক্ষয় দত্ত এই পত্রিকাকে এমন একটি সুরে বেঁধে দিয়েছিলেন, যাকে বলা যায় আধুনিক অভিজাত সাময়িকপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত।

অক্ষয় দত্তের সম্পাদনাপর্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূল্যবান ব্যাখ্যা পাই সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি লেখায় :

'পরিবর্ত্তন সময়ের লোকে যে, শুদ্ধ নিজে নিজে সকল কার্য্য করিতেন এমত নহে, তাঁহাদের সমবেত কার্য্যও ছিল। এই সমবেত কার্য্যের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রধান। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তত্ত্ববোধের জন্য তত্ত্ববোধিনী মাসিক পত্রিকা প্রচার হয়। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, ও দেশের বহুবিধ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তখন এখনকার মত একটিমাত্র সভার কাগজ হয় নাই, উহা তখন সমস্ত বাঙ্গালায় ইয়ুরোপীয়ভাব প্রচারের মিসনরি ছিল, উহা ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসমূহ সম্বন্ধে কত যে নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা যাঁহারা তত্ত্ববোধিনীর আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন।' [৩৪]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন এই প্রবন্ধ লেখেন তখনো দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন নি। হরপ্রসাদের প্রবন্ধটি রচনাকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। অক্ষয় দত্তের সম্পাদকতায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল, বিদ্যারত্ন সম্পাদিত পত্রে সে ঐতিহ্যের গৌরব রক্ষিত হয়নি। পাঠকের উপরে একটি দীর্ঘজীবী পত্রিকার প্রভাবের হ্রাসবৃদ্ধি তো সময়ের পরিবর্তনে ঘটবেই। তা তো অনিবার্য।

প্রত্যেক সাময়িকপত্রের জীবনেই এক-এক সময়পর্বে এক-একজন প্রধান লেখকের আবির্ভাব ঘটে—যিনি শুধু যে সেই পত্রিকাটিকেই এগিয়ে নিয়ে যান তাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁর কাল ও দেশকেও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন। সাময়িকপত্রের মাধ্যমে আধুনিক যুগে বাংলা ভাষায় জ্ঞানের আলো জ্বেলেছিলেন সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর সম্পাদনপর্বে (১৮৪৩-১৮৫৫ খ্রি) তিনিই ছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মুখ্য লেখক, সর্বাধিক আকর্ষক গদ্যশিল্পী। তাঁর যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মন সাধারণ বাঙালীকে বুদ্ধির জগতে পৌঁছতে ক্রমে সহায়তা করেছে। তাঁর প্রদর্শিত সাময়িকপত্রের পথটিকে ক্রমে প্রশস্ততর রাজপথে পরিণত করেছেন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ও পরে -পরে আরো অনেক কৃতী সম্পাদক। বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ছিলেন প্রধান লেখক, রবীন্দ্রনাথের সাধনা পত্রিকায় যেমন

রবীন্দ্রনাথ, তেমনি অক্ষয় দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনীতে অক্ষয় দত্তকেই দেখি সর্বাধিক ব্যস্ত লেখকের ভূমিকায়।

তত্ত্ববোধিনীতে অক্ষয় দত্ত কর্তৃক বিজ্ঞান আলোচনার প্রকৃত সূত্রপাত ১৭৬৭ শক (১৮৪৫ খ্রি) থেকে। ওই বছরের আশ্বিন সংখ্যায় প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ে একটি ছোট রচনা প্রকাশিত হয়, নাম 'সিন্ধুঘোটক'। প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা সিন্ধুঘোটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই রচনাটি। এই বছরেই আরও একটি বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হল পৌষ সংখ্যায়, নাম 'বনমানুষ'। এই দুটি রচনাই পরবর্তী কালে অক্ষয় দত্তের বিখ্যাত 'চারুপাঠ' গ্রন্থে মুদ্রিত হয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে। এর পর থেকে অক্ষয় দত্তের সম্পাদনকালের মধ্যে তত্ত্ববোধিনীর পাতায় তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয় ; এবং তার একটি প্রধান অংশ হল বিজ্ঞান।

১৭৭৪ শকের (১৮৫২ খ্রি) তত্ত্ববোধিনীতে তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার আধিক্য ঘটে। বৈশাখে 'বিসুবিয়স নামক আগ্নেয়গিরি', জ্যৈষ্ঠে 'পুরুভুজ', আষাঢ়ে 'জলপ্রপাত', শ্রাবণে 'বীবর', আশ্বিনে 'উষ্ণপ্রস্রবণ', কার্ত্তিকে 'বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম' ইত্যাদি রচনা পর-পর পাই।

১৭৭৫ শক ভাদ্র সংখ্যায় (১৮৫৩ খ্রি) তত্ত্ববোধিনীতে 'চারুপাঠ প্রথমভাগ' প্রকাশের বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ :

'বিজ্ঞাপন

চারুপাঠ

চারুপাঠের প্রথম ভাগ প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার মূল্য আট আনা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।'

চারুপাঠ প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার লেখেন, 'চারুপাঠের প্রথম ভাগ প্রস্তুত ও প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থ যে নানা ইংরাজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত, ইহা বলা বাহুল্য। যে সকল প্রস্তাব হইতে সংগৃহীত হইল, তাহার অধিকাংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এবং একটি প্রস্তাব প্রভাকর পত্রে প্রথম প্রকটিত হয়। অবশিষ্ট কয়েকটি বিষয় নূতন রচিত হইয়াছে।'

চারুপাঠের দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪-তে এবং তৃতীয় ভাগ ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত তাঁর অনেক রচনাই এই তিন খণ্ডেই সংকলিত। পাঠ্যপুস্তক রূপে মুখ্যত বিজ্ঞানভিত্তিক এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ছিল সেকালে অভূতপূর্ব।

ধর্ম বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রধান ব্যাখ্যাকার ও কথক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পত্রিকার প্রথম থেকেই তিনিও এর অন্যতম প্রধান লেখকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তবে লেখার কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন অক্ষয় দত্ত এবং রাজনারায়ণ বসু।

১৭৬৭ শকের গোড়া (১৮৪৫ খ্রি) থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খ্রিস্টান পাদরিদের সঙ্গে প্রচণ্ড বাক্‌যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ

সরকারের চোদ্দ বছরের ভাই উমেশচন্দ্রকে এবং উমেশচন্দ্রের এগার বছরের বালিকা বধূকে জোর করে ধরে খ্রিস্টধর্মের দীক্ষা দেন পাদরি ডাফ্। এটা ১৭৬৭ শকের বৈশাখের (১৮৪৫ এপ্রিল-মে) ঘটনা।

ক্রুদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

'ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত খ্রীষ্টান করিতে লাগিল! তবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম, এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল।' [৩৫]

অক্ষয় দত্ত তাঁর কলম দিয়ে লিখলেন, 'অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ-নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব!' [৩৬]

দুটি বালক-বালিকার এই ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনাকে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনারূপে না দেখে, তাকে স্বধর্মের প্রতি মিশনারিদের পরিকল্পিত আঘাত রূপে দেখলেন তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠী। এর প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজন আন্দোলন। দেবেন্দ্রনাথ তা অনুভব করলেন।

একদিকে পত্রিকায় অক্ষয় দত্তের প্রবন্ধ প্রকাশিত হল, আর একদিকে দেবেন্দ্রনাথ 'কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত মান্য লোকদিগের নিকট যাইয়া' হিন্দুসন্তানদের যাতে আর পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে যেতে না হয় তার জন্য রাতদিন চেষ্টা করতে লাগলেন। এই সূত্রে তত্ত্ববোধিনীকে কেন্দ্র করে রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেব ও ডিরোজিয়ান রামগোপাল ঘোষ সকলে একত্র হলেন। দেশের ছেলেরা যাতে বিনা বেতনে দেশীয় বিদ্যালয়ে বিদ্যানুশীলন করতে পারেন তার চেষ্টায় সকলেই সমবেতভাবে উদ্‌যোগী হলেন দেবেন্দ্রনাথের আহ্বানে। ২৫ মের (১৮৪৫ খ্রি) মহাসভায় সহস্র মানুষের সমাগম হল। 'হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার জন্য সেই দিনই নানাজনে মিলিয়ে চল্লিশ হাজার টাকা অনুদানের প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর পাওয়া গেল।

যোগেশচন্দ্র বাগল ঠিকই বলেছেন, 'ইহাকে শুধু একটি বিদ্যালয় বলিলে ভুল করা হইবে। ইহা বাস্তবিক পক্ষে সে সময়ের একটি আত্মরক্ষামূলক আন্দোলনেরই প্রতীক।' [৩৭]

বিদ্যালয়টি কলকাতার চিৎপুর রোডে স্থাপিত হল ১৮৪৬ সালের ১ মার্চ। ষাট টাকা মাসিক বেতনে যুবক ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু নানা কারণে বিদ্যালয়টি দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারেনি।

দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলেত যান ১৮৪৫-এর মার্চে। ১৮৪৬-এর ১ আগস্ট ইংল্যান্ডে তাঁর মৃত্যু হয়। শোক সংবাদ কলকাতায় এসে পৌঁছয় মাস দেড়েক পরে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি।

এই '১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস এমনি সময়ে' তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদকের কর্মে রাজনারায়ণ বসু ষাট টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। [৩৮]

দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক পিতা দ্বারকানাথের অপৌত্তলিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নিয়ে তৎকালে ঠাকুর পরিবারের মধ্যে তথা সমাজে এক আন্দোলন দেখা দেয়, যার ফলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতাগুলিকেও সেই সময় আন্দোলিত হতে দেখি।

এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করার জন্য দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞাতিভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর 'Justicia' ছদ্মনামে ২২ অক্টোবর ১৮৪৬-এর Englishman পত্রে দেবেন্দ্রনাথকে তত্ত্ববোধিনী সভার সভাপতি বলে সম্বোধন করে 'পৌত্তলিক' রূপে কঠোর সমালোচনা করেন। অভিযোগে তিনি বলেন শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানটাই হল একটা পৌত্তলিক অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দেবেন্দ্রনাথ একান্তভাবেই পৌত্তলিকপন্থী হয়েছেন। রামমোহন তো মাতৃশ্রাদ্ধ করতে সম্মত হননি, তবে দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক এই পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন কেন? অতঃপর Englishman পত্রে দেবেন্দ্রনাথ ও 'Justicia' জ্ঞানেন্দ্রমোহনের উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে থাকে। এই ইংরেজি বাদানুবাদ Englishman পত্রিকা থেকে তত্ত্ববোধিনীর পাতায় পুনর্মুদ্রিত হয় তত্ত্ববোধিনীর পাঠকদের কাছে বিষয়টি তুলে ধরবার জন্য। পত্রিকার ১৭৬৮ অগ্রাহয়ণ (১৮৪৬ নভেম্বর) সংখ্যায় ৩৭৯ থেকে ৩৮৪ পৃষ্ঠায় তা ছাপা হয়। ওই সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী বেশ স্ফীত —পৃষ্ঠা সংখ্যা চব্বিশ।

রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, 'আমি দেবেন্দ্রবাবুর পক্ষে ইংলিশম্যান পত্রে ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম।' [৩৯]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষ থেকে 'প্রেরিত পত্র' ও জবাবে 'সম্পাদকের উক্তি' প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। মুখ্যত ধর্ম ও পরমেশ্বর বিষয়ক প্রশ্নোত্তরেরই প্রাধান্য। এই পর্যায়ে অক্ষয় দত্তের বেশ কিছু রচনা উদ্ধার করার অবকাশ আছে বলে মনে করি।

অক্ষয় দত্তের বিখ্যাত রচনা ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থের অনেক অংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নানা সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, সচিত্র। তত্ত্ববোধিনীতে এই বিষয়ক তাঁর প্রথম রচনাটি প্রকাশিত হয় ১৭৬৮ শকের ভাদ্র (আগস্ট ১৮৪৬) সংখ্যায় ৩২৫-৩৩১পৃষ্ঠায়। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় পরে দুই খণ্ডে (প্রথম ভাগ ১৮৭০, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩ খ্রি) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় ('১৭৯২ শকাব্দ', ১৮৭০ খ্রি) অক্ষয় দত্ত লেখেন, 'ন্যূনাধিক ২২ বাইশ বৎসর অতীত হইল, এই পুস্তকের অনেকাংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকটিত হয়।' [৪০] বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন, তত্ত্ববোধিনীতে অক্ষয় দত্ত উপাসক সম্প্রদায় শুরু করেন 'প্রায় ১৮৪৭-৪৮ সালে'। [৪১] বিনয় ঘোষ সম্ভবত এরূপ অনুমান করেছেন অক্ষয় দত্তের ভূমিকায় 'ন্যূনাধিক ২২ বাইশ বৎসর' কথাটির উপর নির্ভর করে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হল ১৮৪৬ আগস্টে, ১৭৬৮ শকের ভাদ্রের তত্ত্ববোধিনীতে উপাসক সম্প্রদায়ের সূত্রপাত।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রিকা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য জগতে এক নূতন মাত্রা লাভ করে। এই প্রবন্ধাবলীর পরিকল্পনায় হোরেস হেম্যান্ উইলসনের Sketch On The Religious Sects of The Hindus পুস্তকটির প্রেরণা থাকলেও এর মধ্যে অক্ষয় দত্ত মৌলিক গবেষণা অনুসন্ধান ও নূতন

ইতিহাস নির্মাণের যে নিদর্শন রেখে গেছেন তা ছিল আশ্চর্য অভিনবতার পরিচায়ক। শাস্ত্রীয় সীমার বাইরে, মানবজীবনরসের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের যে একটি জীবন্ত রূপ আছে—তার পরিচয় আছে উপাসক সম্প্রদায় নিবন্ধাবলীতে। কোনো প্রথাসিদ্ধ শাস্ত্রীয় আলোচনা নয়, ভারতীয় জনজীবনের মধ্যে আচরিত যে ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাস, তারই পটভূমিতে উপাসক সম্প্রদায়ের পরিচিতি এই রচনাসমূহের উপজীব্য। অক্ষয় দত্তের অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণার আশ্চর্য নিদর্শন এই প্রবন্ধাবলী।

ভাদ্রের (১৭৬৮ শক, ১৮৪৬ খ্রি) তত্ত্ববোধিনীতে উপাসক সম্প্রদায়ের সূচনার পূর্বে শ্রাবণের তত্ত্ববোধিনীতে সম্পাদক তুলে ধরেন 'কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা'র ক্ষুব্ধ করুণ চিত্র।[৪২] তারই সামান্য অংশ—

'এইক্ষণকার বিদ্বান্ নামে খ্যাত যাঁহারা, তাঁহারদিগের দ্বারা উপকার না হউক, অপকার নানা প্রকারে হইতেছে। তাঁহারা স্বদেশের আচার ব্যবহারকে অগ্রাহ্য করিয়া ইংলন্ডীয় লোকের দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করিতেই শিক্ষা করেন। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারদিগের উত্তম ব্যবহার সকলকে গ্রহণ না করিয়া যদ্দ্বারা অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা এমত আচরণ সকলের অনুবর্ত্তি হইতেই অভ্যাস করেন। সম্প্রতি মদিরা পানের দৃষ্টান্ত তাঁহারদিগের বিনাশের হেতু হইয়াছে। তাঁহারা প্রথমতঃ অল্প পরিমাণে এই ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েন, পরে লোভ সংবরণে অসমর্থ প্রযুক্ত ক্রমাগত উপভোগ দ্বারা তাহাতে প্রগাঢ় আসক্ত হইয়া এককালে মোহাচ্ছন্ন এবং হত জ্ঞান হয়েন। মদিরা পানে যাহার আসক্তি, তাহার দ্বারা কোন দুষ্কর্মের অসম্ভাবনা হয়? শুভকর্ম্মের প্রবৃত্তিই বা তাহার কি প্রকারে হইতে পারে? ব্যক্ত করিতে অশ্রুপাত হয় যে কলিকাতার প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের কত সুশিক্ষিত ছাত্র এই মোহকারি দুষ্কর্মে মুগ্ধ হইয়া অবশেষে ব্যভিচার প্রভৃতি কুব্যবহার দ্বারা মনুষ্য নামের অযোগ্য হইয়াছে।'

পূর্বে বলেছি, এই বছর উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের জন্য দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে নিযুক্ত করেন। উপনিষদের শ্লোক দেবেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করতেন ও সেইগুলি ইংরেজিতে তর্জমা করতেন রাজনায়ারণ বসু। এই তর্জমা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এই সময় থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পেপার কমিটি বা প্রবন্ধনির্বাচনী সমিতির কথা আগে উল্লেখ করেছি। ১৭৭০ শকের ২৩ শ্রাবণ (আগস্ট ১৮৮৪) অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে পত্রিকার পেপার কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

এই পেপার কমিটির কাজকর্ম কি-রকম ছিল তার কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত তুলে ধরা গেল 'অক্ষয়চরিত' বই থেকে [৪৩] :

'কবিরপন্থিদিগের বৃত্তান্তবিষয়ক [অক্ষয় দত্তের উপাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ] পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি। যথাবিহিত অনুমতি করিবেন। নিবেদনমিতি।

তত্ত্ববোধিনী সভা — অক্ষয়কুমার দত্ত।

১৪ আশ্বিন, ১৭৭০ [১৮৪৮ খ্রি] — গ্রন্থ-সম্পাদক।

প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরম পরিতোষ পাইলাম। ইহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব পত্রিকায় প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম। ইতি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত পাণ্ডুলেখ্যর স্থানে স্থানে যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়ছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

প্রেরিত পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশযোগ্য।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।'

দেখা গেল, সম্পাদকের নিজের লেখা কিভাবে পেপার কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এবার দেখব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহাভারত অনুবাদ পত্রিকায় প্রকাশের যোগ্য বলে কিভাবে পেপার কমিটি সুপারিশ করছেন :

'শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গ ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া তাহার এক অংশ প্রেরণ করিয়াছেন দৃষ্টি করিবেন। আপনারা দেখিবেন তাহা অতি সুচারু শুদ্ধ ভাষায় পরিপাটীরূপে লিখিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া পাঠকেরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন এবং পত্রিকার বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে পারিবেক। এতদ্ভিন্ন আমাদিগের পূর্ব্বকার আচার-ব্যবহারাদির যেরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় এমত আর কুত্রাপি নাই, অতএব এই বাঙ্গালা অনুবাদ দ্বারা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সন্ধায়ি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগেরও উপকার হইবেক। নিবেদনমিতি।

তত্ত্ববোধিনী সভা — অক্ষয়কুমার দত্ত।

২৬ পৌষ, ১৭৭০ (১৮৪৯ খ্রি) — গ্রন্থ-সম্পাদক।

গ্রন্থ-সম্পাদক মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন ইহা অবশ্য প্রকাশ কর্ত্তব্য।

শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।

অতি সুললিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং ভরসা করি এইরূপ প্রকাশ ক্রমশঃ হয়, তাহা হইলে অনেক উপকার সম্ভাবনা।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

এতদ্রূপ মহাভারতের অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে অতি লোকপ্রিয় করিবেক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।'

দেবেন্দ্রনাথের রচনাও পেপার কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হত।

১৭৭০ শকের মাঘ (১৮৪৯ জানুয়ারি) থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শুরু হল অক্ষয়কুমার দত্তের নূতন আর-একটি ধারাবাহিক রচনা 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। একদিকে যখন চলছে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নিয়ে অক্লান্ত গবেষণা

ও ইতিহাস নির্মাণের প্রয়াস, তখনই তাঁর বিজ্ঞানমুখী মন আর একদিকে মানবপ্রকৃতির সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ বিচারে উৎসাহী হয়ে উঠল। এই রচনা সেদিনের শিক্ষিত মানুষের উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত কবিতাও লিখেছিলেন সে সময়। এই ধারাবাহিক রচনা গ্রন্থাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগ (পৃষ্ঠা ২৯১) ৮ পৌষ ১৭৭৩ শকে (১৮৫১ খ্রি), এবং দ্বিতীয় ভাগ (পৃষ্ঠা ২৮৯) ১০ মাঘ ১৭৭৪ শকে (১৮৫৩ খ্রি) প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগ প্রকাশের পূর্বেই তত্ত্ববোধিনীতে অক্ষয় দত্ত স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে দেখি :

'বিজ্ঞাপন

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

এই গ্রন্থ বিশিষ্টরূপ সংশোধন পূর্ব্বক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা যাইতেছে। প্রথম ভাগের মূল্য দুই টাকা। কোন বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ একেবারে অধিক খণ্ড গৃহীত হইলে ১॥ [দেড়] টাকা মূল্যেও দেওয়া যাইতে পারে। যিনি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।' [৪৪]

'বাহ্যবস্তু'র দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনও তত্ত্ববোধিনীতে বেরিয়েছিল গ্রন্থপ্রকাশের পরের মাসেই। দ্বিতীয় ভাগের মূল্যও দুই টাকা, বিদ্যালয়ের জন্য একসঙ্গে অনেক খণ্ড কিনলে দেড় টাকা।

কী বলতে চেয়েছেন অক্ষয় দত্ত তাঁর এই নবরচিত বিজ্ঞানমনস্ক রচনাটিতে? কী আছে এই লেখার মধ্যে যা দেবেন্দ্রনাথের মনের উপরেও বিশেষরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল?

অক্ষয়কুমারের নিজের কথা দিয়েই এই বইয়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারি। পুস্তকের প্রথম ভাগের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত করছি :

'দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে, তাহা সম্যক্ রূপে অবগত না থাকাতে, মনুষ্য অশেষ প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি পূর্ব্বাবধি নানা দেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম-প্রযোজক পণ্ডিতেরা এবিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অদ্যাপি ভূমণ্ডল রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অতএব, এবিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা একান্ত যত্নপূর্ব্বক প্রচার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।'

'শ্রীযুক্ত জর্জ কূম্ব সাহেব-প্রণীত 'কান্‌স্‌টিটিউশন্ অব ম্যান্' [The Constitution of Man Considered in Relation to External Objects] নামক গ্রন্থে এবিষয়ে সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। তিনি নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। জগদীশ্বর কি প্রকার নিয়ম-প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন

করিতেছেন, এবং কোন্ নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার হয়, ও কোন্ নিয়ম অতিক্রম করিলে কি প্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ গ্রন্থে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয় লোকের গোচর করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, বাঙ্গলা ভাষায় তাহার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক এক এক প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সমস্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া অনেকেই অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকটিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তদনুসারে, পুনর্ব্বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। ইহা ইংরেজি পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসংগত ও উপকারজনক, কিন্তু এদেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে যে সকল উদাহরণ এদেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। এদেশের পরম্পরাগত কুপ্রথা সমুদায় মধ্যে মধ্যে উদাহরণ স্বরূপে উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে।' [৪৫]

এই যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক জ্ঞানতাপস সম্পাদক অক্ষয় দত্ত সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, 'তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম, এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম ; কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ ; আর, তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ ; —আকাশ পাতাল প্রভেদ!' [৪৬]

এইখানেই মহর্ষির মহত্ত্ব, এইখানেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অসামান্যতা। পত্রিকার সূচনাপর্বের প্রথম দিকে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয় দত্তের উপরে হয়তো কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই এই চিন্তাশীল যুক্তিবাদী মানুষটি তাঁকে অভিভূত করে এবং পরে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতের উপরে অক্ষয় দত্তের প্রভাবই অনেকটা কার্যকর হতে দেখা যায়। ইচ্ছা করলে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মচিন্তার একান্ত অনুরক্ত সুহৃৎ, রাজনারায়ণ বসুকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভার দিতে পারতেন, অক্ষয় দত্তের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কখনই তাঁর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ওইরূপ সংকীর্ণভাবে কাজে লাগাতে চাননি। দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্য ও অনুমোদন না থাকলে এ পত্রিকা কখনই এমন আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার ধারক ও বাহক হয়ে উঠতে পারত না। এমন কি অক্ষয় দত্ত দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়েছেন 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থটির পরিমার্জনের কাজে। অক্ষয় দত্ত নিজে এ-কথা বইয়ের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। ফলত স্বাধীন মত প্রকাশ ও যুক্তি তর্ক চিন্তা ভাবনা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার একটা আদর্শ মঞ্চ হয়ে উঠেছিল সেদিনের মাসিক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

অক্ষয় দত্তের যুক্তিবাদী মন কিভাবে দেবেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছে সে-বিষয়ে মূল্যবান বিবৃতি পাই শিবনাথ শাস্ত্রীর আলোচনায় :

'অক্ষয়বাবু আর একটি মহৎ কার্য সংসাধন করিয়াছিলেন, যে জন্য তাঁহার নাম

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার প্রকৃতি অগ্রে বর্ণন করিয়াছি, তিনি সহজে স্বীয় অবলম্বিত কোনও মত বা কার্যপ্রণালী পরিবর্তন করিতেন না। শীঘ্র কিছু অবলম্বন করিতেন না, করিলে শীঘ্র ছাড়িতেন না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, ঈশ্বরালোকে, বহু পরীক্ষার পর কর্তব্য নির্ণয় করতেন ; এবং একবার যাহা নির্ণীত হইত তাহা হইতে সহজে বিচলিত হইতেন না। সুতরাং তাঁহাকে বেদান্তধর্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয়বাবুকে বহু প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সাহায্যে "ব্রাহ্মধর্ম" নামক গ্রন্থ সংকলিত হইল ; ইহা চিরজীবন মহর্ষির ধর্মজীবনের পরিণত ফল স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।'[৪৭]

আমরা দেখেছি ১৮৪৮ আগস্টে বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পেপার কমিটির সদস্য হন। এর কয়েক মাস পরে সংবাদ প্রভাকরে মুদ্রিত 'বন্ধু হইতে প্রাপ্ত' শীর্ষক একটি পত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রভাকরে মুদ্রিত পত্রে 'দেশহিতৈষি তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ মহাশয়কে বিশেষ নিবেদন' পূর্বক বলা হয়েছে, 'তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাকে ম্রিয়মানাবস্থা হইতে পুনর্জীবিত করিতে বাঞ্ছা করেন তবে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহাদিগের লেখক মধ্যে মনোনীত করুন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ লিখিতে হয় তাহা অনেকে জ্ঞাত হইবেন, নচেৎ বিলাতি বাঙ্গালা ব্যবহার করিলে কেবল ভাষাকে বধ করা হয়।'[৪৮]

সংবাদ প্রভাকরে চিঠিটি মুদ্রিত হয় এপ্রিলে, কিন্তু সেটি কত তারিখে লেখা সে-সংবাদ আমাদের হাতে নেই। এ কথাটা উল্লেখ করছি এই কারণে যে তত্ত্ববোধিনীতে বিদ্যাসাগরকে লেখকরূপে আবির্ভূত হতে দেখি ১৭৭০ শকের ফাল্গুন (১৮৪৯ ফেব্রুয়ারি) থেকেই। তবে সে আবির্ভাব ছিল তর্জমাকারের ভূমিকায়। দীর্ঘ চার বছর প্রায় ধারাবাহিকভাবে 'মহাভারত আদিপর্ব'-এর বিদ্যাসাগর-কৃত অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

তত্ত্ববোধিনীতে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' চলাকালেই ১৭৭৩ শকের আষাঢ় (১৮৫১ জুন) সংখ্যা থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্তের নূতন ধারাবাহিক বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা 'পদার্থবিদ্যা'র প্রকাশ শুরু হয়। বাংলা ভাষায় সুপরিকল্পিতভাবে পদার্থবিজ্ঞান লিখবার সার্থক প্রয়াস এই রচনার মধ্যেই প্রথম পাওয়া যায়। যদিও মূলত ইংরেজি ভাষায় লেখা এই বিষয়ক গ্রন্থই এর মুখ্য অবলম্বন।

'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ শক শ্রাবণে (১৮৫৬ খ্রি)। 'উহার এক এক অংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়'—এ কথা বইয়ের ভূমিকায়

গ্রন্থকার জানিয়েছেন। সে যুগে বইটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রথম প্রকাশের এক বছরের মধ্যে এর অষ্টম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়।[৪৯] সেদিনের বিদ্যালয়সমূহে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা দেখে অবাক হতে হয়। তবে সবচেয়ে কৌতূহল ও বিস্ময়ের বিষয় হল পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বেই এই সব রচনা সেদিনের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছিল সরাসরি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকেই অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্বাচন করার ফলে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সে হুগলী কলেজের বিদ্যালয় শাখায় পড়বার সময় অক্ষয় দত্ত সম্পাদিত এক বছরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ১৮৫৩-র জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষার পাঠ্যতালিকার মধ্যে পেয়েছিলেন।[৫০] সে বছর পরীক্ষা পাঁচ মাস পিছিয়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত (Supplementary) পাঠ্যরূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৭৪ শকের বৈশাখ থেকে চৈত্র (১৮৫২-৫৩ খ্রি) সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই সময়টা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু বিষয়ক রচনার মুখ্য লেখকের ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৭৭৪ শকের (১৮৫২-৫৩ খ্রি) তত্ত্ববোধিনীতে একই সঙ্গে ছাপা চলছে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ধর্মনীতি, পদার্থবিদ্যা এবং স্বতন্ত্র বিজ্ঞানভিত্তিক সচিত্র প্রবন্ধ—বিসুবিয়স্ নামক আগ্নেয়গিরি (১৭৭৪ বৈশাখ), পুরুভুজ (জ্যৈষ্ঠ), জলপ্রপাত (আষাঢ়), বীবর (শ্রাবণ), উষ্ণপ্রস্রবণ (আশ্বিন), বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম (কার্ত্তিক), এবং ব্রুব্রুল পুষ্প (মাঘ)। এই সব প্রবন্ধাবলী পরে অক্ষয় দত্তের চারুপাঠ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অক্ষয় দত্তের এই শ্রেণীর প্রবন্ধ পত্রিকায় ১৭৭৫-৭৬ শকাব্দেও প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সময়টা তত্ত্ববোধিনীর জন্য অক্ষয় দত্তকে যাকে বলে দু'হাতে লিখতে দেখি। তাঁর পৌত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'লিখিতে আরম্ভ করিলে, অক্ষয়কুমারের সংজ্ঞা থাকিত না। লিখিতে লিখিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত, চাকরেরা বাতি জ্বালিয়া খাবার রাখিয়া, দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া, প্রস্থান করিত। হুঁস নাই। প্রভাতে পত্রিকা সম্পর্কীয় কর্মচারীরা নিয়মিত সময়ে কার্যালয়ে আসিয়া দেখিত, খাবার পড়িয়া আছে, অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার জন্য "অক্ষয় যশের মালা" রচনা করিতে ব্যস্ত।'[৫১]

আর এক সত্যেন্দ্রনাথ—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন, 'অক্ষয়বাবুর একটা উঁচু standing desk ছিল। ঘরের মধ্যে পদচারণা করতেন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখতেন।'[৫২]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে অক্ষয় দত্তের শেষ দিকে বেতন হয় পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট টাকা। বই বিক্রি থেকে কি-রকম টাকা আসত জানি না। তাঁর আর্থিক অবস্থা কোনো সময়েই খুব ভাল ছিল না। এরই মধ্যে দেখি তাঁর গৃহভৃত্য তাঁর ঘর থেকে সোনার গহনা ও টাকাকড়ি চুরি করে পালিয়েছে। কী করেন! পুলিশ দারোগায় বোধহয় বিশেষ আস্থা ছিল না তাঁর ; তাই সংবাদ প্রভাকরে[৫৩] বিজ্ঞাপন দিয়ে নিরুদ্দিষ্ট চোরের সন্ধান করলেন :

'বিজ্ঞাপন

আমার এক ভৃত্য গত শুক্রবার প্রাতঃকালে স্বর্ণালঙ্কারে ও নগদে প্রায় আড়াইশত টাকা হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। যে ব্যক্তি তাহাকে বমাল সহিত ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাকে উচিতমত পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক ইতি ৬ ভাদ্র।

অক্ষয়কুমার দত্ত।

স্বর্ণালঙ্কারের বিবরণ।

হেলেহার ১ ছড়া/কণ্ঠমালা ১ ছড়া/বাজু ২খানা/বালা ৪ গাছ।'

জানি না অপহৃত সামগ্রী শেষ পর্যন্ত তিনি ফেরত পেয়েছিলেন কি না!

যাই হোক ওই মাসে আর একটি বিজ্ঞাপন দেখে মন খুশি হয়। সেটি তাঁর নিজের পত্রিকায় প্রকাশিত। বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে :

'চারুপাঠের প্রথম ভাগ প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার মূল্য আট আনা। শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।' [৫৪]

১৭৭৫ শকের ৬ ভাদ্র (১৮৫৩ আগস্ট) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত রাজনারায়ণ বসুর একটি বক্তৃতা পেপার কমিটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য নয় বলে সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তে দেবেন্দ্রনাথ স্পষ্টত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তথাপি সম্পাদক ও পেপার কমিটি তাঁদের সিদ্ধান্তে অবিচলিত থাকেন। সম্পাদকের কাছে পত্রিকার স্বার্থের ঊর্ধে কেউ নন। অক্ষয় দত্তের মত সম্পাদক সাময়িকপত্রের ইতিহাসে হাতে গোনা যায়।

পত্রিকা সম্পাদনপর্বে পত্রিকাই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান আকাঙ্ক্ষা। 'পদোন্নতি ও ধনাগমের বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক নিজের ও দেশীয়গণের জ্ঞানোন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ' করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। [৫৫]

বিদ্যাসাগরের দীর্ঘ প্রবন্ধ 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন (১৮৫৫ ফেব্রুয়ারি) সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়। বিনয় ঘোষ তাঁর সম্পাদিত 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড'-এর সম্পাদকীয়তে (পৃ ৫৫) লিখেছেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ঐতিহাসিক গৌরব হল, প্রথম এই পত্রিকাতেই বিদ্যাসাগর "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না" প্রস্তাবটি প্রকাশ করেছিলেন।' এই ধারণাটি এখনো বর্তমান। কিন্তু এই সংবাদ ও ধারণা সত্য নয়। প্রকৃত তথ্য হল বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ প্রথমে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে ; এবং পরে ওই পুস্তিকা থেকে রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয় তত্ত্ববোধিনীতে ১৭৭৬ শকের ফাল্গুনে, অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ১৬৬ থেকে ১৭৪ পৃষ্ঠায়। ফাল্গুন বা ফেব্রুয়ারির এই তত্ত্ববোধিনী যে কিছু পূর্বে মাঘে বা জানুয়ারির কোনো সময়ে প্রকাশিত হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফাল্গুন সংখ্যার শেষ পাতার নিচে ক্ষুদ্র হরফে মুদ্রিত '১ ফাল্গুন' তারিখটির প্রতি লক্ষ্য করলে। ওই তারিখ ওই সংখ্যার প্রকাশকালের নির্দেশক। ১৭৭৬ শকের তত্ত্ববোধিনীর আষাঢ় সংখ্যা ৩ আষাঢ়ে, ভাদ্র ৫ ভাদ্রে, আশ্বিন ৪ আশ্বিনে

ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা ৪ অগ্রহায়ণে মুদ্রিত। বাকি সংখ্যাগুলি সেই সেই মাসের পয়লা তারিখেই ছাপা হয়েছিল। এর থেকে নির্দিষ্টভাবে বলা যাচ্ছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন সংখ্যা ফাল্গুনের ১ তারিখ প্রাকশিত হয় ; অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি।

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব—দ্বিতীয় পুস্তক' প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে। এটি প্রথম প্রস্তাবের মত ক্ষুদ্র পুস্তিকা নয়। এই দ্বিতীয় পুস্তকের 'উপক্রমভাগ' ও 'উপসংহারভাগ'—এই দুটি অংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয় ১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৮৫৫ নভেম্বর) ১০৪ থেকে ১১০ পাতায়। পুনর্মুদ্রণের প্রথমে সম্পাদকীয় মন্তব্যে যা বলা হয়েছে তাতেও স্পষ্ট জানা যায় প্রথম প্রস্তাবটি পুস্তিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদকীয় দায়িত্ব ত্যাগের ঠিক সময়টি কবে সে-বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এ-বিষয়ে যে কোনো সংশয় আছে এ-যাবৎ কেউই তা উত্থাপন করেন নি। সকলেই সর্বদা বলেছেন '১৮৫৫ সাল পর্যন্ত' অক্ষয় দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন করেন। কিন্তু '১৮৫৫ সাল' বলতে কী বোঝায়? তত্ত্ববোধিনীতে কোনো ইংরেজি সালের উল্লেখ নেই। শকাব্দের হিসাবে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হত। দেবেন্দ্রনাথও তাঁর 'আত্মজীবনী'তে সন তারিখ শকাব্দের হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আমাদের জানা দরকার কোন্ শকাব্দের কোন্ মাস থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন ভার থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সে-সময় এ পত্রিকায় সম্পাদকের নামোল্লেখ থাকত না। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বইতে সেই যে লিখে গেছেন—'১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত অক্ষয়বাবু দক্ষতা সহকারে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন',[৫৬] সেই মন্তব্যটিকেই দেখি সকলে একমাত্র অবলম্বন রূপে গ্রহণ করেছেন। তত্ত্ববোধিনীর অন্যতম সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ ব্যাপারে শিবনাথ শাস্ত্রীর ওই মন্তব্যটুকুই উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। পরবর্তী কালে সকলেই '১৮৫৫ সাল পর্যন্ত' অক্ষয় দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন বলে নির্দেশ করেছেন। অথচ আশ্চর্য, এই নির্দেশের মধ্যে যে কিছু অনিশ্চয়তা আছে তার কোনও আভাস দেননি এযাবৎ কেউ ; যার ফলে সকলেরই এই ধারণা হয়ে এসেছে যে ১৮৫৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অক্ষয় দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন।

অক্ষয় দত্তের অব্যবহিত পরেই নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনিও যে ঠিক কবে থেকে পত্রিকার সম্পাদক হন সে-সংবাদ আমাদের অজানা। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু বলেছেন, 'শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি অবসর নেবার পর নবীনবাবু সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন।' [৫৭] কিন্তু অক্ষয় দত্ত সত্যই যে ১৮৫৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন—সে-রকম তথ্য এখনো পাওয়া যায় নি। বরং যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে এই মনে হয় যে অক্ষয় দত্ত সম্ভবত ১৮৫৫ সালের জুন-জুলাই মাস (১৭৭৭

শক আষাঢ়-শ্রাবণ) পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদনা কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কেন আমরা এরকম অনুমান করছি?

শিবনাথ শাস্ত্রী অক্ষয় দত্ত প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'অবশেষে ১৮৫৫ সালের আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার পর একদিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মূৰ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। তখন অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইল বটে, কিন্তু দুই দিবস পরে একদিন তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতেছেন এমন সময়ে মস্তিষ্কের এক প্রকার অভূতপূর্ব জ্বালা হওয়ায় লেখনী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তদবধি সে লেখনী আর ধারণ করিতে পারেন নাই।'

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও জানিয়েছেন, 'অর্শ ও উদরাময় পূর্বেই দেখা দিয়াছিল। তাহার উপর ১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে [১৭৭৭ আষাঢ়, ১৮৫৫ জুন-জুলাই] মূর্ছার সঙ্গে দুশ্চিকিৎস্য শিরোরোগ আসিয়া জুটিল। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকতা ছাড়িতে হইল। অতঃপর তিনি কিছুদিন নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কর্ম করিয়াছিলেন। কিন্তু পীড়া-বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাও ছাড়িতে হইল।'

শিক্ষক-শিক্ষণের নিমিত্ত প্রস্তাবিত নর্মাল স্কুলের একশ পঞ্চাশ টাকা বেতনের প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য অক্ষয় দত্তের নাম সুপারিশ করে ১৮৫৫ সালের ২ জুলাই বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষকে পত্রে লিখলেন, ' I would recommend Babu Akshy Kumar Dutt, the well-known editor of the Tatwabodhini Patrika. He is one of the very few of the best Bengali writers of the time.' অক্ষয়কুমারকে প্রধান শিক্ষকের পদে গ্রহণ করে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক ১৮৫৫ সালের ১৭ জুলাই তারিখে নর্মাল স্কুল খোলা হয়। কিন্তু শরীর ঠিকমত সুস্থ না হওয়ায় মধ্যে দীর্ঘকাল ছুটি নিয়ে ১৮৫৮ সালের আগস্ট মাসে এই বিদ্যায়তন থেকে পদত্যাগ করেন অক্ষয় দত্ত।

এইসব তথ্য থেকে এই অনুমান স্পষ্ট হয় যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব ত্যাগ করেন ১৭৭৭ শকের আষাঢ়-শ্রাবণের কোনো সময়—১৮৫৫ সালের জুন-জুলাই মাস নাগাদ। সাধারণভাবে শুধু ১৮৫৫ সাল বলে উল্লেখ করলে স্বভাবতই ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত—এরূপ ধারণা জন্মায়। প্রকৃত সত্যের সঙ্গে এই ধারণার মিল নেই।

পাদটীকা

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আত্মজীবনী, ১৯৬২, পৃ ৩৭।

২. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ রচনাসংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ ৩৬০।

৩. ঐ, পৃ ৩৬০।

৪. *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', বঙ্কিম-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ,* ১৩৭১, পৃ ১৯০।

৫. *বিনয় ঘোষ—'বাংলা সাহিত্যে সাময়িকপত্রের দান : দিগ্‌দর্শন থেকে বঙ্গদর্শন'*। দ্র, অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত—সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা ১৩৭০, পৃ ১৭।

৬. দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪৫ (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর), ১৩৬৪, পৃ ১১-১২।

৭. আত্মজীবনী, পৃ ২৬, ৩৭-৩৮।

৮. Sivanath Sastri—History of the Brahmo Samaj, 2nd edition, 1974, p 56.

৯. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ ৩৪১।

১০. সংবাদ প্রভাকর, ২১ অগ্রহায়ণ ১২৪৭ (ডিসেম্বর ১৮৪০)। দ্র. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত—সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, ১৯৬২, পৃ ১৬১।

১১. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য—বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান, ১৯৬০, পৃ ৬০।

১২. দ্র. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক লিখিত ভূমিকা—চারুপাঠ, প্রথম ভাগ, আটাম্ন মুদ্রণ, ১৯১৯, পৃ ভূমিকা ১৩।

১৩. আত্মজীবনী, পৃ ২৯-৩০।

১৪. ঐ, পৃ ৩১।

১৫. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ ৩৩৭।

১৬. দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১২ (অক্ষয়কুমার দত্ত), ১৩৬৬, পৃ. ১৮।

১৭. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৬৪, পৃ ৬৩।

১৮. ঐ, পৃ ২২৭।

১৯. ঐ, পৃ ৫৮৭।

২০. বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ১ জানুয়ারি ১৮৪৩। দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১২৯।

২১. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ ৩৪০।

২২. আত্মজীবনী, পৃ ৩৫-৩৬।

২৩. ঐ, পৃ ৩৬।

২৪. ঐ, পৃ ৩৬-৩৭।

২৫. ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, পৃ ২১।

২৬. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ, পৃ ৩৫৯-৩৬০।

২৭. R.C. Dutt—The Literature of Bengal, pp 163-164.

২৮. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৫ শক ভাদ্র (আগস্ট ১৮৪৩), পৃ ১। বিনয় ঘোষ সংকলিত সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার রচনা-সংকলন গ্রন্থের (১৯৬৩) অন্তর্গত প্রথম রচনা এই সম্পাদকীয়টি (পৃ ৮৩-৮৪)। কিন্তু সংকলন-গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ বিশুদ্ধ নয়। বিনয় ঘোষের বইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ওই পৃষ্ঠার ছবিও লাইন ব্লকে সুস্পষ্ট মুদ্রিত। মূল পত্রিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, সংকলিত গ্রন্থের প্রথম রচনার প্রথম অনুচ্ছেদেই দুটি ছাড়। মূলে 'এতৎ পত্রিকার' স্থলে বইতে ছাপা হয়েছে 'এতৎ পত্রিকা' এবং ওই বাক্যের শেষাংশে 'এস্থলে' কথাটি সংকলন-গ্রন্থে সম্পূর্ণ বাদ পড়েছে। পাঠবিভ্রাট আরও আছে। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে শেষ অনুচ্ছেদের অন্তর্গত দুটি বাক্যে দুবার 'তাহারদিগের' আছে। সংকলন-গ্রন্থে দুইবারেই পাঠের বিশুদ্ধতা রক্ষিত না হয়ে 'তাঁহারদিগের' ছাপা হয়েছে।

আরও একটি গুরুতর প্রসঙ্গ এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়। বিনয় ঘোষের বইয়ের প্রথমেই যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার 'প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্র' মুদ্রিত হয়েছে সেই চিত্রটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে সংশয় দেখা দিচ্ছে। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে তত্ত্ববোধিনীর প্রায় সম্পূর্ণ ফাইল আছে। এখানে রক্ষিত, এবং বিশ্বভারতী সাধারণ গ্রন্থাগারে রক্ষিত তত্ত্ববোধিনীর প্রথম বছরের বাঁধানো ফাইলের অন্তর্গত প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার সঙ্গে 'প্রতিলিপিচিত্র' মিলিয়ে দেখলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেক পার্থক্য ধরা পড়ে। প্রথমত পত্রিকার শিরোনাম ব্লক-লেটারিং উভয় স্থলে এক নয়। স্পষ্ট পার্থক্য আছে 'ত' এবং 'ত্রি' এই দুই অক্ষরে। অন্যান্য অক্ষরেও সূক্ষ্ম প্রভেদ রয়েছে। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোদেশে লেখা আছে '১সঙ্খ্যা', কিন্তু বিনয় ঘোষের বইয়ের 'প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্র'তে ছাপা হয়েছে শুদ্ধ বানান '১ সংখ্যা'। 'প্রতিলিপিচিত্র' বলা হলেও মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি অনেক স্থলেই ছত্রে ছত্রে শব্দবিন্যাসে বৈষম্য। এই বৈষম্য কেন?

২৯. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৫ শক ভাদ্র (আগস্ট ১৮৪৩), পৃ ১।

৩০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—বাংলা সাময়িকপত্র প্রথম খণ্ড (১৩৭৯, পৃ ৮৪) গ্রন্থে এবং বিনয় ঘোষের—সামায়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র—দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থে (পৃ ৬০৬) রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনীর কাল 'এপ্রিল ১৯১০—এপ্রিল ১৯১৫' বলা হয়েছে। এ তথ্য ঠিক নয়। দ্র. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য—'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্র', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭৫, পৃ ১৬০।

৩১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৬ শক বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৪৪), পৃ ৬৫।

৩২. আত্মজীবনী, পৃ ৪৬।

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শান্তিনিকেতন।

৩৪. বঙ্গদর্শন ১২৮৭ ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি ১৮৮১), পৃ ৪৯৯-৫০০।

৩৫. আত্মজীবনী, পৃ ৬২-৬৩।

৩৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৭ শক জ্যৈষ্ঠ। দ্র. আত্মজীবনী, পৃ ৬৩।

৩৭. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪৫, পৃ ৪৫-৪৬।

৩৮. রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫২, পৃ ৫২।

৩৯. ঐ, পৃ ৬০।

৪০. অক্ষয়কুমার দত্ত—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৮৮, পৃ ১২০।

৪১. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, পাঠভবন, ১৩৭৬, পৃ সম্পাদকীয়-৩।

৪২. দ্র. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৯৬-১০৪।

৪৩. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস—অক্ষয়চরিত, ১২৯৪, পৃ ২২-২৪।

৪৪. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৩ শক অগ্রহায়ণ (১৮৫১), পৃ ১২০।

৪৫. দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১২, পৃ ৩৩-৩৫।

৪৬. আত্মজীবনী, পৃ ৩৬-৩৭।

৪৭. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ ৩৬০।

৪৮. সংবাদ প্রভাকর, ২০ এপ্রিল ১৮৪৯। দ্র. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ ৩০৩-৩০৪।

৪৯. নবেন্দু সেন—গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭১, পৃ ৫১।

৫০. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য—বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী, ১৯৯১, পৃ ২৮।

৫১. দ্র. চারুপাঠ, প্রথম ভাগ, আটান্ন মুদ্রণ, ১৮৪১ শক (১৯১৯), পৃ ভূমিকা ১২।

৫২. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমার বাল্যকথা, ১ম সংস্করণ, পৃ ৬৫।

৫৩. সংবাদ প্রভাকর, ২৪ আগস্ট ১৮৫৩। দ্র. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ ৪২৯।

৫৪. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৫ শক ভাদ্র (আগস্ট ১৮৫৩), পৃ ৬৭।

৫৫. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ ৩৫৯।

৫৬. ঐ, পৃ ৩৬০।

৫৭. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমার বাল্যকথা, পৃ ৬৪।

বঙ্কিম-উপন্যাসে নারী : পুনর্বিচার

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি যে উনবিংশ শতাব্দীর কালসীমায় রচিত তার অন্য প্রমাণ তাঁর সৃষ্ট পুরুষ চরিত্রগুলি ; অপরদিকে একবিংশ শতাব্দীতেও তাঁর উপন্যাসের মহান আবেদন যৌক্তিকতা ও জনপ্রিয়তার যে সুনিশ্চিত সম্ভাবনা—তার সবটুকু কৃতিত্ব তাঁর উপন্যাসের রমণীকুলের। এই রমণীরা উনিশ শতকের সমাজপটভূমিকায় এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করলেও এদের চিন্তা ভাবনা জীবনবোধ, এদের ক্রোধ বিদ্রোহ ও সংগ্রাম, এদের প্রাগ্রসর মানসিকতা একবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মহিলা তথা সমগ্র বাঙালী সমাজকে লজ্জা দিতে পারে। লজ্জা দেবে এই কারণে যে বঙ্কিমের রমণীরা উনিশ শতকের কালসীমায় বসে যা ভেবেছে যা চেয়েছে যা করেছে, একবিংশ শতাব্দীর আঙিনায় এসে আজও আমরা সেখানে আদৌ পৌঁছতে পারিনি। যে-কারণে তাদের অপমান ও অসম্মান, এবং তজ্জনিত ক্রোধ এবং বিদ্রোহ, সে-সব কারণ আজও সমাজ থেকে কিছুমাত্র দূরীভূত হয়নি। এ কেবল বঙ্গীয় সমাজের কথা নয় ; সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ পটভূমিতেও এই একই বক্তব্য।

আমরা এখানে বঙ্কিম-উপন্যাসের কয়েকটি প্রধান বিবাহিতা বাঙালী রমণী চরিত্রের আলোচনা করব যাদের জীবনের বেদনাদায়ক পরিণতি ও দুর্ভাগ্যের চাকা মোটামুটি একইভাবে আবর্তিত হয়েছে। এই আলোচনার অন্তর্গত বিবাহিতা রমণীরা হল কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে মৃন্ময়ী, বিষবৃক্ষের দুই নারী সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী, চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী, এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে ভ্রমর। এই পাঁচটি রমণীই বিবাহিতা এবং এরা সকলেই উপন্যাসের মধ্যে দীর্ঘ সময় জুড়ে অথবা উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে দাম্পত্যজীবনসুখ বঞ্চিতা। এই মেয়েদের কেউই কিন্তু আপন চরিত্রদৌর্বল্য বা চরিত্রস্খলনের কারণে নয় ; একান্তভাবে নিজ নিজ স্বামীর আচরণ চরিত্র ও মনোভাবের কারণে স্বামীর নৈকট্য থেকে স্বেচ্ছায় নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছে। আত্মমর্যাদার সঙ্গে বঙ্কিমের মেয়েরা কোনোদিন আপোসরফা করেনি। প্রয়োজন হলে স্বামীকে তারা পরিত্যাগ পর্যন্ত করতে পারে—তারা গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে যেতে পারে—তারা মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে পারে ; কিন্তু নারীর মর্যাদা ও মহিমাকে বিসর্জন দিতে রাজি নয়। যে যুগে সবে সতীদাহ প্রথার নিবারণ হয়েছে, বিধবাবিবাহ সবে আইনের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, বহুবিবাহ রহিত হওয়ার সপক্ষে বিদ্যাসাগরের আন্দোলন শুরু হয়েছে—সেই সময়পর্বের পটভূমিতে বঙ্কিমসৃষ্ট রমণীরা অতিমাত্রায় আধুনিক অতিমাত্রায় প্রাগ্রসর। এ-যুগের বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন সে-যুগের বাঙালী রমণীদের কল্পনার বাইরে ছিল। একালেও আইনের সুযোগ থাকলেও বাঙালীর

দাম্পত্যজীবনে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা কয়টি? শহরের দু-চারটি ঘটনা সমগ্র জাতির জীবন প্রবাহের ইতিহাস নয়। পরিসংখ্যানের হিসাবে শতকরা এক ভাগও হবে না—যেখানে মেয়েরা গিয়ে আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে আসছে। অথচ পণপ্রথা বধূ-নির্যাতন বধূ-হত্যা পুরুষের ব্যভিচার মদ্যপান পাপাচার সব কিছুই রয়েছে। বাইরের দিক থেকে দেশের যতই সমৃদ্ধি ঘটুক, ভিতরের দিক থেকে আমাদের সামাজিক উন্নতি কতটা ঘটেছে? পুরুষশাসিত এই সমাজে স্বামী অন্য রমণীর প্রতি আসক্ত হলে কয়জন বঙ্গবালা পতিদেবতাকে পরিত্যাগ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে? শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে নেবার জন্য আজও কি বাঙালী পিতামাতা মেয়ের মাথায় হাত তুলে আশীর্বাদ করে না? আজও কি বাঙালীজীবনে মেয়েদের সামাজিক বিবাহের আনন্দ-অনুষ্ঠানের পিছনে লুকিয়ে থাকে না দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ও আশঙ্কার বিভীষিকা-ছায়া? আজও কি মেয়ের বাবাকে পাত্রের পিতার নিকট যুক্ত হস্তে নত মস্তকে দাঁড়াতে হয় না—যেন তিনি তাঁর কন্যাটিকে তার শ্বশুরালয়ে তুলে দিয়ে কত অপরাধেই না অপরাধী! আজও সমাজের সর্বস্তরেই দেখি বিবাহকে কেন্দ্র করে পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ সমানেই চলেছে—হয়তো কেনাবেচার ভঙ্গির কিছু পরিবর্তন ঘটেছে শহরাঞ্চলের দিকে। নবকুমারের পিতা বালিকা পুত্রবধূকে শ্বশুরালয় থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন যেহেতু পদ্মাবতীর পিতা পাঠানের হস্তে আক্রান্ত হয়ে সপরিবার মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবার একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় আমাদের এই আধুনিক সমাজের দিকে তাকিয়ে বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি কয়জন বাঙালী হিন্দুপরিবার স্বীয় পুত্রবধূকে যবনবালা জেনে তাকে সাদরে বরণ করে নিতে সম্মত হবেন? আজও কোনো শিক্ষিত হিন্দুর ছেলে অন্তরের পবিত্র ভালবাসার দাবিতে কোনো শিক্ষিতা সুন্দরী মুসলিম কন্যাকে বিবাহ করলে হিন্দুর ছেলেকে গৃহত্যাগী হতে হয়; আত্মীয়স্বজনের সম্পর্কচ্যুত হতে হয়। এই একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের এই তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে এ কথা কি সত্য নয় যে, হিন্দুর ঘরে একজন খ্রিস্টধর্মে-দীক্ষিত বধূ এলে যে ঝড় ওঠে, একটি পবিত্র মুসলিম কন্যা সেই স্থলে বধূরূপে উপস্থিত হলে ঝড় নয় একেবারে প্রবল ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়। আমরা, শিক্ষিত বুদ্ধিমান আধুনিক বাঙালী বঙ্কিমকে সাম্প্রদায়িক বলি—এ তো আসলে কৌশল এবং ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। একজনকে সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিলে লোকে বুঝবে—যে তিরস্কার করছে সে তবে নিশ্চয় সাম্প্রদায়িক নয়—সে উদার, মহৎ স্বভাবের ভদ্রলোক, যথার্থ অর্থে মানবিক। একটি চোর চুরি করে পালাচ্ছিল, কিছু লোক তার পিছনে 'চোর চোর' বলে ছুটছিল তাকে ধরতে; চোরটা কিছু দূরে দৌড়ে একটা মোড় ঘুরে বুদ্ধি করে নিজেও 'চোর চোর' বলে চেঁচিয়ে ছুটতে লাগলো। তখন আশপাশের লোকে ভাবলে এ তবে চোর নয়—চোরকে ধরবার জন্যই এ ছুটেছে। চুরি করে অন্যকে চোর বলে আসল চোর কৌশলে সাধু বনে গেল।

আমাদের সমাজে এরকম নকল সাধুতে দেশ ছেয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক ছিলেন না—সমাজের প্রকৃত ছবিটাই নির্মমভাবে তুলে ধরেছিলেন মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের

লেখায় কোথাও নবকুমারের পিতার আচরণের প্রতি ঔপন্যাসিকের সমর্থন পাই না ; বরং বঙ্কিমচন্দ্র এ-কথাই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন তাঁর হিন্দু পাঠকসমাজকে যে, ইসলাম ধর্মে বাধ্য হয়ে দীক্ষিত হলেও পদ্মাবতী পদ্মাবতীই। পিতৃভক্ত নবকুমার বা সমাজের ভয়ে শঙ্কিত নবকুমার স্বীয় পত্নী পদ্মাবতীর কোনোদিন আর অনুসন্ধান না করলেও বঙ্কিম সেই পদ্মাবতীর অনুসন্ধান করেছেন। সমাজ যাকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করেছে মুসলমান বলে, বঙ্কিম তাকে আবার সন্ধান করে নিয়ে এসেছেন এই বাংলার মাটিতে সপ্তগ্রামে। ধর্মান্তরের কারণে সমাজ যাকে নির্মমভাবে ঘৃণা করেছে লাঞ্ছিত করেছে, বঙ্কিম তাকে তাঁর উপন্যাসে নিজের হাতে করে কোথায় এনে বসিয়েছেন—তা কি আমরা একবারও সচেতনভাবে লক্ষ্য করি! আমাদের সমাজের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ছবিটা বঙ্কিম স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এ ছবির খুব বেশি পরিবর্তন তো আজও হয়নি। নবকুমারের পিতার মানসিকতা থেকে আজও কি আমরা সত্য সত্যই অনেকটা এগিয়ে আসতে পেরেছি? বঙ্কিম হিন্দু সমাজের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছেন—তোমরা সঙ্কীর্ণমনা তোমরা সাম্প্রদায়িক। আমরা একালে সেই সত্যটাকে আড়াল করে বলি—বঙ্কিমই ধর্মান্ধ তিনিই সাম্প্রদায়িক। অথচ এই বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের মনোভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে দেখিয়েছেন পদ্মাবতী মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলেও সে পদ্মাবতীই। সমাজ তাকে গ্রহণ করেনি নবকুমার তাকে বধূরূপে ঘরে স্থান দেয়নি ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাকে গভীর সহানুভূতি দিয়ে অন্তরের সবটুকু প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিয়ে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিয়েছেন। নবকুমারের ধর্মান্তরিতা যবনপত্নী যে প্রকৃতপক্ষে 'মহৎ গুণ শোভিত' এক রমণীরত্ন, সে কথাই আন্তরিকভাবে প্রমাণ করার অকৃত্রিম প্রয়াস কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের। সাম্প্রদায়িক নবকুমারের কাছে, নামে নব-কুমার হলেও ধর্মান্ধ নবকুমারের কাছে আপন পত্নী পদ্মাবতী যবনী মতিবিবি ছাড়া কেউ নয় ; কিন্তু ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যে-পদ্মাবতী সে-ই মতিবিবি, যে-মতিবিবি সে-ই পদ্মাবতী—অভিন্ন এবং অসামান্য—এক রমণী।

॥ দুই ॥

বঙ্কিমের উপন্যাস থেকেই বঙ্গদেশে প্রকৃতপক্ষে নারীমুক্তি ও নারীজাগরণের সূচনা ঘটে বলা যেতে পারে। বঙ্কিম দেখিয়েছেন আমাদের দেশে নারীর মূল্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সব চেয়ে বড় অন্তরায় এই পুরুষপ্রধান বঙ্গসমাজ। এই সমাজেরই প্রতিনিধি নবকুমার, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, ব্রজেশ্বর প্রমুখেরা। কিন্তু সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী, ভ্রমর, মৃন্ময়ীরা সমাজের সঙ্কীর্ণ তথাকথিত অনুশাসন নীরবে মেনে নিতে রাজি নয়। এরা গৃহবধূ হয়েও সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। স্লোগান দিয়ে বা ধ্বজা উড়িয়ে নয়—আপন জীবনসাধনায় যথার্থ সত্যকে গ্রহণ করে এবং মর্যাদার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মোৎসর্গের

মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কোনো মেয়েই পুরুষের সঙ্গে আত্মমর্যাদার লড়াইয়ে কখনো পরাজয় মেনে নেয়নি। প্রয়োজন হলে সে ঘর ছেড়ে চলে যায়, স্বামীকে পরিত্যাগ করে কিংবা নিজে বিদ্রোহিণী রূপে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে নেয় ; তবু মুখ বুজে অসহায় অবলা রূপে অপমান লজ্জা ও অসম্মান সহ্য করতে রাজি নয়। বঙ্কিমের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসই এক হিসাবে সংগ্রামী উপন্যাস। শুধু বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধই সংগ্রাম নয় ; চাই সমাজের মধ্যেও সংগ্রাম, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অশিক্ষা কুশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সমাজের মিথ্যা কদাচার অনুশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বঙ্গসাহিত্যে তথা বঙ্গদেশে এই সংগ্রাম তথা বিপ্লবের সূচনা করে গেছে মৃন্ময়ী সূর্যমুখী কুন্দ ভ্রমরেরা। বাইরের দিক থেকে তারা বাঙালী গৃহবধূ মাত্র—কেউ নবকুমারের স্ত্রী, নগেন্দ্রনাথের কেউ, কেউ গোবিন্দলালের ; কিন্তু অন্তরে তারা সকলেই আপোসহীন কঠিন বিপ্লবী। তারা সমাজের বুকে যে বিপ্লবের সূচনা করে গেছে আজও তার প্রয়োজন এতটুকু কমেনি। আজও বঙ্গদেশে সামাজিক বিবাহ-অনুষ্ঠানে ছেলে বিয়ে করতে যাবার সময় মা-কে প্রণাম করে বলে—মা দাসী আনতে চললুম। ছেলের মা অন্তরে অন্তরে তেমনটিই সত্য হোক—এরূপ আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করেন। শাশুড়ীর এই মনোভাব সাধারণভাবে শহর গ্রাম নির্বিশেষে আজও বাস্তব সত্য, তীব্রভাবে এবং কোথাও কোথাও নির্মমভাবেই সত্য। অথচ আজ থেকে সোয়াশো বছর পূর্বে বঙ্কিম কপালকুণ্ডলার মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন, 'যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।' ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্বে কোনো বাঙালী বধূর মুখ থেকে এমন উক্তি উচ্চারিত হবার কথা আজও ভাবা যায় না।

নবকুমারের সংশয়াধীন মুখের দিকে তাকিয়ে মৃন্ময়ী বিনা দ্বিধায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে স্বামীকে ভর্ৎসনার সুরে বলতে পারে, 'আইস, আমি অবিশ্বাসী কি না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।'

কোনো অনিবার্য প্রয়োজনে গৃহবধূ রাত্রে একাকী ঘরের বাইরে বেরলেই কি সে 'কুচরিত্রা' হবে? প্রাচীন সমাজ এ বিষয়ে নারীকে যেভাবে দেখে দেখুক, কপালকুণ্ডলা সমাজের সে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রাহ্য করে না। সমাজের এমন অর্থহীন নীচ সঙ্কীর্ণ দুর্বল মানসিকতা কপালকুণ্ডলার নারীব্যক্তিত্বে তীব্রভাবে আঘাত করে। অকারণে অন্যায়ভাবে সমাজ তাকে কুচরিত্রা বললেও সে কুচরিত্রা হয় না। নবকুমারের ভগিনী শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশ করার জন্য রাত্রে বন থেকে 'ঔষধ' (বিশেষ গাছের পাতা বা শিকড়) আনার প্রয়োজন। পরের উপকারের কাজে কপালকুণ্ডলা সর্বদা অগ্রণী। একদিন মৃত্যুর হাত থেকে সে নবকুমারকে উদ্ধার করেছিল, আজ শ্যামাসুন্দরীর মঙ্গলের জন্যও সে সম্পূর্ণ অকুতোভয়। এ ব্যাপারে লোকনিন্দাকে বা স্বামীর বাধাদানকে সে নিতান্ত ঘৃণার চোখে দেখে। শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে ও পরে নবকুমারের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে তার কথোপকথন অংশটি লক্ষ্য করুন :

শ্যা [মাসুন্দরী]। এক দিন যা হইয়াছে, তা হইয়াছে। রাত্রে তুমি আর বাহির হইও না।

ক [পালকুণ্ডলা]। সে জন্য কেন তুমি চিন্তা কর? শুনেছ ত, রাত্রে বেড়ান আমার ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস। মনে ভেবে দেখ, যদি আমার সে অভ্যাস না থাকিত, তবে তোমার সঙ্গে আমার কখনও চাক্ষুষ হইত না।

শ্যা। সে ভয়ে বলি না, কিন্তু একা রাত্রে বনে বনে বেড়ান কি গৃহস্থের বউ-ঝির ভাল। দুই জনে গিয়াও এত তিরস্কার খাইলাম, তুমি একাকিনী গেলে কি রক্ষা থাকিবে?

ক। ক্ষতিই কি? তুমিও কি মনে করিয়াছ যে, আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?

শ্যা। আমি তা মনে করি না। কিন্তু মন্দলোকে মন্দ বলবে।

ক। বলুক, আমি তাতে মন্দ হব না।

শ্যা। তা তো হবে না—কিন্তু তোমাকে কেহ কিছু মন্দ বলিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে ক্লেশ হবে।

ক। এমন অন্যায় ক্লেশ হইতে দিও না।

শ্যা। তাও আমি পারিব। কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী করিবে?

কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর প্রতি নিজ স্নিগ্ধোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, "ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"

ইহার পর আর কথা শ্যামাসুন্দরী ভাল বুঝিলেন না। আত্মকর্মে উঠিয়া গেলেন।

কপালকুণ্ডলা প্রয়োজনীয় গৃহকার্যে ব্যাপৃত হইলেন। গৃহকার্য সমাধা করিয়া ওষধির অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। তখন রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছিল। নিশা সজ্যোৎস্না। নবকুমার বহিঃপ্রকোষ্ঠে বসিয়া ছিলেন, কপালকুণ্ডলা যে বাহির হইয়া যাইতেছেন, তাহা গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন। তিনিও গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া মৃন্ময়ীর হাত ধরিলেন। কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি?"

নবকুমার কহিলেন, "কোথা যাইতেছ?"

নবকুমারের স্বরে তিরস্কারের সূচনামাত্র ছিল না।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে, আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি।"

নবকুমার পূর্ববৎ কোমল স্বরে কহিলেন, "ভাল, কালি ত একবার গিয়াছিলে? আজি আবার কেন?"

ক। কালি খুঁজিয়া পাই নাই, আজি আবার খুঁজিব।

নবকুমার অতি মৃদুভাবে কহিলেন, "ভাল, দিনে খুঁজিলেও ত হয়?" নবকুমারের স্বর স্নেহপরিপূর্ণ।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দিবসে ও ঔষধ ফলে না।"

ন। কাজই কি তোমার ঔষধ তল্লাসে? আমাকে গাছের নাম বলিয়া দাও। আমি ঔষধি তুলিয়া আনিয়া দিব।

ক। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি তুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোকের এলো চুলে তুলিতে হয়। তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না।

কপালকুণ্ডলা এই কথা অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন। নবকুমার আর আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

কপালকুণ্ডলা গর্বিতবচনে কহিলেন, "আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।"

নবকুমার আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

নিশ্বাস সহকারে কপালকুণ্ডলার হাত ছাড়িয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।'

উদ্ধৃত অংশটিতে দেখি, কপালকুণ্ডলাকে ঘরের বাইরে বেরুতে দেখে নবকুমার 'গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া মৃন্ময়ীর হাত ধরিলেন।' হস্তধারণ করেই স্ত্রীর প্রতি নবকুমারের জিজ্ঞাসা—'কোথা যাইতেছ?' এ জিজ্ঞাসা তো শুধু মৃন্ময়ীর স্বামী নবকুমারের নয়—এ যেন বঙ্গসমাজের দুর্বল সঙ্কীর্ণ সন্দেহপরায়ণ ধর্মভীরু সব পুরুষের জিজ্ঞাসা নারীজাতির প্রতি। আবার এ তো একান্তই জিজ্ঞাসা মাত্রই নয়—এর মধ্যেই রয়েছে সংশয় ও সন্দেহের তীব্রতম অপমান। নবকুমারের কণ্ঠস্বরে 'তিরস্কারের' ইঙ্গিত থাকুক আর নাই থাকুক—সে যেভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মৃন্ময়ীর হাত ধরে (পাকড়ে!) প্রশ্ন করেছে তা মৃন্ময়ীর মত রমণীর পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক ও অসম্মানসূচক বলেই বোধ হয়েছে। বঙ্কিম নবকুমারের আচরণ ও মনোভঙ্গির মধ্য দিয়ে বাঙালী সমাজের চিত্রটাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। হাত বাড়িয়ে নবকুমারই যে কেবল কপালকুণ্ডলার পথরোধ করলো, তা তো নয়—এ যে বঙ্গসমাজেরই পুরুষের কালো হাত। নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার যতক্ষণ কথা হয়েছে নবকুমার একবারের জন্যও স্ত্রীর হাত ছাড়েনি। কিন্তু কপালকুণ্ডলা নবকুমারের তথা সমাজের ওই কালো হাতের মুঠির মধ্যে বাঁধা থাকতে রাজি নয় কোনোমতেই। তাই নবকুমারের ঐকান্তিক অনাগ্রহ অনিচ্ছা ও আপত্তি সত্ত্বেও কপালকুণ্ডলা ঘর থেকে একাকী বেরিয়ে যায়। বঙ্কিম বলেছেন, নবকুমার 'কপালকুণ্ডলার হাত ছাড়িয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন' করে। আমাদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—কপালকুণ্ডলার হাত কি নবকুমার স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিল, নাকি কপালকুণ্ডলাই নবকুমারের হাত নিজে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যায়?

কপালকুণ্ডলার এই দৃঢ় বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়নির্ভর উক্তি, অবিশ্বাসিনী কি না তা স্বচক্ষে দেখার জন্য আহ্বান সত্ত্বেও, নবকুমারের সঙ্কীর্ণ দুর্বল মনের সংশয় ও অবিশ্বাস ঘোচে না। নারীর প্রতি সমাজের মানুষের এই অবিশ্বাস সন্দেহ সংশয়, এই সঙ্কীর্ণ নীচ মানসিকতা প্রকৃতিলালিতা নিষ্পাপ কপালকুণ্ডলা সহ্য করতে পারে না। এত দিনে সে স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পেরেছে বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকের বিবাহ মানে দাসীত্বকেই বস্তুতপক্ষে

বরণ করে নেওয়া। এই 'দাসীত্ব' অরণ্যচারী পরোপকারী সরলপ্রাণ কপালকুণ্ডলার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

কপালকুণ্ডলা অবিশ্বাসিনী কি না নবকুমারের এ সংশয় উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত দূর হয়নি। তাই কপালকুণ্ডলা তথা মৃন্ময়ীর উদ্দেশে নবকুমারকে বলতে শুনি, 'মৃন্ময়ী! —কপালকুণ্ডলে ! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি— একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।'

এর উত্তরে 'কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন—মৃদুস্বরে কহিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই!" '

কপালকুণ্ডলার আরও জবাব, 'আজি যাহাকে দেখিয়াছ,—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না।'

একদিন নবকুমারের পিতার কারণে পদ্মাবতী গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল ; আজ কপালকুণ্ডলার গৃহত্যাগের মূল কারণ স্বয়ং নবকুমার। সমাজের পাপ উত্তরাধিকার সূত্রে চলে এসেছে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে। পিতার অবর্তমানেও নবকুমারের নিকট তার আপন পত্নী পদ্মাবতী 'যবনী' এবং 'পরস্ত্রী' ছাড়া কিছুই নয়। একই সঙ্গে নবকুমারের নিকট তার দ্বিতীয়া পত্নী মৃন্ময়ী 'অবিশ্বাসিনী' এবং প্রথমা পত্নী পদ্মাবতী শুধুই ধর্মান্তরিতা 'যবনী'।

এক হিসেবে পদ্মাবতীও বিদ্রোহিণী। সে মুসলমান হয়েও তার হিন্দু স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য তার সর্ব শক্তি নিয়োগ করেছে। আগ্রার সিংহাসনও তার কাছে তুচ্ছ বলে বোধ হয়েছে। যবনী-পদ্মাবতী বাহুলতায় নবকুমারের 'চরণযুগল বদ্ধ' করে কাতরস্বরে বলেছে, 'আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।' উত্তরে নবকুমার তাকে বলেছে, 'তুমি আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।'

কিন্তু পরাজয় স্বীকার করতে, বিনা অপরাধে এই নির্মম প্রত্যাখ্যান মেনে নিতে, সমাজের তীব্র বাধার মুখে তার অধিকারের দাবি থেকে নিজেকে নীরবে অসহায়ভাবে বঞ্চিত করতে পদ্মাবতী তথা মতিবিবি তথা লুৎফ-উন্নিসা রাজি নয়। আর তাই নবকুমার যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে বলে 'আমার আশা ত্যাগ কর', তখনই লুৎফ-উন্নিসা 'তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সদর্পে' বলে 'এ জন্মে নহে।' 'এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না।' 'স্রোতোবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গী করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে।" '

'তুমি আমারই হইবে' এ ইচ্ছা কি শুধুই বঙ্কিমসৃষ্ট 'মহদ্‌গুণশোভিত' যবনী-লুৎফ-উন্নিসারই মাত্র—এ কি স্বয়ং ঔপন্যাসিকের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষে মানুষে মিলনের ঐকান্তিক বাসনা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ নয়?

'তুমি আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।' এবং 'এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না। তুমি আমারই হইবে।' নবকুমার ও মতিবিবির এই দুই উক্তির মধ্যে কার কণ্ঠস্বরে ঔপন্যাসিকের প্রাণের বাসনা ও প্রাণের আবেগ ধ্বনিত হয়ে ওঠে? যা নবকুমার পারে না, তা বঙ্গীয় সমাজের অক্ষমতা অসম্পূর্ণতা দুর্বলতা সঙ্কীর্ণতা ; যা মতিবিবির মনেপ্রাণে আকাঙ্ক্ষা করে তাই তো বঙ্কিমচন্দ্রের চিরদিনের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা।

॥ তিন ॥

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে দুই বিদ্রোহিণীকে দেখি—নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী সূর্যমুখীকে এবং নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া পত্নী কুন্দনন্দিনীকে। এই রমণীযুগলের বিদ্রোহ কিসের বিরুদ্ধে এবং কিভাবে, সে-কথাটাই এখন ব্যাখ্যা করব।

স্বামী নগেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেই সূর্যমুখীর প্রধান ক্ষোভ। এই ক্ষোভের কারণ কী? কারণ, এতকাল পর নগেন্দ্র স্ত্রী-সূর্যমুখীকে বিস্মৃত হয়ে বিধবা কুন্দনন্দিনীতে আকৃষ্ট। এমন কি নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ পর্যন্ত করতে উদ্‌যোগী। পুরুষের বহুবিবাহ সমাজ-অনুমোদিত হলেও সূর্যমুখীর মত নারীর পক্ষে তা মেনে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। শাস্ত্রের বিধান থাকে থাক, সমাজের অনুমোদন থাকে থাক, কিন্তু নারী হিসাবে সূর্যমুখী এ বিধান কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

সূর্যমুখীর প্রকৃত বিরোধ কি বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে, নাকি পুরুষের বহুবিবাহের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে? নগেন্দ্রের প্রতি সূর্যমুখীর ক্ষোভ কি এই কারণে যে নগেন্দ্র একজন বিধবাকন্যাকে বিবাহ করছে ; নাকি ক্ষোভের প্রকৃত কারণ হল, যেহেতু নগেন্দ্র দ্বিতীয়বার পরিণয়াবদ্ধ হচ্ছে—সে-কন্যা বিধবাই হোক আর কুমারীই হোক, সূর্যমুখীর তাতে কী যায় আসে। স্ত্রীর বর্তমানে স্বামীর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ তৎকালীন সমাজকর্তৃক অনুমোদিত হলেও পত্নী সূর্যমুখীর নিকট তা কিছুতেই স্বীকারযোগ্য নয়, অনুমোদনযোগ্য নয়। আর তাই দেখি নগেন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহে সূর্যমুখীর তীব্র বেদনা ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ পেল তার গৃহত্যাগের মধ্য দিয়ে। যদি সূর্যমুখী গৃহত্যাগের মাধ্যমে তার ক্ষোভ তার প্রতিবাদ প্রকাশ না করত, তাহলে এ-উপন্যাসে নগেন্দ্র-কুন্দের বিবাহের পর আর কোনো নতুন তরঙ্গ দেখা দিত না। হয়তো নগেন্দ্র তার বড়-বৌ ও ছোট-বৌকে নিয়ে দিব্যি ঘর-সংসার করে আত্মসুখে কালাতিপাত করত। নারীর আত্মমর্যাদা দিয়ে সূর্যমুখী নিজেকে নগেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী রূপেই ভাবতে পারে ; কিন্তু কখনই নগেন্দ্রের অন্যতম বধূ রূপে নয়। আর তাই কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রের বিবাহের পর দিনই সকলের অলক্ষ্যে রাতের অন্ধকারে সূর্যমুখী ঘর থেকে পথে এসে নামে ; ঠিকানাবিহীন লক্ষ্যে এগিয়ে যায় নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায়। স্নেহময়ী সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের ঘটনা নগেন্দ্রনাথকে তীব্রভাবে বিচলিত বিহ্বল ও বিভ্রান্ত করে তোলে। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ নগেন্দ্রের পক্ষে একান্তই

অপ্রত্যাশিত—হয়তো সেদিনের সমাজের চোখেও। মনে রাখতে হবে তখনো দেশে বহুবিবাহ নিষেধক আইন প্রবর্তিত হয়নি। তবে বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রয়াসে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আইন পাস হয়ে গেছে।

মনে হয়, সূর্যমুখীর প্রধানতম ক্ষোভ তার স্বামীর প্রতি হলেও, তার আর একটি ক্ষোভ থেকে গেছে বিধবাবিবাহ আইনের বিরুদ্ধে এবং স্বভাবতই সেই কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধেও।

কমলমণিকে ব্যথিত সূর্যমুখী স্বামীর কুন্দানুরাগের প্রসঙ্গের শেষে লিখেছে, 'একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?'

সূর্যমুখীর এ কথাটার প্রকৃত অর্থ কি? অনেকে মনে করেন সূর্যমুখীর চিঠির এই অংশ আসলে বঙ্কিমেরই আপন মনের অভিব্যক্তি। তার মানে কি বঙ্কিম বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন না? বিদ্যাসাগর দেশে যে আন্দোলনের জোয়ার তুলেছিলেন বঙ্কিম কি তার পরিপন্থী ছিলেন?

এরূপ কল্পনা আদৌ সত্য নয়।

মনে রাখতে হবে বঙ্কিম বিধবা কুন্দের বিবাহ দিয়ে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের অনুকূলতাই করেছিলেন। বালিকা বিধবা অন্তঃপুরে বসে জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়ে কেবল একাদশীর উপবাস করবে—বঙ্কিমচন্দ্র তা কখনই চাননি। 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রই বলেছেন, 'আট বৎসরের কুমারী কন্যা বিধবা হইয়াছে, যে ব্রহ্মচর্যের সে কিছু জানে না, যাহা ষাট বৎসরের বুড়ারও দুরাচরণীয়, সেই ব্রহ্মচর্যের পীড়নে পীড়িত করিয়া তাহাকে কাঁদাইতে হইবে, আপনি কাঁদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাঁদাইতে হইবে, নহিলে ধর্ম থাকে না। ধর্মোপার্জনের জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্কর্মা, স্বার্থপর, লোভী, কুকর্মাসক্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও, আপনার প্রাণপতনে উপার্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মূর্তি ধর্মের মূর্তি নহে—একটা পৈশাচিক কল্পনা।' বিদ্যাসাগর চিরজীবন সমাজের এই পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে লড়েছেন ; বিদ্যাসাগরের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে বঙ্কিমের মনোভাবের কোনো বিরোধ ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁর সাম্য গ্রন্থে বলেছিলেন, 'যদি কোনো বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, "যদি" পুরুষ পুনর্বিবাহে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রী বিয়োগান্তে দ্বিতীয়বার বিবাহ উচিত? উচিত, অনুচিত, স্বতন্ত্র কথা ; ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই

অধিকার আছে যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই এমত কার্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে। অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এ দেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্মধর্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্যে পরিণত করেন না। তিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়।'

বঙ্কিম সমাজের এই ভয়ে ভীত না হয়ে বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করলেন। বঙ্কিম বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন বলেই সরলা কুন্দনন্দিনীর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এই বিবাহের পরিণাম শুভ হয়নি বলে অনেকেই মনে করেন বঙ্কিম মনেপ্রাণে বিধবাবিবাহের বিরোধীই ছিলেন।

এইখানে আমাদের বক্তব্য কী বলি।

কুন্দ-নগেন্দ্রের বিবাহের পরিণাম যে সুখের হয়নি তার জন্য কুন্দের বৈধব্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেনি কখনই। নগেন্দ্র ও কুন্দের বিবাহের পর সূর্যমুখী যে গৃহত্যাগ করল—তার কারণ এ নয় যে সূর্যমুখীর স্বামী দ্বিতীয়বার যাকে বিবাহ করেছে সে বিধবা। কুন্দ কেবল বিধবা বলেই যে তাকে সপত্নীরূপে গ্রহণ করতে সূর্যমুখীর আপত্তি তা তো আদৌ নয়। আপত্তি তো একেবারে গোড়াতেই। প্রথমা পত্নীর উপস্থিতিতে নগেন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহ—তা সে বিবাহ কুমারীর সঙ্গেই হোক আর বিধবার সঙ্গেই হোক—সূর্যমুখীর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী কিছুতেই তা মেনে নিতে পারে না। ঘটনাচক্রে কুন্দ বিধবা। কিন্তু সূর্যমুখীর বিদ্বেষ কোনো সময়েই কুন্দ বিধবা বলে নয়—সূর্যমুখীর লজ্জা অপমান ক্ষোভ সর্বদা এই কারণেই যে কুন্দ নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া পত্নী।

দ্বিতীয়া পত্নীর আবির্ভাবই যদি এই উপন্যাসের সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে তবে বঙ্কিমচন্দ্র কুমারী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রের বিবাহের ব্যবস্থা করলেন না কেন?

এর কারণ, বঙ্কিম এই উপন্যাসের মাধ্যমে এটাও দেখাতে চেয়েছেন যে—বিধবাবিবাহ আইনানুমোদিত হলেও এই মুহূর্তে সমাজে তার পরিণাম শুভ নয়। এতদিন সমাজে পুরুষ কেবল কুমারীদেরই বিবাহ করার অধিকারী ছিল, এখন বিধবা রমণীদেরও সে পুনর্বিবাহ করার অনুমোদন পেল। এ যেন বহু বিবাহে আগ্রহী পুরুষদের পক্ষেই এই আইন সহায়ক হয়ে দেখা দিল। বিবাহযোগ্য কোন্ সুযোগ্য পুত্রের পিতা-মাতা বিধবা কন্যাকে বরণ করে নিলেন আপন পুত্রবধূ রূপে? আমাদের দেশে মেয়েদের বিবাহ দিতেই পিতা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে—সে অবস্থায় সমাজের কয়টা মানুষ বিধবা নারীকে বিবাহ করতে আগ্রহী হবে! সমাজে তেমন আগ্রহের যে সম্ভাবনা নেই বঙ্কিমচন্দ্র তা স্পষ্ট লক্ষ্য

করেছিলেন। তাই বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত এবং আইনসম্মত বলে স্বীকৃত হলেও সমাজ থেকে তেমন বিবাহের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু এই আইনানুমোদনের সুযোগ নিল সমাজে নগেন্দ্রনাথের মত মানুষেরা। বিধবাবিবাহে বঙ্কিমের আপত্তি নেই ; কিন্তু তড়িঘড়ি বিধবাবিবাহকে আইনের দ্বারা প্রবর্তনের কুফল সমাজে কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সে-দিকটা বঙ্কিম সমাজের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। বিধবাবিবাহ আইনসম্মত বলেই নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে পুনর্বিবাহের সুযোগ পেল। সমাজের প্রকৃত সংস্কার ভিতর থেকে যতদিন না ঘটবে ততদিন আইনের দ্বারা সমাজ সংস্কারের চেষ্টা সফল হবে না। পুরুষের বহুবিবাহের প্রবণতা ও মানসিকতা যতদিন না সম্পূর্ণ দূর হবে ততদিন বিধবাবিবাহ আইনের দ্বারা সমর্থিত হলেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত মনোবাঞ্ছা কিন্তু কখনই পূর্ণ হবে না। কুন্দনন্দিনীর বৈধব্য ঘটিয়ে এবং তার পরে সূর্যমুখীর স্বামী নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কুন্দের পুনর্বিবাহের উপাখ্যান রচনা করে সমাজের তৎকালীন অবস্থার ছবিটাই বঙ্কিম তুলে ধরতে চেয়েছেন।

॥ চার ॥

বিষবৃক্ষ আলোচনার গোড়াতেই বলেছি, শুধু সূর্যমুখীই নয়, এ উপাখ্যানের আর এক বিদ্রোহিণী কুন্দনন্দিনীও। সূর্যমুখী নগেন্দ্রের পুনর্বিবাহের প্রতিবাদ জানিয়েছে গৃহত্যাগের মাধ্যমে ; অপর দিকে কুন্দনন্দিনীর প্রতিবাদের প্রণালী আরও সাংঘাতিক। কুন্দনন্দিনী আত্মহননের দ্বারা তার প্রতিবাদ নগেন্দ্রকে তথা সমাজের কাছে জানিয়ে গেছে। বিধবাবিবাহে বিধবা কুন্দের আপত্তি নেই। তার সম্মতি ব্যতিরেকে নগেন্দ্র তাকে বিবাহ করতে পারে না। তা ছাড়া নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দের প্রথমাবধি গভীর কৃতজ্ঞতা ও একপ্রকার বিস্ময়মিশ্রিত আকর্ষণ ছিল, যা শেষ পর্যন্ত গভীর ভালোবাসায় পরিণতি লাভ করে। নগেন্দ্র-কুন্দের বিবাহ ও সূর্যমুখীর পলায়নের পর হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রনাথের পত্রোত্তরে বন্ধুকে লেখেন, 'আমি তোমার মন বুঝিয়াছি। কুন্দনন্দিনীকে ভালোবাসিতে না এমত নহে—এখনও ভালোবাস ; কিন্তু সে যে কেবল চোখের ভালোবাসা, ইহা যথার্থ বলিয়াছ। সূর্যমুখীর প্রতি তোমার গাঢ় স্নেহ—কেবল দুই দিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় তাহা আবৃত হইয়াছিল। এখন সূর্যমুখীকে হারাইয়া তাহা বুঝিয়াছ। ··· তুমি নিরাশ হইও না। সূর্যমুখী অবশ্য পুনরাগমন করিবেন—তোমাকে না দেখিয়া তিনি কত কাল থাকিবেন? যত দিন না আসেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকে স্নেহ করিও। তোমার পত্রাদিতে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে তিনিও গুণহীনা নহেন। রূপজ মোহ দূর হইলে, তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে। এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভালোবাসেন। ভালোবাসায় কখনো অযত্ন করিবে না ; কেন না, ভালোবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ।

ভালোবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়।'

হরদেব ঘোষালের এই পত্রেও দেখি, বিধবাবিবাহ অসমর্থিত হয়নি। সূর্যমুখী কোনোদিন যদি না-ই ফেরে তবে এই বিবাহই কালে স্থায়ী সুখের কারণ হতে পারে বলে হরদেব ঘোষাল মন্তব্য করেছে।

তাহলে কুন্দনন্দিনীর প্রতিবাদ কিসের জন্য, তার আত্মহননের প্রকৃত কারণটি তবে কী?

আমরা উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করেছি, বৈধব্যের পর কুন্দ পুনরায় বিবাহ করেছে বলে কখনো সে আত্মগ্লানি দ্বন্দ্ব বা সংস্কারের দ্বিধায় ভোগেনি। সুতরাং তার আত্মহননের কারণ বৈধব্যঘটিত কোনো মানসিক দ্বন্দ্ব বা অস্থিরতা থেকে নয়। বস্তুতপক্ষে এ উপন্যাসে যে কারণে সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ সেই কারণেই কুন্দনন্দিনীর আত্মহনন। নগেন্দ্রের প্রতি সূর্যমুখীর অগাধ প্রণয়, অপর দিকে নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দনন্দিনীর অকৃত্রিম ভালোবাসা। সূর্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের রয়েছে 'গাঢ় স্নেহ', অপর দিকে কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের যে ভালোবাসা 'সে কেবল চোখের ভালোবাসা' মাত্র—প্রকৃত প্রণয় নয়। বিধবা কুন্দকে বিবাহ করার জন্য কুন্দ অবশ্যই নগেন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ ; কিন্তু বিবাহের পরেই যখন সে বুঝলো এ বিবাহে উভয়ের মাঝে প্রকৃত ভালোবাসার সেতু নেই, তার প্রতি নগেন্দ্রের আকর্ষণ এবং তজ্জনিত আইনের আনুকূল্যে এই বিধবাবিবাহ আসলে নগেন্দ্রনাথের ক্ষণিক রূপজ মোহের পরিণামমাত্র, তখনই এই বিধবাবিবাহ কুন্দের কাছে একান্তভাবে অর্থশূন্য অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রেমহীন বিবাহ নারীর পক্ষে অপমানজনক লজ্জাজনক। কুন্দ যখন বোঝে নগেন্দ্র কেবল রূপজ মোহের তাড়নায় আইনের সুযোগ নিয়ে বিধবাবিবাহ করেছে তখন সেই অপমানের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা তার পক্ষে একান্তই অসম্ভব হয়ে ওঠে। সূর্যমুখীর মত কুন্দনন্দিনীও নগেন্দ্রের আচরণে আঘাত পায়। সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করে, কুন্দনন্দিনী নিজের জীবন বিসর্জন করে। কুন্দ যেন তার স্বেচ্ছামৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ কথাই সমাজের কাছে বলে গেল—সমাজে বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হতে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে তা বিধবা নারীর পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। সমাজের যে অবস্থা তাতে এ আইন আপাতত নগেন্দ্রনাথদের মোহ চরিতার্থতার উপায়স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ; বিধবা নারীর সম্মান ও সুখের কারণ নয়। স্বামী তারাচরণের মৃত্যুতে কুন্দ বিধবা হয়েছিল ; কিন্তু নগেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ তাকে দ্রুত মৃত্যুর পথে ঠেলে নিয়ে গেল। অন্তিম মুহূর্তে 'মুক্তকণ্ঠে' স্বামীর প্রতি তার জিজ্ঞাসা, 'তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?' বঙ্কিম বলছেন, 'নগেন্দ্র কোনো উত্তর করিতে পারিলেন না। আজি তিনি বালিকা অবাক্‌পটু কুন্দনন্দিনীর নিকট নিরুত্তর হইলেন।' অন্তিম মুহূর্তে বিধবা বালিকা কুন্দ স্বামীর কাছে মুক্তকণ্ঠে যে জিজ্ঞাসা রেখে গেল তার উত্তর নগেন্দ্রনাথ দিতে পারেনি। কে দেবে? বোধ করি এ-উপন্যাসে বঙ্কিমেরও সে-ই জিজ্ঞাসা।

॥ পাঁচ ॥

শৈবলিনী বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিপ্রতিভার আর-এক উজ্জ্বল উদাহরণ। সে তার চিন্তা ভাবনা মানসিকতা, তার চলনে বলনে ক্রিয়াকর্মে, তার চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যে তার নিজের কালকে অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। তার সংগ্রাম একপ্রকার মুক্তির সংগ্রাম। বাঙালী বধূরূপে জীবনে তার ভূমিকা কী, মূল্য কী তা সে স্পষ্টত জেনে নিতে চায়। এ জীবন নিয়ে কী করব—এ জিজ্ঞাসা ব্রাহ্মণপত্নী যুবতী শৈবলিনীর মধ্যেও গভীরভাবে দেখা দিয়েছে। সে যে একদিন রাতের অন্ধকারে চন্দ্রশেখরের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো সে-তো কেবল তার জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর প্রাপ্তির সন্ধানে। চন্দ্রশেখরের ঘরে বধূ রূপে তার নিঃসঙ্গতা একাকিত্ব তাকে উত্তরোত্তর বিষণ্ণ ও ক্লান্ত করে তোলে। এক তীব্র বিচ্ছিন্নতাবোধ ক্রমেই যেন তাকে পীড়িত ও আহত করতে থাকে। প্রাত্যহিক এই মানসিক পীড়া ও দুঃখানুভূতি শৈবলিনী সমাজের আর পাঁচটি বাঙালী বধূর মত নীরবে ও সহজে মেনে নিতে পারেনি। তার গৃহত্যাগ স্বামী চন্দ্রশেখরের কাছে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীর অস্তিত্বকে এই প্রথম স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করে। আমাদের বঙ্গীয় সমাজে সেদিন পুরুষদের মানসিকতা পরিবর্তনে নারীদের এই সংগ্রাম, এই গৃহত্যাগ, এই অস্তিত্ব প্রমাণের আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন ছিল। শৈবলিনীর গৃহত্যাগ মুহূর্তে চন্দ্রশেখরের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সে পরিবর্তনের জোয়ার বঙ্গীয় পুরুষসমাজের মধ্যেও এসে পড়ুক—ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের সে-আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে ছিল।

শৈবলিনী যে গৃহত্যাগ করেছে তা কি একান্তভাবে প্রতাপের প্রতি মোহে? শৈবলিনীর গৃহত্যাগের মূলতম কারণ প্রতাপ না চন্দ্রশেখর? এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শৈবলিনীর গৃহত্যাগের প্রধান কারণ আদৌ প্রতাপ নয়, চন্দ্রশেখরই।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শৈবলিনীর গৃহত্যাগ মূলত যেন প্রতাপের প্রতি তার পুরাতন প্রণয় ও আকর্ষণের তাগিদে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চন্দ্রশেখর-পত্নী শৈবলিনীকে ঔপন্যাসিক কামসর্বস্ব পরপুরুষলোলুপ ব্যভিচারিণী করে আঁকতে চাননি কখনই। শৈবলিনীর চরিত্রনির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্রের সে উদ্দেশ্য ছিল না।

মনে রাখতে হবে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর যখন বিবাহ হয় তখন শৈবলিনীর বয়স বারো। এই বিবাহের আট বৎসর পরে মূল আখ্যায়িকার সূচনা। এই সময় শৈবলিনীর বয়স ২০, চন্দ্রশেখরের ৪০। শৈবলিনীর যৌবনসঞ্চারের প্রথম আটটি বৎসর কেটেছে স্বামী চন্দ্রশেখরের সেবাকার্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে অনুভব করতে পারি এই আট বৎসরের দাম্পত্য জীবনে চন্দ্রশেখরের প্রতি শৈবলিনীর ভক্তি নিষ্ঠা ও আনুগত্যের অভাব ছিল না। চন্দ্রশেখরও শৈবলিনীকে পেয়ে সম্পূর্ণ সুখী ছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর যখন 'দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানার্জনের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল' চন্দ্রশেখর তখন বালিকা শৈবলিনীকে বিবাহ করেন ; এবং এই আট বৎসরের বিবাহিত জীবনে সত্যই চন্দ্রশেখরের জ্ঞানার্জনের বিঘ্ন দূর হয়েছে, অর্থাৎ চন্দ্রশেখরের বিবাহের উদ্দেশ্য

চন্দ্রশেখরের দিক থেকে সফল হয়েছে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। চন্দ্রশেখর নিজেও বিবাহের আট বৎসর পর মনে মনে এ-কথা স্বীকার করেছে।

'চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সুষুপ্তিসুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া অশ্রুমোচন করিলেন। ভাবিলেন, "হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত ; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?" '

স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, সমগ্র জীবনের পক্ষে যৌবনের দুর্লভ এই কয়টি বৎসর শৈবলিনীর দিক থেকে পতিসেবায় গৃহধর্মপালনে কিছুমাত্র শৈথিল্য বা ফাঁক ছিল না। 'ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা' প্রতাপ ও শৈবলিনীর মধ্যে একদা যে বাল্যপ্রণয় জন্মেছিল, চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর (বয়স ১২ থেকে ২০) দাম্পত্যজীবনে তার কোনো ছায়া পড়তে দেখা যায়নি। দাম্পত্যজীবনে শৈবলিনীর মনের গভীরে ক্রমে ক্রমে কোনো বেদনা ও বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এলেও শৈবলিনীর সাহচর্য সেবা সহধর্মিতায় চন্দ্রশেখর সুখী ছিল সম্পূর্ণই। একথা ঠিক শৈবলিনীর মনের গভীরে বিষাদের কোনো বিষণ্ণ ছায়া ক্রমে দেখা দিলেও দাম্পত্যজীবনে চন্দ্রশেখরের নিকট তার কোনো লক্ষণ বা আভাস প্রকাশ পায়নি। পুরাতন বাল্যপ্রণয়ের কথা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই বিস্মৃত হয়ে সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত শৈবলিনী গার্হস্থ্যধর্মে আত্মমগ্ন হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই একদা বলেছিলেন—চন্দ্রশেখরের সঙ্গে বিবাহের পর 'শৈবলিনী প্রতাপকে না দেখিয়া তাহাকে ভুলিয়া গেলেন।' ১২৮০ মাঘ বঙ্গদর্শন পত্রিকার পাঠ, ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ , 'পূর্বকথা'। শৈবলিনীর দীর্ঘ আট বৎসরের দাম্পত্য জীবনের দিকে তাকিয়েও এ-কথার স্বাভাবিক সত্যতা স্বীকার করতে হয়।

কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে বঙ্কিম বলেছিলেন, 'যাহাকে বিদায় দিবার সময়ে কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না,—কয় বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছ—"ভাল আছ ত?" হয়ত সে কথাও হয় নাই —আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয়ত রাগে, অভিমানে আর দেখাই হয় নাই। তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাহির হইলেই, যা ছিল, তা আর হয় না। যা যায়, তা আর আসে না। যা ভাঙ্গে, তা আর গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায়

দেখিয়াছ?' বঙ্কিমের এই জীবনদর্শন ও জীবন-অভিজ্ঞতার দিক থেকেও চন্দ্রশেখর-পত্নী শৈবলিনীর প্রতাপকে বিস্মৃত হওয়া স্বাভাবিক বলেই গৃহীত হবে।

এর পরেও যখন দেখি বিবাহের অষ্টম বৎসর অতিক্রমণের পর শৈবলিনী তার স্বামীর গৃহ ত্যাগ করছে, তখন প্রশ্ন জাগে—কেন? তার কারণ কি একান্ত ভাবেই প্রতাপ, নাকি সেই ইংরেজ কুঠিয়াল লরেন্স (শৈবলিনীর নিকট লরেন্স অর্থে বাঁদর) ফস্টর ; অথবা তার গৃহত্যাগের প্রকৃত কারণ স্বয়ং তার স্বামী চন্দ্রশেখর?

স্ত্রী অবিশ্বাসিনী মনে করায় কপালকুণ্ডলা স্বামীকে পরিত্যাগ করেছিল, নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করায় অপমানিতা সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করেছিল, রোহিণীকে কেন্দ্র করে গোবিন্দলাল স্বামী হিসেবে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ভ্রমরের অন্তর থেকে চিরবিসর্জিত হয়েছিল ; কিন্তু শৈবলিনীর চন্দ্রশেখরকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার পিছনে স্বামী সম্পর্কে এমনতর কোনো অভিযোগযোগ্য কারণ তো খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে পরিত্যাগ করলে কেন? তার কারণ তবুও ওই চন্দ্রশেখরই। সে কথাটাই এখানে ব্যাখ্যা করবো।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জ্ঞানী স্বামী চন্দ্রশেখরের 'পাপ'-এর কারণেই শেষ পর্যন্ত শৈবলিনীকে গৃহত্যাগ করে এক অজ্ঞাত দুর্গম কঠিন পথে একাকী পাড়ি দিতে হয়। তার এই গৃহত্যাগ সেদিনের সমাজের কাছে কুলবধূরূপে তার নীরব প্রতিবাদেরই বহিঃপ্রকাশ। যে শৈবলিনী দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করে প্রতাপকে বিস্মৃত হতে পেরেছিল সে কিন্তু দীর্ঘ আট বৎসরে স্বামীর নিকট থেকে তার প্রায় কোনো প্রত্যাশাই পূর্ণ হতে দেখেনি। সে এই আট বৎসরের বিবাহিত জীবনে নিজেকে ক্রমেই নিঃসঙ্গ একাকী এবং স্বামীর জীবনপ্রবাহ থেকে দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন বলে বোধ করেছে। শৈবলিনীর নিকট তার এই নিরানন্দ দৈনন্দিন জীবন একান্তভাবেই অর্থশূন্য ও তাৎপর্যবিহীন। চল্লিশ বৎসর বয়স্ক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চন্দ্রশেখর বিংশতিবর্ষীয়া পত্নী শৈবলিনীর দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে নিজের কাছেই প্রশ্ন করেছে—ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কুটিরে এ রত্ন 'আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ?' চন্দ্রশেখর আত্মচিন্তায় স্পষ্টত বলেছে—'আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল।' শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত স্ত্রীর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করেছে 'তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে?' বস্তুতপক্ষে শৈবলিনীকে পরবর্তী কালে যে তীব্র ঝঞ্ঝার সামনে পড়তে হয়, কঠিন জীবনসংগ্রামের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হয়, তার জন্য 'নিরপরাধিনী' শৈবলিনীকে দায়ী করা যাবে কতদূর? তার সব দায়িত্ব বহন করতে হবে জ্ঞানেন্দ্রিয়বহ্নিতে দগ্ধ 'আত্মসুখপরায়ণ' চন্দ্রশেখরকে। চন্দ্রশেখরের 'পাপ'ই শৈবলিনীর জীবনট্র্যাজেডির মুখ্য কারণ। শৈবলিনীর গৃহত্যাগের প্রকৃত কারণ চন্দ্রশেখর ; মূল সমস্যায় লরেন্স ফস্টর প্রতাপ অনুষঙ্গে এসেছে মাত্র। মূল উপাখ্যানে ফস্টর বা প্রতাপের আবির্ভাব নাও যদি ঘটতো তাহলেও শৈবলিনীর গৃহত্যাগ তার শূন্য জীবনের পক্ষে যেন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের রমণীরা তাদের নিজেদের কালকে

অতিক্রম করে অনেক বেশি প্রাগ্রসর অনেক বেশি আধুনিক।

যেমন সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ নগেন্দ্রনাথকে তীব্রভাবে আঘাত করে, এক মুহূর্তে রূপজ মোহের অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে, কুন্দনন্দিনীকে অন্তঃপুরে ফেলে সূর্যমুখীর সন্ধানে ঘর থেকে নগেন্দ্রকে বাইরে বের করে ; ঠিক সেই ভাবেই দেখি শৈবলিনীর গৃহত্যাগ শাস্ত্রজ্ঞ চন্দ্রশেখরের দিব্যচক্ষু মুহূর্তে খুলে দেয়। কমলাকান্তের মত সেও তখনই উপলব্ধি করে 'জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়।' চন্দ্রশেখর উপন্যাসে চন্দ্রশেখর হল এই জ্ঞান-বহ্নির উদাহরণ।

চন্দ্রশেখর বিদগ্ধ পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞপুরুষ, তাই নিজের 'পাপের' স্বরূপ নিজেই উপলব্ধি করতে পারে। বুঝতে তার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হয় না যে তার 'পাপ', তার 'আত্মসুখপরায়ণতা', 'বিনাপরাধিনী' শৈবলিনীর গৃহত্যাগের একমাত্র কারণ। একদিন চন্দ্রশেখর আত্মপরায়ণতার কারণে গ্লানি অনুভব করে নিজেকে প্রশ্ন করেছিল, 'এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না।' কিন্তু যেদিন চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর গৃহত্যাগের সকল সংবাদ শুনলেন সেইদিন 'সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি সকল একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোনখানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া, তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিলেন।'

সুতরাং 'অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল ; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি দর্শন ; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ্, একে একে সকলই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহুযত্নসংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।'

অতঃপর 'রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া, চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন।'

বুঝতে অসুবিধা হয় না, শৈবলিনীর আকস্মিক অন্তর্ধান চন্দ্রশেখরের মনে দারুণ আঘাত হানে। আত্মসুখপরায়ণতার মায়াজাল মুহূর্তে খসে পড়ে। স্বীয় 'পাপ' ও 'পাপের পরিণাম' সে পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারে তার জ্ঞাননেত্রে। বুঝতে পারে—'ধন, যশঃ, ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে।' যেন সে শুনতে পায় কেউ তাকে বলছে, 'যত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দার্শনিক, সংসারতত্ত্ববিদ্, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না।' নিজের মধ্যেই যেন সে এ প্রশ্নের উত্তর শুনতে পায়—'নাই।' এত দিনে পুরাণ ইতিহাস কাব্য অলঙ্কার ব্যাকরণ তাকে যে উত্তর দিতে পারেনি, সেই উত্তর সে মুহূর্তে লাভ করে শৈবলিনীর এই মর্মান্তিক অন্তর্ধানে। হৃদয়ের মর্মস্থলে অনুভব করে 'বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়।'

শৈবলিনীকে হারিয়ে চন্দ্রশেখর আজ তার চল্লিশ বৎসর বয়সে এই প্রথম যেন অনুভব করল—'মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্য-হৃদয়ের একমাত্র তৃষা—অন্য হৃদয় কামনা।' 'পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোনো মূল নাই।' মর্মভেদী দুঃখের মধ্যে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে পাঠ সে লাভ করলো, শাস্ত্রানুশীলনে রত থেকে সে-সত্য সে উপলব্ধি করতে পারেনি। আর তাই শৈবলিনীর গৃহত্যাগে চন্দ্রশেখরের অন্তর্জগতে যে দুঃখের আগুন জ্বলল তা দিয়ে তার 'পাপ'-এর প্রায়শ্চিত্ত হল ; তার এতদিনের সযত্ন সঞ্চিত পুরাণ ইতিহাস কাব্য দর্শন স্মৃতিই যে ভস্মীভূত হল তাই নয়—সেই সঙ্গে ওই অগ্নিশিখা চন্দ্রশেখরের স্বভাবের এতদিনের আত্মপরায়ণতাকেও সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিল।

চন্দ্রশেখরের কথা এত বিস্তৃত বললাম এই কারণে যে শৈবলিনীর গৃহত্যাগের প্রকৃত কারণ পাঠক যাতে উপলব্ধি করতে পারেন। শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থরাশি এক মুহূর্তে ভস্মীভূত করার মধ্য দিয়ে চন্দ্রশেখর যেন এ-কথাই ঘোষণা করতে চাইল—শৈবলিনী 'নিরপরাধিনী' ; 'পাপ'-এর প্রকৃত কারণ সে-ই স্বয়ং—গ্রন্থদাহের ঘটনা হল এতদিনের সেই সঞ্চিত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত।

এবার শৈবলিনীর কথা থেকে, তার ভাবনার জানলা থেকে দেখা যাক স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করে যাওয়ার এবং বেদগ্রামে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ সত্ত্বেও তার ফিরে না আসার প্রকৃত কারণ কী? শৈবলিনীর কথা থেকেও উপলব্ধি করা যাবে তার গৃহত্যাগের প্রথমতম ও প্রধানতম কারণ স্বামী চন্দ্রশেখর। এই পর্বে শৈবলিনীর চিন্তায় ভাবনায় কথায় কোথাও প্রতাপের প্রসঙ্গমাত্র নেই। প্রতি মুহূর্তে তার সমস্ত বেদনা বিষণ্ণতা শূন্যতা তার স্বামীকে কেন্দ্র করেই। মনের মধ্যে অন্য কোনও দ্বিতীয় পুরুষের অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র নেই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনে এ উপন্যাস প্রথম লেখেন তখন শৈবলিনীর এই গৃহত্যাগ-পর্বে প্রতাপ নামক কোনো চরিত্রের নাম পর্যন্ত পাঠকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। বঙ্গদর্শনে শৈবলিনী যখন ইংরেজের নৌকায় তখনও পাঠক প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বঙ্গদর্শনে উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশকালে প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের কথা অনেক পরে বিবৃত হয়েছে। 'পূর্ব কথা' শীর্ষক তেইশ পরিচ্ছেদে বঙ্কিম প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের পূর্ববৃত্তান্ত বিবৃত করেছেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসের পরিচ্ছেদ পরিকল্পনা থেকেও আমাদের কথাই সমর্থিত হয় যে, শৈবলিনীর গৃহত্যাগ পর্বে তার মনের মধ্যে যা কিছু বিক্ষোভ এবং বিক্ষেপ তা সম্পূর্ণত চন্দ্রশেখরকে কেন্দ্র করেই। লরেন্স ফস্টরের প্রেমে যে সে ঘর ছাড়েনি এ-কথা বোধ করি ব্যাখ্যা করার দরকার হবে না।

ইংরেজের নৌকায় নাপিতানী বেশে সুন্দরীর সঙ্গে শৈবলিনীর কথোপকথনে শৈবলিনীর এই সময়কার মনোভাবটি স্পষ্ট প্রকাশ পায়। তাদের কথোপকথনের কিছু অংশ শোনা যাক :

'শৈ। ভাল, আমি যেন গেলেম। গেলে, সেখানে আমায় ঘরে নেবেন কি?

সু। ইল্—লো! কেন নেবেন না? না নেওয়াটা পড়ে রয়েছে আর কি?

শৈ। দেখ—ইংরেজে আমায় কেড়ে এনেছে—আর কি আমার জাতি আছে?

সুন্দরী বিস্মিতা হইয়া শৈবলিনীর মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রতি মর্মভেদী তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিল—ওষধিস্পৃষ্ট বিষধরের ন্যায় গর্বিতা শৈবলিনী মুখ নত করিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ পরুষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য কথা বলবি?"

শৈ। বলিব। তোমার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, অমনি বলিতেছি। সাহবের সঙ্গে আমার এ পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। আমাকে গ্রহণ করিলে আমার স্বামী ধর্মে পতিত হইবেন না।

সু। তবে তোমার স্বামী যে তোমাকে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিও না। তিনি ধর্মাত্মা, অধর্ম করিবেন না, তবে আর মিছা কথায় সময় নষ্ট করিও না।

শৈবলিনী একটু নীরব হইয়া রহিল। একটু কাঁদিল, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "আমি যাইব—আমার স্বামীও আমায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু আমার কলঙ্ক কি কখন ঘুচিবে?"

সুন্দরী কোন উত্তর করিল না। শৈবলিনী বলিতে লাগিল, "ইহার পর পাড়ার ছোট মেয়েগুলা আমাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিবে কি না যে, ঐ উহাকে ইংরেজ লইয়া গিয়াছিল? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখন আমার পুত্রসন্তান হয়, তবে তাহার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিলে কে আমার বাড়ি খাইতে আসিবে? যদি কখন কন্যা হয়, তবে তাহার সঙ্গে কোন সুব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ দিবে? আমি যে স্বধর্মে আছি, এখন ফিরিয়া গেলে, কেই বা তাহা বিশ্বাস করিবে? আমি ঘরে ফিরিয়া গিয়া কি প্রকারে মুখ দেখাইব?"

সুন্দরী বলিল, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—সে তো আর কিছুতেই ফিরিবে না। কিছু ক্লেশ চিরকালই ভোগ করিতে হইবে। তথাপি আপনার ঘরে থাকিবে।"

শৈ। কি সুখে? কোন সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু—

সু। কেন, স্বামী? এ নারীজন্ম আর কাহার জন্য?

শৈ। সব ত জান—

সু। জানি।...তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালবাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ—অনেক পুণ্যফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে। তা যাক, সে কথা দূর হৌক—এখনকার সে কথা নয়। তিনি নাই ভালবাসুন, তবু তাঁর চরণসেবা করিয়া কাল কাটাইতে পারিলেই তোমার জীবন সার্থক! আর বিলম্ব করিতেছ কেন? আমার রাগ হইতেছে।

শৈ। দেখ, গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম, যদি পিতৃমাতৃকুলে কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি।—নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব।—নচেৎ জলে ডুবিয়া মরিব। এখন মুঙ্গের যাইতেছি। যাই, দেখি মুঙ্গের কেমন। দেখি রাজধানীতে

ভিক্ষা মেলে কি না। মরিতে হয়, না হয় মরিব। মরণ ত হাতেই আছে। এখন আমার মরণ বই আর উপায় কি? কিন্তু আমি মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ঘরে ফিরিব না। তুমি অনর্থক আমার জন্য এত ক্লেশ করিলে—ফিরিয়া যাও। আমি যাইব না। মনে করিও, আমি মরিয়াছি। আমি মরিব, তাহা নিশ্চয় জানিও! তুমি যাও।'

এখানে স্পষ্টতই আমরা দেখি শৈবলিনীর গৃহত্যাগের পিছনে তার যে মনোভাব ও মনোবেদনা কাজ করেছে, তার সঙ্গে চন্দ্রশেখরের ভাবনার মিল আছে। চন্দ্রশেখর তো নিজের মনেই বলেছিল 'আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি?' 'এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?' অপর দিকে সুন্দরীর কাছে শৈবলিনীর জিজ্ঞাসা 'কি সুখে? কোন্ সুখের আশায়' সে ঘরে ফিরবে? তদুপরি শৈবলিনী নিঃসন্তান। এমন তীব্র দুর্বিষহ নিঃসঙ্গতা এবং এমন তাৎপর্যহীন দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শৈবলিনীকে ক্রমেই বিষণ্ণতর ও শেষে বিক্ষুব্ধ ও মরণাকাঙ্ক্ষী করে তোলে। শৈবলিনী গৃহত্যাগ করে সমাজকে এ কথাটাই বুঝিয়ে দেয় যে মেয়েরা পুরুষের পত্নী অর্থে কেবল স্বামীর সেবিকা মাত্র নয়—অন্তঃপুরবাসিনী বন্দিনীমাত্র নয়—নীরবে দুঃখভার বহনের প্রতিমা বা পাষাণমাত্র নয়। স্ত্রীর মনের কথাও পুরুষকে ভাবতে হবে চিন্তা করতে হবে সমানভাবে, যেমন করে পুরুষের কথা নারী ভেবেছে। সীতারামের বঙ্কিম বলেছেন, 'স্ত্রী-পুরুষে পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে ; একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা, ইহাই দাম্পত্য-সুখ।' এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এই দাম্পত্যসুখের অভাব ছিল শৈবলিনীর জীবনে। শৈবলিনীর গৃহত্যাগ বস্তুতপক্ষে শৈবলিনীর জীবনযন্ত্রণায় অনিবার্য পরিণাম।

উপন্যাসের পরবর্তী পর্যায়ে শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের সাক্ষাৎ আকস্মিকতার লক্ষণাক্রান্ত। এবং এই পর্যায়ে প্রতাপের সঙ্গে আকস্মিকভাবে সাক্ষাতের পরেই তার প্রতি শৈবলিনীর তীব্র অনুরাগের প্রকাশ উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিসূচক নয়। উপন্যাসে প্রতাপ-শৈবলিনীর সাক্ষাৎ পর্যায়ে বলা হয়েছে শৈবলিনীর সমস্ত দুঃখের মূল প্রতাপ। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর উক্তি 'আমার এ দুর্দশা কাহা হতে? তোমা হতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য আমি গৃহধর্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য।'

এই পর্যায়ে এসে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটিকে একেবারে দুর্বল করে ফেলেন। যে পরিকল্পনা নিয়ে এ উপন্যাস শুরু করেছিলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে শৈবলিনীর গৃহত্যাগ মনস্তত্ত্বনির্ভর বাস্তবানুগামী এবং একান্ত অনিবার্য করে তুলেছিলেন, তার সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাহিনীর কোন মিল বা সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় এই পর্যায়ে এসে বঙ্কিম তাঁর কাহিনীর মূল পরিকল্পনার পরিবর্তন করেন। এর ফলে বঙ্কিম যাকে আধুনিক মনস্তত্ত্বনির্ভর নিঃসঙ্গপীড়িত এক গভীর সহানুভূতির যোগ্য 'নিরপরাধিনী' বিষণ্ণ চরিত্র করে আঁকতে চেয়েছিলেন, সেই চরিত্রই স্থূল রূপজমোহকাতর 'পাপীয়সী' এবং 'প্রায়শ্চিত্ত'-র যোগ্য চরিত্রে পরিণত হল। বঙ্গদর্শনের পাঠে বা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে

কোনো খণ্ডের কোনো শিরোনাম ছিল না। বঙ্কিম পরবর্তী কালে চন্দ্রশেখরের বিভিন্ন খণ্ডের সঙ্গে শিরোনাম যুক্ত করে দেন। ফলে যে-খণ্ডে 'নিরপরাধিনী' শৈবলিনী তার নিঃসঙ্গত্বের বিষণ্ণতার কারণে পাঠকের গভীর সহানুভূতির যোগ্য হয়ে ওঠে সেই খণ্ডেরই (প্রথম খণ্ড) পরবর্তী কালে শিরোনাম হয় 'পাপীয়সী'। আসলে বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে দুই পর্যায়ের কাহিনীর অসঙ্গতি সামাল দিতেই প্রথম খণ্ডটি 'পাপীয়সী' শিরোনামে চিহ্নিত করে দেন। এই শিরোনাম সংযোজন প্রথম খণ্ডের কাহিনীর সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিসূচক ও সমর্থনযোগ্য নয়। প্রথম খণ্ডের কাহিনীর যদি যথার্থ সঙ্গতিসূচক শিরোনাম দিতে হয় তবে তার নাম হয় চন্দ্রশেখরের ভাষাতে 'নিরপরাধিনী শৈবলিনী'। এই শৈবলিনীই আধুনিক পাঠকের মন আকৃষ্ট করে ; পরবর্তী পর্যায়ে যে শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের আকস্মিক সাক্ষাতের পর নূতন প্রণয়োপাখ্যান গড়ে ওঠে—সেই শৈবলিনী ও এই শৈবলিনী চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যে, ভাবনায় চিন্তায় আচরণে নিজ নিজ লক্ষ্যে ও বক্তব্যে এক নয়। যে শৈবলিনীকে বঙ্কিম গৃহত্যাগের দ্বারা এক সংগ্রামী রমণীরূপে এঁকেছিলেন, তাকেই পরে 'পাপীয়সী' রূপে চিহ্নিত করে ঔপন্যাসিক এই নারীচরিত্রটির প্রতি নিদারুণ অবিচার করেছেন, এবং সৃষ্টির দিক থেকেও চরিত্রটিকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন—একথা স্বীকার করতেই হবে।

॥ ছয় ॥

বঙ্গীয় নারীসমাজে ভ্রমরের মত চরিত্র দুর্লভ। তার জীবনের সমস্ত সুখ-আহ্লাদ ভক্তি ভালবাসা স্বামী গোবিন্দলালকে ঘিরে। এই গোবিন্দলালই যখন রোহিণীকে কেন্দ্র করে স্ত্রীর নিকট তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় তখনই ভ্রমর মুহূর্তে বিদ্রোহিণী হয়ে ওঠে। রোহিণীর প্রণয়াসক্ত স্বামী গোবিন্দলালকে প্রত্যাখ্যান করে ভ্রমর বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদের উদাহরণ স্থাপন করে যায়। নারীর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার্থে নারীর ইচ্ছা এবং আগ্রহেই এই স্বামিবিচ্ছেদ। ভ্রমরের এই ব্যক্তিত্ব এই আচরণ এই প্রতিবাদ তার কালের নারীসমাজের কাছে অপ্রত্যাশিত, অচিন্তনীয়। সেদিনের কথা কেন, একালেও বঙ্গসমাজে কয়জন রমণী কয়জন গৃহবধূ ভ্রমরের সমগোত্রীয় হতে পেরেছে। একথা বৃহৎ বঙ্গসমাজের দিকে তাকিয়েই বলছি ; আধুনিক শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত সমাজের দু-চারটি ঘটনার কথা ধরে নয়। বস্তুত এ-কালের পক্ষেও ভ্রমর আধুনিক, কালোত্তীর্ণ। বঙ্কিম বাঙালী নারীসমাজের কাছ থেকে যে চরিত্র যে শক্তি যে সাহস যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে আত্মমর্যাদাবোধ প্রত্যাশা করেন ভ্রমর চরিত্র রূপায়ণের মধ্য দিয়ে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু *আনন্দমঠ* লিখে দেশের স্বাধীনতা চাননি ; কেবল সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা আসে না। সমাজের যথার্থ সংস্কার ও উন্নতি না ঘটলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট অর্থহীন। তাই দেশের বুকে বঙ্কিম ভ্রমরদের মত নারীর আবির্ভাব প্রত্যাশা করেছেন। তাদের সংস্কারবিমুখ তথাকথিত শাস্ত্র ও ধর্মভয়শূন্য বলিষ্ঠ

দৃপ্ত মানসিকতা বাঙালী মেয়েদের নতুন করে ভাবতে শেখাবে, পুরুষকেও নতুন করে ভাববার সুযোগ এনে দেবে। যুগ যুগ ধরে বাঙালী রমণী পতিগৃহের অন্তঃপুরে পুরুষের যে 'দাসীত্ব' করে এসেছে তার থেকে তাদের মুক্তি প্রয়োজন। আগে ঘরের স্বাধীনতা আসুক, সমাজের মুক্তি ঘটুক ; পরে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করা যাবে। পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তির জন্য সাহিত্যের প্রান্তরে শুধু আনন্দমঠের 'আনন্দ'রাই লড়াই করেনি ; ব্যাপকতর মুক্তির সংগ্রামে অংশ নিয়েছে সূর্যমুখী কুন্দ এবং ভ্রমরেরা।

যখন ভ্রমরের মনের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হল যে তার স্বামী গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রণয়াসক্ত তখনই ভ্রমর কাগজ কলম নিয়ে স্বামীর উদ্দেশে একখানি চরম পত্র লিখল। স্ত্রীর পত্রে ভ্রমর লিখল :

'তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার ওপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও ভক্তি ; যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ি আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।'

শুধু বঙ্গসাহিত্যেই নয়, বঙ্গসমাজের ইতিহাসেও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এমনতর চরম পত্র ইতিপূর্বে কখনো লিখিত হয়েছে বলে মনে হয় না। এক একটি উপন্যাসে নায়িকাদের চিন্তা ভাবনা মানসিকতা, ক্ষোভ যন্ত্রণা ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম তাঁর কালের বঙ্গসমাজকে একশো দুশো বছর সামনে এগিয়ে দিয়ে গেছেন।

ভ্রমরের আরও একখানি চিঠি আমরা উদ্ধার করবো। দীর্ঘ ছয় বৎসর অদর্শনের পর স্বামীর কাছ থেকে এক করুণতম পত্র ('পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?') পেয়ে ভ্রমর উত্তরে লেখে, 'আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যত দিন না আমার নূতন বাড়ি প্রস্তুত হয়, তত দিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট—আপনিও যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।'

স্ত্রীর দিক থেকে বস্তুত বিবাহ-বিচ্ছেদের এমন নির্মম এবং কঠিনতম ঘোষণা সেদিনের বঙ্গসমাজের পক্ষে সত্যিই অকল্পনীয়।

আমরা এখানে বঙ্কিমসৃষ্ট পাঁচটি নারীচরিত্রকে উপলক্ষ করে বঙ্কিমচন্দ্রকেই নতুন করে একবার বুঝবার চেষ্টা করলাম। এই পঞ্চ কন্যারই স্বভাব ও চরিত্রগত কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়, এই পাঁচটি নারীরই জীবনের গতি যেন একই ধারায় প্রবাহিত, এদের সকলের জীবনই অতি বিষাদময় ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেউই জীবনযুদ্ধে আত্মমর্যাদার সংগ্রামে পরাস্ত নয়। এরা প্রয়োজনে কেউ স্বামীকে পরিত্যাগ করেছে, কেউ মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করে নিয়েছে ; কিন্তু কখনো আত্মর্যাদার প্রশ্নে এরা কেউ পুরুষের কাছে মাথা নত করেনি। এরা একই সঙ্গে ক্ষমাময়ী আবার কঠিন, দয়াময়ী অথচ দর্পিতা, স্নেহময়ী কিন্তু

তেজস্বিনী। তথাকথিত শাস্ত্র সমাজ ও ধর্মের বিচারে এই রমণীরা হয়তো আদর্শ গৃহবধূর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যায়নি ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট এরাই আদর্শ রমণী, প্রকৃত অর্থে এরাই যথার্থ সতী। যে সৎ, যে মিথ্যার বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম করে, যে ন্যায় এবং সত্যকেই ধ্রুব জ্ঞান করে জীবনপথে অগ্রসর হয়, সেই আদর্শ চরিত্র, সেই রমণীই 'ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, সেই সতী'। এরা বাহ্যত কুলকামিনী কুলবধূ, কিন্তু মূলত এই রমণী সম্প্রদায় তার চেয়েও বেশি—এরা বরনারী হয়েও কার্যত বীরনারী, গৃহাঙ্গনা হয়েও প্রকৃতপক্ষে বীরাঙ্গনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে 'মহাপুরুষ'-এর মুখ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়েছেন—"এখন ইংরেজ রাজা হইবে", "ইংরেজকে রাজা করিব।"

উপন্যাসের পরিণতিতে যখন হিন্দু সন্তানদল সংগ্রামে জয়লাভ করল, তখন এই প্রশ্ন এসে দেখা দিল—কে দেশের রাজা হবে? রাজ্য শাসনের মহান্ দায়িত্ব কার হাতে থাকবে? হিন্দু অথবা মুসলমান, অথবা সমুদ্র পেরিয়ে আসা বহিরাগত ইংরেজ গোষ্ঠীর হাতে?

উপন্যাসে এ প্রশ্ন যে উত্থিত হয়েছে তা কেবল উপন্যাসের কাহিনীর প্রয়োজনেই মাত্র নয়—এ প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের জিজ্ঞাসারই প্রতিধ্বনি।

তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম থেকেই দেশের স্বাধীনতা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। কেন একটা দেশকে স্বাধীন বলব? কী কী গুণে সেই দেশটা স্বাধীন? কেন একটা দেশকে পরাধীন বলব? কী কী কারণে সেই দেশ পরাধীন?

একটা দেশ কি কেবল সেই দেশবাসীর দ্বারা শাসিত হলেই সেই দেশ স্বাধীন? আর একটা দেশ কি শুধু সেই দেশের মানুষের দ্বারা শাসিত না হয়ে বহিরাগত শাসক কর্তৃক শাসিত বলেই কি পরাধীন? এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা প্রথাগত ধারণাবদ্ধ নয়—এখানে তাঁর চিন্তা অতিশয় মৌলিক এবং সবিশেষ যুক্তিনির্ভর।

বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা মনে করেন না যে, একটা দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা বা পরাধীনতা সেই দেশের শাসক স্বদেশবাসী অথবা স্বদেশবাসী নয়—তার উপর নির্ভরশীল। এই কথাটি বিশেষভাবে বোঝাবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে দুটি শব্দের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শব্দ দুটি হল 'Liberty' এবং 'Independence'. সাধারণভাবে এই দুই শব্দেরই অর্থ 'স্বাধীনতা' হলেও, 'Liberty' ও 'Independence' এই উভয়ের স্বাধীনতার প্রকৃতি একরূপ নয়। এখনও পর্যন্ত প্রচলিত সংস্কার এই রকমই আছে যে—স্বদেশবাসী-শাসিত দেশই হল স্বাধীন ; পরদেশী কর্তৃক শাসিত দেশ মানেই পরাধীন দেশ। বঙ্কিম আদৌ এই প্রচলিত ধারণার অনুগামী নন।

'Liberty' ও 'Independence' এর মধ্যে 'Liberty' শব্দটির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে চান। 'Independence' অপেক্ষা 'Liberty'-র তাৎপর্য বা ভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে অনেক বেশি।

অনেকেই মনে করে থাকি, মুঘল শাসনকালটি ছিল ভারতবর্ষের পরাধীনতার কালপর্ব। আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলে অভিহিত করে থাকি ১৯৪৭ সাল থেকে—এ

দেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করে দেখেছেন আমরা যাকে 'স্বাধীনতা'-'স্বাধীনতা' বলে অভিহিত করে থাকি সেটা আসলে একান্তভাবেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন—একটা দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা—অর্থাৎ সেই দেশটা যথার্থ অর্থে স্বাধীন কি না তা সেই দেশের রাজা কে বা শাসক কে তার উপরে নির্ভর করে না। প্রকৃত স্বাধীনতা নির্ভর করে শাসিত মানুষের—অর্থাৎ দেশের জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত জীবনযাত্রার উপরেই একান্তভাবে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বচ্ছন্দে একটি দেশকে প্রকৃত স্বাধীন বলে উল্লেখ করতে পারেন—সেই দেশের রাজা বা শাসক বহির্দেশীয় হয়েও যদি শাসিত জনসাধারণ সুখী এবং সমৃদ্ধ হয়। অর্থাৎ বাহ্যত 'পরাধীন' একটি দেশকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীন বলে অভিহিত করতে কুণ্ঠিত নন।

ঠিক সেই রকম স্বদেশবাসী-শাসিত একটি তথাকথিত স্বাধীন দেশকে স্বাধীন বলে নির্দেশ করতে অসম্মত বঙ্কিমচন্দ্র, যদি দেখা যায় সেই দেশের সাধারণ মানুষগুলোই শোষিত নির্যাতিত এবং অসুখী।

শাসকশ্রেণীর বা শাসনকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগোষ্ঠীর স্বাচ্ছন্দ্য সমৃদ্ধি ও বৈভব—সেই বৈভব ও সমৃদ্ধি স্বদেশী বা বিদেশী যে শাসক সম্প্রদায়েরই হোক—তার দ্বারা সেই দেশের সাধারণ জনসমূহের সুখ-সমৃদ্ধি ও উন্নতি কখনই প্রতিবিম্বিত হয় না। একটা দেশের প্রকৃত সমৃদ্ধি নির্ভর করে সেই দেশের সাধারণ সমগ্র প্রজাকুলের সুখ এবং সমৃদ্ধির উপরেই।

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গের কৃষক সম্প্রদায় তথা সাধারণ প্রজাসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তকে নির্বাচন করে নিয়েছেন। সীমিত সংখ্যক মানুষ নয়, দেশের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর মঙ্গলের প্রতিই বঙ্কিমচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা। সীমিত সংখ্যক ওই সমৃদ্ধ মানুষের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা—"দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোনো মঙ্গল নাই।"

সেই স্বাধীনতার বিশেষ কোনও মূল্য বা তাৎপর্য নেই যে-স্বাধীনতা দেশের অধিকাংশ মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি ও মঙ্গলের কারণ হয়ে না ওঠে।

হিন্দুশাসিত প্রাচীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। রাজকার্য দুই অংশে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধাদির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ছিল ; আর রাজব্যবস্থা-নির্বাচন, বিচার ইত্যাদি কাজের ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। বঙ্কিমের মতে 'প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃতরূপে রাজপুরুষ পদে বাচ্য' ছিলেন। উৎকৃষ্ট বর্ণত্রয়, শূদ্রের তুলনায় ছিল

অতিশয় অল্প সংখ্যক। প্রকৃতপক্ষে অধিক সংখ্যক শূদ্ররাই ছিল চিরকাল ভারতবর্ষের প্রজা সাধারণ। ব্রাহ্মণ সন্তান বঙ্কিমচন্দ্র এ-কথা বলতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি যে, আধুনিক ভারতে একজন সাধারণ ভারতীয় ও ইংরেজের মধ্যে যে বৈষম্য, তার চেয়ে অনেক বেশি পীড়াদায়ক বৈষম্য ও ব্যবধান ছিল প্রাচীন ভারতে সাধারণ প্রজা শূদ্রের সঙ্গে রাজপুরুষ ব্রাহ্মণের।

প্রজাসাধারণের প্রতি ইংরেজকৃত বৈষম্য ও ব্রাহ্মণশাসিত বৈষম্যের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র মূলগত কোনও প্রভেদ নির্দেশ করতে প্রস্তুত নন। পীড়িতের যন্ত্রণা—সেটা যার আঘাতেই আসুক—তার নিকট কষ্টদায়ক। বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর উপলব্ধিজাত উক্তি, "যে পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন, উভয়ই সমান। স্বজাতের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না।"

প্রাচীন ভারতে শূদ্র সংখ্যায় অধিক হয়েও ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের শিকার হয়েছে। অথবা বলা চলে সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণের হাতে শূদ্র সেদিন অবহেলিত এবং তীব্র বৈষম্যের শিকার হয়েছে। যে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে এই বৈষম্য, বর্ণে-বর্ণে এই প্রভেদ, যে দেশে সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধি ছিল অবহেলিত, যেখানে সীমিত সংখ্যক মানুষের প্রাধান্যই ছিল প্রকট—সেই ভারতবর্ষকে, ব্রাহ্মণশাসিত সেই প্রাচীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন ভারতবর্ষ বলে আখ্যা দিতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্মত নন।

পীড়া বা বঞ্চনা যার কাছ থেকেই আসুক—তা সে স্বদেশী ব্রাহ্মণের হাত থেকেই আসুক, বা মুঘল ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকেই আসুক, অথবা ইংরেজ রাজশক্তির নিকট থেকেই আসুক, পীড়িতের পীড়ার যন্ত্রণায় কোনও প্রভেদ নেই।

সুতরাং একথা বলতে পারি না যে, দেশের রাজা স্বদেশবাসী হলেই দেশ স্বাধীন হল ; এবং একথাও বলা যাবে না যে, দেশের রাজা বিদেশাগত হলেই দেশটা পরাধীন হল।

যদি একটি তথাকথিত পরাধীন দেশের সাধারণ মানুষ সুখী ও সমৃদ্ধ হয় বহিরাগত রাজশাসন কৌশলের কারণে—তবে সেই দেশকেই বলব স্বাধীন ; তেমনি একটি তথাকথিত স্বাধীন দেশের জনসাধারণ যদি পীড়িত ও বঞ্চিত হয় তার স্বদেশীয় রাজশক্তির কাছেই তবে সেই তথাকথিত স্বাধীন দেশটিকে পরাধীন বলেই নির্দেশ করা প্রয়োজন। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিধাহীন বলিষ্ঠ ঘোষণা—মহামতি আকবর শাসিত ভারতবর্ষ ছিল প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ভারতবর্ষ। দেশের শাসক হিন্দু না মুসলমান কি ইংরেজ—তার উপর দেশের স্বাধীনতা নির্ভর করে না। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যের বিষয় হল যিনি শাসক—তিনি ভাল না মন্দ, সহৃদয় না নিষ্ঠুর, সহানুভূতিশীল নাকি অত্যাচারী, প্রজানুরাগী কিংবা তার বিপরীত? বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থের দিক থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা পরাধীনতার প্রশ্নটা এখানে বড় কথা নয়। সুখী দেশবাসীর দেশই স্বাধীন দেশ, রাজা যেই হোক।

যখনই বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণভাবে দেশবাসীর কথা বলেছেন তখনই তিনি সামগ্রিকভাবে দেশের সকল মানুষের কথা মনে রেখেই তা বলেছেন। কখনই কোনও বিশেষ শ্রেণী—হিন্দু কি মুসলমানের কথা আলাদা করে ভেবে বলেননি। তাঁর চিন্তায় সাধারণ মানুষ বলতে কী হিন্দু কী মুসলমান সকল সম্প্রদায়ই একত্রিত হয়েছে।

বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠ ধারাবাহিক সূচনার (১২৮৭ চৈত্র) পূর্বে বঙ্কিম ওই পত্রিকার ১২৮৭ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন "লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলা যায়, যাহারা বাঙ্গালা দেশে বাস করে, বাঙ্গালা ভাষায় কথা কয়, তাহাদিগের মধ্যে অর্ধেক মুসলমান।" আদমসুমারীর অনেক পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র জেনেছিলেন বঙ্গের প্রজা সম্প্রদায়ের অর্ধেক মুসলমান। আর তাই বঙ্গদর্শনে ১২৭৯-র চার সংখ্যা জুড়ে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিম একই সঙ্গে হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন। দেশের সমগ্র মানুষের সুখ এবং মঙ্গলই বঙ্কিমের একমাত্র স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। 'দুই চারিজন অতি ধনবান ব্যক্তির পরিবর্তে' বঙ্কিম 'ছয় কোটি সুখী প্রজা' দেখতে চান। এই ছয় কোটির তিন কোটি হাসিম শেখ আর বাকি তিন কোটি রামা কৈবর্ত সম্প্রদায়ের। এই ছয় কোটি দেশবাসীকে যিনি সুখী ও সমৃদ্ধ করতে পারবেন তিনিই প্রকৃত রাজা বা শাসক বলে পরিগণিত হবেন এবং সেই শাসক-কর্তৃক পরিচালিত দেশই হবে প্রকৃত স্বাধীন দেশ।

মৃত্যুর পূর্ব বৎসর, পরিবর্ধিত 'রাজসিংহ'র উপসংহারে 'গ্রন্থকারের নিবেদন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এক শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানেই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে—হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই—হিন্দু হোক, মুসলমান হোক —সেই নিকৃষ্ট।"

রাজার ধর্ম কী? প্রজার সুরক্ষা ও মঙ্গলবিধানই রাজার ধর্ম।

যদি দেশবাসী হিন্দুরাজার রাজত্বকালে সুখী ও সমৃদ্ধ হয় তবে সেই হিন্দুশাসিত রাজ্য স্বাধীন রাজ্য। যদি কোনও মুসলিম রাজত্বকালে দেশবাসী দুর্দশাগ্রস্ত হয় তবে সেই দেশ পরাধীন। ঠিক তেমনই, দেশবাসী যদি মুসলিম রাজত্বকালে সুখী ও সমৃদ্ধ হয় তবে সেই মুঘল শাসিত রাজ্য হল স্বাধীন রাজ্য ; আর কোনও হিন্দুর রাজত্বকালে প্রজাসাধারণ যদি নিপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয় তবে সেই দেশ পরাধীন।

এই প্রসঙ্গে ১২৯২ ভাদ্র (১৮৮৫ আগস্ট) সংখ্যার 'প্রচার' পত্রিকা থেকে 'সীতারাম' উপন্যাসের একটি অংশ উদ্ধৃত করছি এখানে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনের শেষ

উপন্যাসে মুসলমান ফকির চাঁদশাহের মুখ দিয়ে হিন্দুরাজা সীতারামের উদ্দেশে বলেছিলেন—

"বাবা! শুনিতে পাই, তুমি হিন্দু রাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই একজনই হিন্দু মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাকে হিন্দু করিয়াছেন তিনিই করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান ; উভয়েই তোমার প্রজা হইবে। অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাস ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে (১২৮৭ চৈত্র) লেখা শুরু হলেও এর মূল কাহিনীর সময়কাল ছিল তার শতবর্ষ পূর্বেকার। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় এর কাহিনী নির্মিত। অর্থাৎ বঙ্গাব্দের হিসাবে ১১৭৬, খ্রিস্টীয় হিসাবে সেটা ১৭৬৯-৭০ সাল। আনন্দমঠ উপন্যাসের শেষে আমরা দেখতে পাই মুঘল শক্তি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে সত্যানন্দ ঠাকুরের প্রতি চিকিৎসকের উক্তি, "তোমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য নাই। অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই।"

হিন্দু কর্তৃক মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হলেও এই হিন্দুর হাতে, বিজয়ী-সন্তান-সম্প্রদায়ের হস্তে, বঙ্কিমচন্দ্র রাজ্য শাসনের ক্ষমতা বা অধিকার তুলে দেননি কখনই।

ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখেছি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তি ক্ষমতায় এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর নিজস্ব চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়েছেন কেন সেই সময়টি ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল সময় ছিল না। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা অভিব্যক্ত হয় চিকিৎসকের উক্তিতে। মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হলেও হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হবে না। হিন্দু নয় মুসলমান নয় ; মহাপুরুষের স্পষ্ট উক্তি, "এখন ইংরেজ রাজা হইবে।" মহাপুরুষ, সত্যানন্দকে বলেছেন, "তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না।...ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।...তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম।...প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান সে-ই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।...এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই— শিখায় এমন লোক নাই ; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু।

সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন ধর্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যত দিন না তা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান গুণবান আর বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।"

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত হল— ঔরঙ্গজেব শাসিত যে ভারতবর্ষ সেই ভারতবর্ষ হল পরাধীন ভারতবর্ষ ; আর সেই ভারতবর্ষই হল প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ভারতবর্ষ, যার শাসনকর্তা ছিলেন মহামতি আকবর বাদশাহ। কী কারণে ঔরঙ্গজেবশাসিত ভারতবর্ষকে পরাধীন ভারত বলা হচ্ছে? বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শাসক হিসেবে ঔরঙ্গজেব ছিলেন ধর্মশূন্য ; এবং সেই কারণে তাঁর রাজত্বকাল থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনেরও সূচনা। যেমন আকবর শাসিত ভারতবর্ষ ও ঔরঙ্গজেব শাসিত ভারতবর্ষের তুলনা করেছেন, তেমনই তিনি তুলনা করেছেন ব্রিটিশ শাসিত আধুনিক ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রাহ্মণে শাসিত প্রাচীন ভারতবর্ষের। "এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর?" এই প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের জবাব— "আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু সুখ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় তুল্য, বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল।"

একালে দেশী-বিলাতি অপেক্ষা প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে বৈষম্য গুরুতর কেন?

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ইংরেজ কৃত রাজব্যবস্থা অনুসারে, দেশী অপরাধীর জন্য এক বিচারালয়, বিলাতি অপরাধীর জন্য অন্য বিচারালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্তৃক দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ইংরেজ দেশী-বিচারক কর্তৃক দণ্ডিত হতে পারে না। বৈষম্য শুধু এইখানে, ইংরেজ-আইনে দেশী বিলাতি উভয় অপরাধের দণ্ড এক—আইনের চোখে উভয়েই সমান। কিন্তু প্রাচীন ব্রাহ্মণ রাজ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে বৈষম্য অতি গুরুতর। ইংরেজ রাজ্যে একজন দেশীয় লোক ইংরেজকে বধ করলে যেমন বধের যোগ্য, তেমনি একজন ইংরেজ কোনও দেশীয় লোককে বধ করলেও একই রূপে বধের যোগ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজ্যে শূদ্রহন্তা ব্রাহ্মণের ও ব্রাহ্মণহন্তা শূদ্রের দণ্ডের মধ্যে অনেক বৈষম্য।

তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তৎকালীন বেঙ্গল ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন। বৈষম্যের বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন ব্রাহ্মণেরা ইংরেজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন। তুলনায় ইংরেজ উৎকৃষ্ট এবং সময়কালের পটভূমিকায় সেই ইংরেজই সবিশেষ আকাঙ্ক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য।

'আনন্দমঠে' সন্তান দলের পরিবর্তে যে-ইংরেজের হাতে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের শাসনভার তুলে দিতে চেয়েছিলেন, সেই ইংরেজ সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ গভীর অনুকূল মনোভাব দেখতে পাই তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকার একেবারে সূচনাপর্বেই ; প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধটিতেই। তাঁর 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, "ইংরাজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরাজের ধার ভারতবর্ষ কখন

শোধিতে পারিবে না। ইংরাজ বাণিজ্য বাড়াইতেছে, রেলওয়ে বসাইতেছে, টেলিগ্রাফ খাটাইতেছে, শান্তিরক্ষা করিতেছে, সদ্বিধি প্রচার ও সুবিচার বিতরণ করিতেছে ; কিন্তু এ সকলের জন্য বলি না। ইংরাজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে ; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে ; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য।"

আনন্দমঠের শেষ পরিচ্ছেদে যদিও বলা হয়েছে যে 'ইংরেজকে রাজা করিব', কিন্তু, সেই সঙ্গে এই সম্ভাবনারও ইঙ্গিত সেখানে আছে যে, একদিন সুসময় আসবে এবং ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটবে। বঙ্কিমের স্বপ্ন মিথ্যা হয়নি। ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটেছে, দেশও স্বাধীন হয়েছে। তাঁর জীবৎকালে বঙ্কিম ইংরেজ ও ব্রাহ্মণের তুলনা করেছিলেন। আজ যদি সেই বঙ্কিম এসে আবির্ভূত হতেন অবশ্যই তিনি এই আধুনিক স্বাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে পূর্ববর্তী ইংরেজ রাজত্বের একটা তুলনামূলক বিচার করতেন। একালের হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তদের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি কী রায় দিতেন—জানি না।

হেম-মধু-বঙ্কিম-নবীন

মধুসূদন তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অন্তর্গত 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক কবিতায় বলেছিলেন 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন'। পরবর্তী কালে অতুলপ্রসাদ সেন 'বাংলা ভাষা' শীর্ষক কবিতায় লেখেন 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা'। অতুলপ্রসাদ তাঁর এই কবিতায় আমাদের গর্ব করবার মত সাতজন বাঙালী কবির নামোল্লেখ করে গেছেন—'বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন।' এই সাতজনের তিনজন প্রাগাধুনিক, শেষ চারজন আধুনিক কালের কবি—উনিশ শতকে আবির্ভূত। আমাদের বর্তমান নিবন্ধটি এই হেম-মধু-বঙ্কিম-নবীনকে নিয়েই। আমাদের মূল লক্ষ্য মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র, তবে আলোচনার অনুষঙ্গে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রও বারেবারেই আসবেন। ছন্দ থেকে মুক্তি নিয়ে যদি গদ্যের ভাষায় এঁদের নামোল্লেখ করি, তাহলে ক্রমটা দাঁড়ায়—মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ খ্রি), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮ খ্রি), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ খ্রি) ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭ খ্রি)। দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্র সমসাময়িক, মধুসূদন বঙ্কিম থেকে চৌদ্দ বছরের পূর্ববর্তী আর নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের নয় বছরের পরবর্তী। তবে এই চারজনের মধ্যে গ্রন্থ-প্রকাশের দিক থেকে সাহিত্যে প্রথম আবির্ভাব বঙ্কিমচন্দ্রের। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে, মধুসূদনের ১৮৫৯, হেমচন্দ্রের ১৮৬১ আর নবীনচন্দ্রের আরও দশ বছর পরে ১৮৭১-এ। এঁদের মধ্যে মধুসূদন সবচেয়ে স্বল্পায়ু ছিলেন ; তিনি যখন মারা যান 'বঙ্গদর্শন' তখন সবে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে—১৮৭৩। স্বল্পায়ু অবশ্য বঙ্কিমও ছিলেন। মধুসূদন ৪৯, বঙ্কিম ৫৬। তুলনায় হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়ু। হেমচন্দ্র ৬৫, নবীনচন্দ্র ৬২। মধুসূদনের লেখা বারোটি বইয়ের মধ্যে প্রথম নয়টি বই ছাপা হয় ১৮৫৯ থেকে ১৮৬২ সালের মধ্যে—মোট চার বছরের মধ্যে। শেষ তিনটি বই বেরোয় যথাক্রমে '৬৬, '৭১ এবং কবির মৃত্যুর পর ১৮৭৪-এ। এই সন-তারিখের হিসাব থেকে বোঝা যাচ্ছে, মধুসূদনের বইপত্রের তিনচতুর্থাংশ যখন বেরিয়ে গেছে তখনো পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যের আসরে অবতীর্ণ হননি—দুর্গেশনন্দিনী তখনো রচিত হয়নি, শুধু তাঁর ক্রেডিটে তখন একখানি ক্ষুদ্র কবিতার বই। মধুসূদনের দশম পুস্তক চতুর্দশপদী কবিতাবলী যে বছর প্রকাশিত হয় সেই ১৮৬৬-তে বঙ্কিমের দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুণ্ডলা মুদ্রিত হয়। এর ক' বছর পূর্বে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশ উপলক্ষে কালীপ্রসন্ন সিংহ মধুসূদনকে সংবর্ধিত করেছিলেন সত্য, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনকে যিনি প্রথম দুর্লভ সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে এক মুহূর্তে কালিদাস, শ্রীহর্ষ, সেক্সপিয়র, ওঅর্ডসওঅর্থ, কিট্‌স্, বায়রনের

সমগোত্রীয় করে তোলেন তিনি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম পথিক বঙ্কিমচন্দ্র।

ঘটনাটা সত্য : বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের এক মুগ্ধ পাঠক। নতুন ছন্দ অমিত্রাক্ষর তাঁকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ছবিটা বেশ দেখতে পাই : মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হয়ে গেছে। ললিতা-পুরাকালিক গল্প তথা মানস-এর তরুণ কবি বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের কাব্যখানি হাতে নিয়ে উচ্চকণ্ঠে তা থেকে পুলকিত বিস্ময়ে আবৃত্তি করে চলেছেন : "চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে/কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাদিনু, সুভগে,/বৃথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র, ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,/পুরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া/অভাগীর আর্তনাদ ; প্রভঞ্জন-বলে/ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,/কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?/ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে/কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,/কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী ; ছড়াইনু পথে ; /তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,/আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।" বঙ্কিমচন্দ্র আবৃত্তি করে চলেছেন, আর সকলে তাঁকে ঘিরে অবাক-কৌতূহলে শুনছে—নতুন ছন্দ নতুন বাণী নতুন উপস্থাপন। সেদিনের অনেক পাঠক অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়তে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমের অনুজ-ভ্রাতার তো এই ছন্দের নাম শুনলে গায়ে জ্বর আসত। 'কিন্তু যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিতে শুনিলাম, সেইদিন হইতে আমি এই কাব্যের গোঁড়া হইলাম।' বঙ্কিম মেঘনাদবধ কাব্য থেকে আবৃত্তি করলে আশ-পাশে লোক দাঁড়িয়ে যেত। তখন কি কেউ ভেবেছিল সীতার এই 'কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা, কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী' ক'বছর পরেই 'কপালকুণ্ডলা'র সর্বাঙ্গ-জুড়ে উপন্যাসে শোভা পাবে!

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের চার খণ্ডে মোট একত্রিশ পরিচ্ছেদ। প্রতিটি পরিচ্ছেদই শুরু হয়েছে কোনো শ্রেষ্ঠ রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। এই উদ্ধৃতি সংগৃহীত হয়েছে ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য থেকে। মোট উদ্ধৃতির এক চতুর্থাংশ বাংলা। বিদ্যাপতিকে যদি বাংলা ধরি তো তাঁর একটি, বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত অন্তরঙ্গ সুহৃৎ দীনবন্ধু মিত্রের একটি, আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে ছয়টি। সমকালীন এই কবির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আদৌ কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল—এমন সংবাদ আমাদের কাছে নেই। মধুসূদন থেকে ছয়টি উদ্ধৃতির মধ্যে মেঘনাদবধ থেকে তিনটি, বীরাঙ্গনা থেকে দুটি ও ব্রজাঙ্গনা থেকে একটি। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের চার বছর আগে বেরোয় মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা ; আর মাত্র তিন বছর আগে মুদ্রিত হয় বীরাঙ্গনা কাব্য। এত সাম্প্রতিক লেখাও বঙ্কিম গভীর মনোযোগ সহকারে পড়েছেন এবং সুকবি ও সুকাব্য আবিষ্কারে তাঁর কিছুমাত্র বিলম্ব বা দ্বিধা ঘটেনি। শুধু মধুসূদনের কাব্যের অভিনব শৈলীর জন্য নয়, সেই কাব্যের যে মূল বাণী—তা বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল ; মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা বীরাঙ্গনা বঙ্কিমকে তাঁর বেশ কয়েকটি বিদ্রোহিণী নায়িকা-নির্মাণে প্রভাবিত করে থাকবে। কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিম তো একপ্রকার তার স্বীকৃতিই জানিয়ে গেছেন।

কপালকুণ্ডলার চতুর্থ খণ্ডের 'শয়নাগারে' শীর্ষক প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম ব্রজাঙ্গনার 'সারিকা' শীর্ষক তেরো সংখ্যক কবিতার একটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন—'রাধিকার বেড়ি

ভাঙ্গ—এ মম মিনতি।' এটি কবিতার চতুর্থ স্তবক থেকে নেওয়া। ছয় স্তবকের কবিতা থেকে আর দু-একটি ছত্র উদ্ধৃত করছি। তৃতীয় স্তবকে রাধা বলছে—'রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞ্জরে।' ষষ্ঠ স্তবকে রাধা বলে—'ভাল যে বাসে, স্বজনি, কি কাজ তাহার রে—কুলমান ধনে?/শ্যামপ্রেমে উদাসিনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী—/কি কাজ তাহার আজি রত্ন আভরণে?'

ব্রজাঙ্গনার শ্রীরাধার ভাবনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার ভাবনায় মূলগত কোনো প্রভেদ নেই। ব্রজাঙ্গনার শ্রীরাধিকা কি মধুসূদনের কাছে শুধুই ব্রজেরই অঙ্গনা? এভাবে ভাবলে মধুসূদনকে একান্তই ভুল বোঝা হবে। মধুসূদনের ধারণা বন্ধু রাজনারায়ণও রাধাকে ঠিক ধরতে পারেননি।

১৮৬১ আগস্ট ২৯ বন্ধুকে পত্রে লেখেন—

'I think you are rather cold towards the poor lady of Braja, Poor man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a 'Bard' like your humble servant, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours.'

কবিতার পাঠককে ধর্মান্ধ হলে চলবে না।

ব্রজের অঙ্গনা শ্রীরাধাকে মধুসূদন বঙ্গাঙ্গনা রূপেই দেখতে চেয়েছেন। কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার ভালবাসার দুর্নিবার আবেগ এবং আকুলতাটাই মধুসূদনের কাছে রাধার জীবনের সবচেয়ে বড় দিক হয়ে দেখা দিয়েছে। তার এই উচ্ছ্বসিত ঐকান্তিক সমর্পিত প্রেম তাকে মনেপ্রাণে বাধাবন্ধনহীন করে তুলেছে। প্রেমের এই অকৃত্রিম স্বতোৎসারিত অনুভূতিটাই কবিতার পাঠকের কাছে সবচেয়ে সত্য। রাধা এই প্রেমের জন্য বেড়ি ভাঙতে চায়, সংসার-পিঞ্জর ভেঙে ফেলতে চায়, কুলমান ইত্যাদির সংকীর্ণ সংস্কার তার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ।

মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসায়, তার মঙ্গলকামনায় যে আত্মোৎসর্গ—তার মধ্যে কোথায় পাপের অস্তিত্ব? মধ্যরাত্রে নির্জন সমুদ্র-সৈকতে নবকুমারের প্রাণরক্ষা যে করে, সে যখন আর-এক মধ্যরাত্রে তার ননদ শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে 'বশ' করার প্রয়োজনে ননদিনীর মঙ্গলার্থে 'ঔষধ' সংগ্রহের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে পা দেয় তখনই এই সংসার-পিঞ্জরে তাকে কুলকলঙ্কিনী হতে হয়। সমাজের এই নীচতা, কুৎসিত সংস্কার, এই অবমাননা ও অসম্মান কপালকুণ্ডলার মত রমণীর পক্ষে সমর্থন করা বা সহ্য করা সম্ভব নয়। মধুসূদনের রাধা বলে 'রাধিকার বেড়ি ভাঙ্গ—এ মম মিনতি' ; বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকা বলে 'যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।' আমি এখন বিশেষভাবে অনুভব করছি—বঙ্কিমচন্দ্রকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে গেলে মধুসূদনকে পাশে রাখতেই হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের লেখা তন্নতন্ন পড়েছিলেন—সে-কথায় পুনরায় পরে আসছি। কিন্তু প্রশ্ন, মধুসূদন কি বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো লেখা পড়েছিলেন?

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশকালে মধুসূদনের বয়স বিয়াল্লিশ। বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র সাত বছর জীবিত ছিলেন এবং লেখালেখির মধ্যেও ছিলেন। সুতরাং তিনি যে 'বঙ্কিমচন্দ্র' পড়েছিলেন তাতে কোনো সংশয় থাকতে পারে না। তাঁর চিঠিপত্রে কতজনের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মধুসূদন আর কিছু পড়ুন বা নাই পড়ুন—কপালকুণ্ডলা নিশ্চয় তাঁর চোখে পড়েছিল এবং নিশ্চয় তিনিও পড়েছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রকাশও মধুসূদন দেখে গিয়েছিলেন। এই দুইজনের সাক্ষাৎ-সংযোগ না হওয়া ইতিহাসের পক্ষে দুর্ভাগ্যের।

১৮৬৬-তে মধুসূদনের যে চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রকাশিত হয়, তাতে 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' শিরোনামে একটি কবিতা আছে। এই কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করে মধুসূদনের কি কোনো ইঙ্গিত আছে? গুপ্ত-কবির তিরোধানের সাত বছর পরেও তাঁর স্মৃতিরক্ষায় কোনো উদ্‌যোগ ও ব্যবস্থা না দেখে মধুসূদন বিষণ্ণ চিত্তে লোকান্তরিত কবিকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, 'নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে, /তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,/ স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?' এই 'বান্ধবের দল' বলতে কি বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধুদের কথা বলতে চেয়েছেন মধুসূদন?

মধুসূদনের জীবৎকালেই ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা করেন The Calcutta Review পত্রে Bengli Literature শীর্ষক একটি দীর্ঘ ইংরেজি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধ বঙ্কিম-রচনাবলীতে সংকলিত ; আমার 'বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে এই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। উক্ত রচনায় কবি এবং সেইসঙ্গে নাট্যকার মধুসূদন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কী অভিমত পোষণ করেছেন, তা এখন আর পাঠকের অজানা নেই। সুতরাং এই প্রসঙ্গটি বর্তমান নিবন্ধে আমরা আর উপস্থাপিত করলাম না।

বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হলে সেই পত্রিকার পাতায় মাঝে মাঝেই মধুসূদনের প্রসঙ্গ এসেছে। বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় মধুসূদনের নাম বঙ্কিমচন্দ্র বারেবারেই স্মরণ করেছেন।

বঙ্গদর্শনে প্রথম বছরের শেষ সংখ্যায় (১২৭৯ চৈত্র/১৮৭৩ খ্রি) বঙ্কিমচন্দ্র যে-দুটি বইয়ের সমালোচনা করেন তার একটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'। এই প্রহসনের আলোচনাসূত্রে বঙ্কিম বাংলা ভাষায় রচিত দুটি শ্রেষ্ঠ প্রহসন রূপে মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতা ও দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশীর উল্লেখ করেন। এ দুয়ের মধ্যে আবার শেষোক্ত গ্রন্থ 'অশ্লীলতা দোষে দূষিত'।

১২৮০ বৈশাখে (১৮৭৩ খ্রি) বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে নবীনচন্দ্র সেনের সদ্য-প্রকাশিত অবকাশরঞ্জিনী কাব্যগ্রন্থের সুদীর্ঘ সমালোচনা-নিবন্ধ লেখেন। পত্রিকায় বইয়ের নামেই প্রবন্ধের শিরোনাম। এই প্রবন্ধে সমালোচক আলোচনাসূত্রে একত্রে টেনে নিয়ে এসেছেন

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে। সমালোচ্য বইটির রচয়িতা নবীনচন্দ্র, যদিও প্রথম প্রকাশকালে পুস্তকে গ্রন্থকর্তার নামোল্লেখ ছিল না।

এই সমালোচনার মূলত দুই ভাগ। প্রথম ভাগে আছে সাহিত্য বিষয়ক মূল কথার বিচার এবং দ্বিতীয় ভাগে আছে কাব্যগ্রন্থের আলোচনা। প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিম গীতিকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করার পর বাংলা ভাষায় কয়েকজন উৎকৃষ্ট গীতিকবি ও কাব্যের নামোল্লেখ করেছেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম লেখেন, "বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।" 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের পাঠে মাইকেলের নাম থেকে 'শ্রীযুক্ত' শব্দটি বর্জিত এবং প্রথম বাক্যে তারকাচিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় লেখা, 'যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন রবীন্দ্রবাবুর কাব্যসকল প্রকাশিত হয় নাই।' 'বিবিধ প্রবন্ধ'র প্রকাশ ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে।

অবকাশরঞ্জিনী গ্রন্থের সমালোচনাকালে কাব্য রচয়িতার উপরে 'শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়' ও 'হেমবাবু'র প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন।

১২৮০ জ্যৈষ্ঠে (১৮৭৩ খ্রি) বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত দানবদলন কাব্যটি সমালোচনা করেন। পত্রিকার পাতায় বঙ্কিম লিখেছিলেন, "তিনি [রামচন্দ্র] শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রদর্শিত প্রথানুসারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আদ্যকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই ছন্দ বীররসপ্রধান রচনার উপযোগী। এই ছন্দ রামচন্দ্র বাবুর সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয় নাই, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলিয়া যে সকল পদ্য প্রত্যহ সাধারণ সমীপে প্রেরিত হয়, তদপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট।"

বঙ্গদর্শনে ১২৮০ আষাঢ়ে (১৮৭৩ খ্রি) 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' বিভাগে রাধানাথ রায় প্রণীত কবিতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড সমালোচিত হয়। সম্পাদকের মন্তব্য, "তাঁহার [রাধানাথ] প্রণীত, চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে দুই একটি শ্রীযুক্ত দত্তজ মহাশয়ের প্রণীত চতুর্দশপদীর তুল্য বলিয়া বোধ হয়। এই কবি, দত্তজ মহাশয়ের অনুকারী।" এই সমালোচনা যখন প্রকাশিত হয় তখনো শ্রীযুক্ত দত্তজ মহাশয় জীবিত। এই আষাঢ়েরই ষোলো তারিখে তিনি প্রয়াত হন।

আষাঢ়ের তৃতীয় সপ্তাহে মধুসূদনের মৃত্যু ; সুতরাং শ্রাবণ সংখ্যায় তাঁর ওপর কোনো লেখা প্রকাশ করা পত্রিকার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

১২৮০ ভাদ্র। বঙ্গদর্শন। মধুসূদন নেই। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,, নবীনচন্দ্র সেন। বাংলা সাময়িক পত্রের পাতায় সে এক ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। 'মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত' শীর্ষক শোকপ্রস্তাবে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক মধুসূদনকে তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ কবি বলে উল্লেখ করে যান। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য, "যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।" শোক-প্রস্তাবকের আরও

মন্তব্য, "ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন —ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রস্তাবের পর হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের দুটি দীর্ঘ শোক-কবিতা মুদ্রিত হয় মধুসূদনকে নিবেদন করে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখায় 'শ্রীমধুসূদন' কথাটি নেন হেমচন্দ্রের কবিতা থেকে, আর 'বঙ্গ কবি সিংহাসন' নেন নবীনচন্দ্রের কবিতার ছত্র থেকে। নবীনচন্দ্র তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন, "শূন্য হল আজি বঙ্গ কবি-সিংহাসন/মুদিল নয়ন/বঙ্গের অনন্য কবি কল্পনা-সরোজ রবি,/বঙ্গের কবিতা মধু হরিল শমন।" উনিশ স্তবকে সম্পূর্ণ এই শোকগাথার শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের সংযোজিত মন্তব্য, "কিন্তু 'বঙ্গকবি সিংহাসন' শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র! মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গকবি সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্ত ধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখনো রোদন করিব না।" বঙ্কিমচন্দ্রের ইচ্ছা—হেমচন্দ্রদের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আরও অনেক মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটুক ; বঙ্গের কবিতাকুঞ্জ সুকবিবর্গের সমাগমে উন্নত ও সার্থক হয়ে উঠুক।

১২৮০ পৌষ, ডিসেম্বর ১৮৭৩। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম মানস বিকাশ নামক একটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা লিখছেন। এই সমালোচনার সংক্ষিপ্ত অংশ পরে বিদ্যাপতি ও জয়দেব শিরোনামে বঙ্কিমের গ্রন্থভুক্ত হয়।

মানস বিকাশ-এর সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র একাধিকবার মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের প্রসঙ্গ এনেছেন, নবীনচন্দ্রের কথাও উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিম তাঁর সমকালীন এক শ্রেণীর গীতিকবিকে 'আধুনিক ইংরেজি গীতিকবিদিগের অনুগামী' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম লেখেন, "বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সংকীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ় ; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত বা বিচিত্র, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সংকীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।"

কাব্য কখনো কখনো ইন্দ্রিয়পর ও কখনো কখনো আধ্যাত্মিক দোষদুষ্ট হয়ে পড়ে। বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে বলেছিলেন ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, কালিদাস ও জয়দেব। আধ্যাত্মিকতা দোষের উদাহরণ, পোপ ও জনসন। বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে বঙ্কিম কালিদাসের নাম পরিহার করেন, আর পোপ ও জনসনের স্থলে লেখেন Wordsworth। বইতে এখানেই প্রবন্ধের শেষ ; বঙ্গদর্শনে মানস বিকাশ-এর সমালোচনা এখানেই শেষ নয়—আরও দীর্ঘ।

আধুনিক ইংরেজি গীতিকবিদের অনুকারী বঙ্গীয় গীতিকবিদের মধ্যে বঙ্কিম প্রধান তিনজনের নামোল্লেখ করেছেন। এই তিনজনের একজন মধুসূদন, দ্বিতীয় হেমচন্দ্র ও

তৃতীয় নবীনচন্দ্র।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমের মন্তব্য, "আধুনিক ইংরেজি কাব্যের অনুকারী বাঙ্গালী কবিগণ, কিয়দংশে আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষ্ট। মধুসূদন, যেরূপ ইংরেজি কবিদিগের শিষ্য, সেইরূপ কতকদূর জয়দেবাদির শিষ্য, এই জন্য তাঁহাতে আধ্যাত্মিক দোষ তাদৃশ স্পষ্ট নহে। হেমচন্দ্র, নিজের প্রতিভা শক্তির গুণে নূতন পথ খনন করিতেছেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিকতা দোষ অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট কিন্তু অবকাশরঞ্জিনীর লেখক [নবীনচন্দ্র সেন] এবং মানস বিকাশ লেখকের [দীনেশচরণ বসু] এ দোষ বিলক্ষণ প্রবল।"

বঙ্কিম নানা প্রসঙ্গে বারেবারেই মধুসূদনকে আধুনিক বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ যশস্বী কবি বলে উল্লেখ করেছেন। হেমচন্দ্রের মধ্যে বঙ্কিম গভীর সম্ভাবনার ইঙ্গিত পান, আর নবীনচন্দ্র একজন সুকবি হলেও তিনি সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নন। কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে বঙ্কিম ভীষণরকম সৎ, কঠোর কঠিন এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ।

হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১২৮১ বঙ্গাব্দে (১৪ জানুয়ারি ১৮৭৫)। বঙ্কিম বঙ্গদর্শনের ১২৮১ মাঘ ও ফাল্গুন পর-পর দুই সংখ্যায় এই কাব্যটির দীর্ঘ পরিচয় দিয়ে আলোচনা করেন। বঙ্কিম-রচনাবলীতে বঙ্কিমের এইসব সমালোচনার ক্ষুদ্রাংশমাত্র সংকলিত, সমগ্র নিবন্ধ এখনও পর্যন্ত রচনাবলী-বহির্ভূতই থেকে গেছে।

এই প্রবন্ধে বঙ্কিম দুই স্থলে মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্রের প্রশংসা করেছেন। তবে বলে রাখা দরকার, সেটা সামগ্রিক কবিত্ববিচারের দিক থেকে নয়। কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেছেন, "দেবদৈত্যের সেই যুদ্ধের বর্ণনা বাঙ্গালা ভাষায় অতুল্য ; মেঘনাদবধে ইহার তুল্য যুদ্ধ-বর্ণনা কোথাও আছে আমাদিগের স্মরণ হয় না। এ বর্ণনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের যোগ্য।" আর নবম সর্গের আলোচনায় বলেছেন, "হেমবাবু, কবিবর মধুসূদন দত্তের অপেক্ষায় কয়েকটি বিষয়ে সুপটু। তন্মধ্যে যুদ্ধ-বর্ণনা একটি।" কিন্তু অন্যান্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্র শ্রেষ্ঠ সমগ্র প্রবন্ধে তার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এই প্রবন্ধে হেমচন্দ্রকে কিছুটা উৎসাহিত করার আবেগ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে। তবে সেই আবেগকে তিনি কখনো লাগাম-ছাড়া করেননি।

নবীনচন্দ্রের পলাশির যুদ্ধ প্রকাশিত ১২৮২ বঙ্গাব্দে (১৫ এপ্রিল ১৮৭৫)। বৃত্রসংহার প্রকাশের তিন মাস পর। বঙ্কিম ১২৮২ কার্ত্তিকের বঙ্গদর্শনে এই কাব্যটি দীর্ঘ আলোচনা করেন। বঙ্কিম তাঁর লেখায় বাঙালী কবিদের মধ্যে নবীনচন্দ্রকে খুব একটা উচ্চ আসন দিতে পারেননি। মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহারের সঙ্গে পলাশির যুদ্ধ তুলনীয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনায় লিখেছেন, "মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহারের সহিত এই কাব্যের তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ওই কাব্যদ্বয়ের ঘটনা সকল কাল্পনিক, অতি প্রাচীনকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত এবং সুরাসুর, রাক্ষস বা অমানুষিক শক্তিধর মনুষ্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত ; সুতরাং কবি সে ক্ষেত্রে যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া, আপনার অভিলাসমত সৃষ্টি করিতে পারেন। পলাশির যুদ্ধে ঘটনা সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক এবং আমাদিগের মত সামান্য মনুষ্য-কর্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর

ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে নবীনবাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।"

মনের মত অনুকূল সমালোচনা না হওয়ায় নবীনচন্দ্র বিষণ্ণ ও হতাশ হয়েছিলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল বঙ্কিম সম্ভবত পলাশির যুদ্ধ কাব্যটিকে মেঘনাদবধ কাব্যের তুল্য বা সমশ্রেণীভুক্ত বলে উল্লেখ করবেন। কিন্তু তেমনটি ঘটলো না। অথচ ক'মাস আগে বঙ্গদর্শনে বৃত্রসংহার-এর উচ্ছ্বসিত সমালোচনা বেরলো সাড়ম্বরে। এ-প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অভিযোগ তুলেছেন স্বজনপোষণের। এমনটা কেন ঘটলো, এ-বিষয়ে নবীনচন্দ্র কিছু গোয়েন্দাগিরিও করেছেন তাঁর লেখা আমার জীবন বইতে।

বঙ্কিম সারা-জীবন মধুসূদনকে যে সম্মান জানিয়েছেন, হেমচন্দ্রকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, নবীনচন্দ্র কবি হিসেবে তাঁর কাছে তেমনভাবে সমাদৃত হননি। ১৮৯২-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য Bengali Selection নামে যে-বইটি বঙ্কিম সম্পাদনা করেন তার কবিতা-অংশে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সংকলিত। এখানেও নবীনচন্দ্র অনুপস্থিত।

অতুলপ্রসাদ তাঁর কবিতায় বিদ্যাপতি থেকে শুরু করে নবীনচন্দ্রে এসে শেষ করেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহের ভূমিকায় নবীনচন্দ্রের পরে আধুনিক কালের আরও একজন কবির নামোল্লেখ করে যান। শিক্ষিত বাঙালীর কবি রূপে বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে পরপর চারজন কবির নাম-নির্দেশ করেছেন। সেই কবিচতুষ্টয় হলেন মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ। আর হেমচন্দ্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যত অনুকূলতাই থাক, বাংলা কাব্যাকাশে মধুসূদনের পরে যে উজ্জ্বল নক্ষত্র রবীন্দ্রনাথ—তা তিনি জানিয়ে গিয়েছিলেন নিজের গলার মালাখানি সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবির গলায় পরিয়ে দিয়ে।

আমাদের আলোচনার প্রান্তে এসে সর্বশেষ একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি—সুনিশ্চিত প্রমাণ না থাকলেও দৃঢ়ভাবেই অনুমান করা যায়, মধুসূদন 'বঙ্কিমচন্দ্র' পড়েছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বঙ্কিমের প্রথম তিনটি উপন্যাস তাঁর পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। কপালকুণ্ডলা তো অবশ্যই। তবে ১৮৫৬-য় মুদ্রিত বঙ্কিমের প্রথম পুস্তক ললিতা কাব্যগ্রন্থ মধুসূদনের না পড়বারই কথা। এই ক্ষুদ্র বইটি সম্পর্কে বঙ্কিম নিজেই বলেছেন—প্রকাশের পর বিক্রেতার আলমারিতেই পচে, বিক্রি হয়নি একটাও। এখন আমাদের জিজ্ঞাসা, দুর্গেশনন্দিনী পূর্ববর্তী যে-বঙ্কিম সেই বঙ্কিমকে মেঘনাদবধ কাব্যের কবি অন্য কোনোভাবে চিনতেন কি না? একটি অপ্রত্যক্ষ তথ্যের সূত্রে আমার অনুমান ১৮৬২ বা তার পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে মধুসূদন সব সংবাদ জানতেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে। এই বই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা সংবলিত হয়ে প্রকাশ পায়। মধুসূদনের বয়স

তখন আটত্রিশ, হেমচন্দ্রের চব্বিশ। হেমচন্দ্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমবয়সী। ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি. এ. পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। সেদিনের শিক্ষিত সমাজে এটি ছিল একটি বড় ঘটনা। প্রথম বছরেই বঙ্কিম পরীক্ষার্থী রূপে বসেছিলেন। মোট দশজন পরীক্ষা দিয়েছিলেন, পাস করেন দু'জন। দুজনেই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিম হন প্রথম। পরের বছর ১৮৫৯-এ হেমচন্দ্র বি. এ. পরীক্ষা দেন ও প্রথম বিভাগে পাস করেন। এই হেমচন্দ্রই ১৮৬২-তে মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকা লেখেন। শুধু কাব্য প্রকাশের দিক থেকেই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট রূপেও হেমচন্দ্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে জুনিয়ার। বারো মাসে হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে মেঘনাদবধের প্রথম সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ লেখার আমন্ত্রণ এলো বঙ্কিম নয়, হেমচন্দ্রের কাছে। ৪ জুন ১৮৬২ বন্ধু রাজনারায়ণকে মধুসূদন লেখেন 'Meghanad is going through a second edition with notes, and a real B.A. has written a long critical preface.' স্বভাবতই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে B.A.-র আবার আসল নকল আছে নাকি? B. A. আর real B. A.-র মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? মনে হয় মধুসূদনের কাছে এই পার্থক্যটা ছিল মূলত B. A. গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র আর হেমচন্দ্রের মধ্যে। ১৮৫৮-য় বঙ্কিম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে B. A. পাস করেন প্রথম শ্রেণীতে। মনে হয় বঙ্কিমের B. A-র রেজাল্টের দিকে তাকিয়েই মধুসূদন হেমচন্দ্র প্রসঙ্গে a real B. A. কথাটা উল্লেখ করেন। এই real B. A. কথাটা বলেই মধুসূদন তাঁর মুখবন্ধের লেখক-হেমচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র করতে চেয়েছেন ; এবং সেইসঙ্গে সম্মানিতও। অপর দিকে দেখি মধুসূদনের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বরাবরই শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগ। এই আগ্রহ ও আকর্ষণ কখনও স্তিমিত হয়নি। জানি না রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের এই ব্যক্তিগত চিঠি সেদিন প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্রের কী প্রতিক্রিয়া হত? আদৌ কি তিনি কিছু ক্ষুণ্ণ হতেন? মধুসূদনের এই পত্র চিন্তাতরঙ্গিণীর (প্রকাশ ১৮৬১ খ্রি) কবি স্বয়ং ভূমিকা-লেখকের যদি সেদিন নজরে পড়তো, তিনি কি খুশি হতেন? বোধ করি না। যিনি যথার্থ কবি—তিনি a real B. A. নন, হতে চান অবশ্যই a real poet.

সদ্য গৃহপ্রবেশ করা একবিংশ শতাব্দীর বাতায়নে বসে বঙ্কিমচন্দ্রালোকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান তিন কবির আলো-আঁধারি মুখের কিছুটা দূর থেকে লক্ষ্য করা গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও ফকিরমোহন সেনাপতি

ভারতীয় তথা বাংলা উপন্যাসের জনক সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও ওড়িয়া উপন্যাসের জনক ফকিরমোহন সেনাপতি উভয়েই ছিলেন সমসাময়িক। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পাঁচ বছর পর ফকিরমোহনের জন্ম। ফকিরমোহন দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবন পঁচাত্তর বছরের ; মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র মারা যান। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াণকালে ফকিরমোহনের বয়স একান্ন। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের পর ফকিরমোহন আরও পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন। ফকিরমোহনের উপন্যাস রচনার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরবর্তী কাল থেকে।

ফকিরমোহন বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। শুধু পাঠক নন, তাঁর মুদ্রিত রচনাসাহিত্যের প্রথম সূত্রপাত বাংলা ভাষাতেই।

ফকিরমোহন তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, "তখন সমস্ত উড়িষ্যা জুড়ে কোথায় লেখালেখির জগৎ? আমি কি কখনো একজন লেখক হয়ে উঠতে পারবো? সেই সময় কোথাও নেই কোন ওড়িয়া সাময়িকপত্র—না মাসিকপত্র না সাপ্তাহিক পত্রিকা। আমি তারপরে একসময় ছোট-ছোট রচনা লিখে বাংলা 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় পাঠাতে শুরু করি। সম্পাদক মহাশয় আমার পাঠানো সব কয়টি রচনাই তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। আমিও যে একজন সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারি—আমার লেখা এই বাংলা রচনাগুলি প্রকাশিত হওয়ায় তা আমি নূতন করে অনুভব করি ও প্রেরণা লাভ করি।"

ফকিরমোহনের কোনো গ্রন্থে, তাঁর রচনাবলীতে, বা কোনো গবেষকের গ্রন্থে বা নিবন্ধে ফকিরমোহনের এই দুর্ল আদি বাংলা রচনাগুলি আজও পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়নি বলে জানতে পারলাম। (এ-বিষয়ে সর্বশেষ সংবাদ পেয়েছি বিশ্বভারতী ওড়িয়া বিভাগ আয়োজিত ফকিরমোহন সার্ধজন্মশতবর্ষ সেমিনার থেকে)। সোমপ্রকাশ পত্রিকা থেকে ফকিরমোহনের এই আদি বাংলা রচনাগুলি উদ্ধার করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিকল্পনায় বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে বিদ্যাসাগরের রচিত 'জীবনচরিত' গ্রন্থখানি বাংলা থেকে ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন ফকিরমোহন সেনাপতি।

ফকিরমোহন যখন উপন্যাস লিখতে শুরু করেন তখন বাংলার সাহিত্যাকাশ থেকে বিদায় নিয়েছেন প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র। ফকিরমোহন যে এই বাঙালী লেখকদের রচনাবলীর সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। এমন একটা কথা সাহিত্য

অকাদেমি প্রকাশিত 'Makers of Indian literature Fakirmohan Senapati' বইতেও বলা হয়েছে।

ফকিরমোহনের জীবনের প্রথম পর্ব নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে এবং বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিদ্যালাভও তিনি তেমনভাবে করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তাঁর অসামান্য মেধা ও জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু যখন ফকিরমোহন বিদ্যাসাগরের 'জীবনচরিত'-এর অনুবাদ করেছেন, যখন তাঁর পাঁচ বছরের অগ্রজ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দুটি উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয়ে গেছে—তখনো পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার একটি শব্দের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন না ফকিরমোহন। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—উপন্যাস নামক শিল্প কর্মটির সঙ্গে ফকিরমোহনের প্রথম পরিচয় ঘটে তাঁর যৌবনপর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মাধ্যমেই।

পরবর্তী কালে ফকিরমোহন নিজের চেষ্টায় ইংরেজি শিখেছিলেন ; এবং অত্যন্ত পরিণত বয়সে উপন্যাস লেখা শুরু করলেও, ফকিরমোহন তাঁর চোখের সামনে আজীবন বঙ্কিমচন্দ্রকেই যে বিশেষভাবে আদর্শ ঔপন্যাসিকরূপে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ফকিরমোহন যে অসামান্য ঔপন্যাসিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গেছেন তাঁর পরিণত বয়সের কলমে, তা থেকে মনে হয়, তিনি যদি বঙ্কিমচন্দ্রের মত বাল্যকাল থেকেই ইংরেজি ভাষা ও য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেতেন তা হলে য়ুরোপীয় ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালেই ওড়িয়া ভাষায় উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করতে পারতেন।

বঙ্গসাহিত্যে একদিকে মধুসূদন, আর একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র ; একজন কাব্যে আর একজন উপন্যাসে—উভয়েই ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটিয়ে যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। কারণ উভয়েরই প্রথম পর্যায়ে আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল সমুদ্রপারের সাহিত্যের প্রতি। অপরদিকে ফকিরমোহনের জীবনের এক তৃতীয়াংশ কেটেছে ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে অপরিচয়ে। তিনি তাঁর চোখের সামনে সমসাময়িক আদর্শ সাহিত্যস্রষ্টারূপে পেয়েছিলেন বাঙালী লেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে। যিনি প্রথম বয়সে বাংলা সাময়িকপত্রে বাংলা গদ্য লিখে তাঁর সাহিত্যসাধনা শুরু করেছিলেন —তিনি যে তৎকালে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন—এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা।

"যখনই কোনো নতুন বাংলা বই আমার হাতে এসে পৌঁছতো, তখনই তার পাতা উলটতে উলটতে আমার মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠত।" ফকিরমোহন বলছেন—"আমি তখনই নিজেই নিজের মনে প্রশ্ন করতাম—কবে এমন সব বই আমাদের মাতৃভাষায় রচিত হবে—আমাদের ওড়িয়া ভাষায়?...আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল—যেমন করে বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির প্রবাহ চলেছে, তেমনিভাবে ওড়িশার বুকেও সেই ধারা টেনে আনতে হবে ওড়িয়া ভাষার মাধ্যমে।"

আমাদের মনে হয় ফকিরমোহনের সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণার মূলে বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাঁর সাহিত্য যে মুখ্যত লোকজীবন নির্ভর হয়ে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল, তার কারণ মনে হয়, তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব থেকে নিজেকে অনেকখানিই মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বঙ্গভাষার মাধ্যমে বঙ্গদেশ দর্শন করতে চেয়েছিলেন ; আর বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের পর ওড়িয়া ভাষার মাধ্যমে ওড়িশা দেশ—তার মানুষ সমাজ ও জীবন দর্শন করেছিলেন ফকিরমোহন সেনাপতি।

ফকিরমোহন অনেক পরিণত বয়সে উপন্যাস রচনায় হাত দেন, এবং এই সৃষ্টিকর্মে তিনি যদি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হয়ে থাকেন তবে বিস্ময়ের কিছু নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে তিনি স্কট পড়েন নি ; অথচ কেউ কেউ দুর্গেশনন্দিনীর ওপর স্কটের প্রভাব লক্ষ্য করতে চেষ্টা করেছেন। ফকিরমোহনের প্রথম উপন্যাস 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ'-এর উপরেও বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু এই অনুমান সবসময় সত্য নাও হতে পারে। তবে সামান্য যদি কিছু প্রভাব থাকেও, তাহলেও তা অসামান্য প্রতিভাধর সাহিত্যস্রষ্টার মৌলিকতাকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে না। কারণ ফকিরমোহন তাঁর উপন্যাসের কাহিনী তাঁর নিজের দেশের একেবারে মাটি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু ছোট ছোট বর্ণনায় ভাবনায় বা প্রকাশভঙ্গিতে তিনি কখনো কখনো বা সচেতনভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্য ও উপন্যাসের একজন নিষ্ঠাবান অনুরক্ত পাঠক ছিলেন—তাই আমার মনে হয়েছে। ফকিরমোহনের প্রথম উপন্যাসটির সূত্রে আমি সাধারণভাবে দু-একটি প্রসঙ্গের কথা এখানে উল্লেখ করবো।

'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' (সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত মৈত্রী শুক্ল অনূদিত 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা') উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জমিদার রামচন্দ্র মঙ্গরাজের পাঁচ মহল বাড়ি, কাছারি বাড়ি, বাড়ির পিছনের বাগান দেখে কোনও পাঠকের বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রথমাংশে জমিদার নগেন্দ্র দত্তের ছয় মহল বাড়ির বর্ণনা মনে পড়তে পারে। লক্ষ্য করবার বিষয় বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র দত্তের জমিদারি—গোবিন্দপুরে, অন্যদিকে 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' উপন্যাসে নায়ক রামচন্দ্র মঙ্গরাজের জমিদারি যে-অঞ্চলে সেই স্থানটির নামও গোবিন্দপুর।

সূর্যমুখীর ঘরের বিস্তৃত দেয়ালচিত্র বর্ণনার সংক্ষিপ্ত আভাস পাই চম্পার আঁকা মঙ্গরাজের কাছারিবাড়ির দেওয়ালচিত্রের মধ্যেও। বঙ্কিম দেওয়ালচিত্রের মধ্যে দিয়ে স্বামীর প্রতি সূর্যমুখীর গভীর প্রণয়ের চিত্রই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, অপরদিকে ফকিরমোহন চম্পা-অঙ্কিত ছবিগুলির মধ্য দিয়ে মঙ্গরাজের গৃহে ও জীবনে তার ভূমিকার আভাস দিতে চেয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন, "পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একা দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দের

মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ ছিল। এই জাতীয় একজন পণ্ডিত (Fergusson সাহেব) ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরে গোটাকত বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না—সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্বশুর ভাসুরের সম্মুখে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিত! তাই বলিতেছিলাম—এই সকল পণ্ডিতদিগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।"

ফকিরমোহন চম্পার আঁকা দেওয়ালচিত্রগুলি প্রসঙ্গে বলছেন—"রাজপুতানার কোনও স্থানে একটি উলঙ্গ স্ত্রী মূর্তি দেখিয়া টড্ সাহেব অনুমান করিয়াছেন, পূর্বকালে ভারতের অঙ্গনাগণ উলঙ্গ ছিলেন। হা কপাল! আমরা মঙ্গরাজের দেওয়ালের চিত্র দেখাইয়া সাহেবের মূর্খতা দূর করিতে পারিলাম না। দেওয়ালের গায়ে আঁকা সখীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত রাধিকার গেরুয়ারঙের উপর হাঁড়ির কালির বুটিদার ঘাগরা দেখিলে অবশ্য সাহেবের মূর্খতা ও ভ্রান্তি বিদূরিত হইত।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও ফকিরমোহন—উভয়েরই মূল লক্ষ্য এক ; ইংরেজের ভ্রান্তি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করাই উভয়ের উদ্দেশ্য। একজন প্রাবন্ধিকের কলমে বলেছেন, আর একজন ঔপন্যাসিকের কলমে।

মঙ্গরাজ-চম্পার সম্পর্ক তাদের কৃত পাপ এবং পাপের দণ্ডভোগের পরিকল্পনায় বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের দেবেন্দ্র-হীরার সম্পর্ক ও তাদের পাপ ও দণ্ডভোগের চিত্রের কিছু অনুবর্তন আছে বলে মনে হয়।

উপন্যাসের মূল কাহিনীর কাঠামোটা এইরকম : অতিশয় ধনশালী জমিদার রামচন্দ্র মঙ্গরাজ। অন্যের ধন-সম্পত্তি-জমি কৌশলে সংগ্রহ করে নেওয়াই তাঁর জীবনের যেন একমাত্র লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য। মঙ্গরাজের অন্যায় কাজকর্মে ও আচরণে তাঁর স্ত্রী ব্যথিত বিষণ্ণ ও নীরব। মঙ্গরাজের দুষ্কর্মের প্রধান সহচরী চম্পা নামে এক কুখ্যাত নারী। 'ধড়িবাজ চম্পা ও মঙ্গরাজের মধ্যে অনেক রাত্রি পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। শেষে এমন সাবধানে এমন গুপ্তভাবে বসিয়া মন্ত্রণা হইল যে আমরা কোনমতে তাহার হদিস পাইলাম না। পরস্পরে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। দুইজনে কথায় মগ্ন।' এক-সময় এ-ঘরে ঢুকে মঙ্গরাজের স্ত্রী স্বামীকে 'রাত হয়েছে, শুয়ে পড়' বলে অনুরোধ করলে 'চম্পা অবজ্ঞাভরে গম্ভীরস্বরে কহিল—হুঁ।' আর মঙ্গরাজ স্ত্রীকে বলল—'আচ্ছা আমি যাচ্ছি, তুমি বাইরে যাও'। 'চম্পা দমাস্ করিয়া কবাটটা ভেজাইয়া দিয়া আপন জায়গায় আসিয়া বসিয়া বলিল—'আমাকে কেউ গালি দিয়ে ঝাঁটা মারলেও সইব, কিন্তু তোমাকে কেউ একটা কথা বললে আমার বুকে বড় বাজে। মা-ঠাকরুণের কথা শুনলে তো? আর কেউ হলে তো তাঁর মুখ দেখত না।' মঙ্গরাজের নিবাসস্থল গোবিন্দপুর গ্রামেই এক তন্তুবায় দম্পতি বাস করত। তাদের কয়েক বিঘে ('ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ') উৎকৃষ্ট ফলন্ত জমি ছিল। চম্পার সহায়তায় মঙ্গরাজ ভাগিআ ও শারিআর জমি আত্মসাৎ করে নেয় ; এমন কি তাদের একমাত্র গাভীটি পর্যন্ত। নিদারুণ দারিদ্র্যে ও নৈরাশ্যে ভাগিআ উন্মাদ হয়ে যায় ; আর শারিআ কিছু দিন মঙ্গরাজের স্ত্রীর ভিক্ষায় কোনমতে বেঁচে থেকে শেষে দুঃখে

হতাশায় মারা যায়। মঙ্গরাজের স্ত্রীও মৃত্যুর মধ্যে মুক্তি পান। মঙ্গরাজ তার অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ বেশি দিন ভোগ করতে পারে নি। গ্রামে চৌকিদার পুলিশকে খবর দেয় মঙ্গরাজই ভাগিআর স্ত্রীকে মারধর করে মেরে ফেলেছে। মঙ্গরাজ গ্রেপ্তার হয় কিন্তু খুনের প্রমাণাভাবে কেবল ভাগিআর গোরু চুরির দায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। চম্পা ও ভৃত্য গোবিন্দ মঙ্গরাজের গৃহে রক্ষিত সমুদয় অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পলায়ন করে ও পরে ধনের বাটোয়ারা নিয়ে বিবাদে উভয়েই মারা যায়। মঙ্গরাজ মৃতপ্রায় অবস্থায় কয়েদখানা থেকে ছাড়া পায়। শূন্য পরিত্যক্ত গৃহে মঙ্গরাজের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসে।

মঙ্গরাজ-চম্পার মন্ত্রণায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর বঙ্গদর্শন পাঠের বা প্রথম সংস্করণ পাঠের ছায়া পড়ে থাকতে পারে। যেখানে কৃষ্ণকান্তের পুত্র হরলাল ও রোহিণীর মন্ত্রণা বর্ণিত হয়েছে। 'সুপ্তা সুন্দরীর প্রথম নিদ্রাভঙ্গে নয়নোন্মীলনবৎ, পৃথিবীমণ্ডলে প্রভাতোদয় হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠতলে রোহিণীর সহিত হরলাল কথোপকথন করিতেছিল—যেন পাতালমার্গে, অন্ধকার বিবরমধ্যে সর্প দম্পতি গরল উদগীর্ণ করিতেছিল, বস্তুতপক্ষে ভোররাতে নিভৃত-কক্ষে হরলাল-রোহিণীর প্রায় দম্পতি সদৃশ একান্ত মুখোমুখি গোপন আলাপের সঙ্গে মঙ্গরাজ-চম্পার গভীর রাত্রে নির্জন কক্ষে একান্ত মুখোমুখি অস্ফুটবাক নিভৃত আলাপের কিছু সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়। বঙ্কিমের উপন্যাস থেকে যে অংশ উদ্ধৃত করেছি সে-পাঠ বঙ্কিমের প্রচলিত উপন্যাসে বর্জিত।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর শেষ পরিচ্ছেদে আছে—'রোহিণীকে গোবিন্দলাল স্বহস্তে বধ করিয়াছেন—ভ্রমরকেও প্রায় স্বহস্তে বধ করিয়াছেন।' রোহিণীকে হত্যা করে গোবিন্দলালকে জেলে যেতে হয়েছিল, ফকিরমোহনের উপন্যাসে মঙ্গরাজকেও মুখ্যত শারিআকে হত্যার অভিযোগেই জেলে যেতে হয়েছিল। আইন আর উকিলের কৌশলে, মিথ্যা সাক্ষীর নাটকীয়তায় অভিযুক্ত হত্যাকারী আসামী কিভাবে ছাড়া পায় বা সামান্য লঘু দণ্ড প্রাপ্ত হয় ফাঁসির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে—সে-কথা উভয় ঔপন্যাসিকই চমৎকার বিবৃত করে গেছেন।

মঙ্গরাজ শারিআকে স্বহস্তে বধ করেছে, নিজের স্ত্রীকেও সে প্রায় স্বহস্তেই বধ করেছে।

বঙ্কিমের উপন্যাসের শেষে 'গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত' হয়ে মানসচক্ষে প্রথমে রোহিণীর মূর্তি ও শেষে রোহিণীমূর্তি অন্ধকারে অপসৃত হয়ে 'জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরমূর্তি সম্মুখে উদিত' হতে দেখল। 'ভ্রমরমূর্তি বলিল—মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।'

মঙ্গরাজের জীবনের অবসানেও তাঁর জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীমূর্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করি।

'মঙ্গরাজ উপায়হীন হইয়া সেই অনাথশরণ পতিতপাবন ভগবানের পবিত্র নাম হৃদয় মধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন অনন্ত আকাশে সূর্যমণ্ডলের বহু উর্ধে

রত্নসিংহাসনে এক জ্যোতির্ময়ী শান্তিময়ী আশাপ্রদায়িণী স্ত্রীমূর্তি বিরাজিতা, পূর্ব পূর্ব পীড়ার সময়ে যে মূর্তি শয্যার পাশে বসিয়া মঙ্গরাজের গায়ে কোমল হস্ত বুলাইতেন, বিমানচারিণী লাবণ্যময়ী মূর্তি সেই মূর্তিরই প্রতিচ্ছায়া—অঙ্গুলি সঙ্কেতে মঙ্গরাজকে নিজের পাশে ডাকিতেছেন।'

চম্পার সুদীর্ঘ রূপবর্ণনা অনেকটাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসের রূপবর্ণনার দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করি। কোথাও কোথাও 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর রচনাকৌশলের আভাস পাই। দপ্তরে 'আমার মন' প্রবন্ধে প্রসন্ন গোয়ালিনীকে কমলাকান্ত সতী সাধ্বী পতিব্রতা বলায় পাড়ার এক নষ্টবুদ্ধি ছেলে এর বিপরীত অর্থ করে বলেছিল, 'প্রসন্ন আছেন, এজন্য সৎ বা সতী বটে, তিনি সাধু ঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধ্বী ; বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন, এজন্য ঘোরতর পতিব্রতা।'

ফকিরমোহনকে দেখি-এই প্রণালীতেই চম্পার ব্যঙ্গাত্মক রূপবর্ণনা করেছেন। বলেছেন—'স্বয়ং কালিদাস চম্পার রূপবর্ণনার নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী। অস্যার্থ, তনু কি না শরীর, চম্পার শরীর থাকায় সে তন্বী। শ্যামা কি না কালো নহে, ফরসা নহে, শ্যাম বর্ণ, চম্পা শ্যাম বর্ণা। শিখরিদশনা—শিখরি কিনা পাহাড়, দশন কি না দাঁত ; চম্পার সামনের দাঁত দুইটা বেয়াড়া হইয়া একটির উপর আর একটি উঠিয়া পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় উঁচু হইয়া থাকাতে সে শিখরিদশনা।' ইত্যাদি।

অসুর দীঘির ঘাটে বাড়ির বউ-ঝিদের স্নানপর্বের যে দীর্ঘ বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের স্নানঘাটের দৃশ্যের কিছু মিল কি চোখে পড়ে না?

ফকিরমোহনের উপন্যাসে ডুলি করে টাঙ্গীর মাসী নতুন বউকে দেখতে এলো ; এবং 'বউয়ের মাসী বিদায় হইবার পর তাঁহার রূপ গুণ সম্বন্ধে বহু সমালোচনা হইল। সকলেই প্রশংসা করিল, কেহ রূপের কেহ গুণের, কেহ গহণার। কিন্তু মাণিক বলিল, তা না হয় হইল—বড় লোকের ঘর, রূপটা কিন্তু সে রকম নয়, সামনের দাঁত দুইটা বেয়াড়া, গাল দুইটা যেন চালতাচেরা। হগুরার মা বলিল, কথাগুলি মিষ্ট নহে, কটকটে। মুতুরীর মা বলিল, চলনটা গটগটে। শঙ্করী বলিল, হাঁ হাঁ, হাসিটা খটখটে। শুকুরী বলিল, চাউনিটা কটমটে।'

অপর দিকে 'বিষবৃক্ষ'-এ দত্তবাড়ির স্ত্রীমহলে গান শুনিয়ে হরিদাসী বৈষ্ণবী ফিরে গেলে "স্ত্রীলোকেরা অনেকক্ষণ কেবল বৈষ্ণবীর প্রসঙ্গ লইয়াই রহিল। প্রথমে তাহার বড় সুখ্যাতি আরম্ভ হইল। পরে ক্রমে একটু খুঁত বাহির হইতে লাগিল। বিরাজ বলিল, 'তা হোক কিন্তু নাকটা একটু চাপা।' তখন বামা বলিল, 'রঙটা বাপু বড় ফেকাসে।' তখন চন্দ্রমুখী বলিল, 'চুলগুলো যেন শণের দড়ি।' তখন চাঁপা বলিল, 'কপালটা একটু উঁচু।' হারাণী বলিল, 'গড়নটা বড় কাট কাট।' প্রমদা বলিল,'মাগীর বুকের কাছটা যেন যাত্রার সখীদের মত ; দেখে ঘৃণা করে।" ইত্যাদি।

একটি ওড়িয়া ভাষায় লেখা, একটি বাংলা ভাষায় লেখা ; কিন্তু মেয়েদের সমালোচনার প্রণালীটা একেবারেই অভিন্ন।

আর একটি মাত্র সাদৃশ্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করব।

'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' উপন্যাসের 'কর্ত্রী ঠাকরুণ' শীর্ষক অষ্টাদশ পরিচ্ছেদটি চরিত্র নির্মাণের দিক থেকে একটি উৎকৃষ্ট অধ্যায় বলে মনে করি। অত্যাচারী পরধনলোলুপ হৃদয়হীন জমিদার রামচন্দ্র মঙ্গরাজের স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছে এই পরিচ্ছেদে। এই রমণী স্ত্রীর প্রকৃত মর্যাদা পান নি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে। দুঃখ আর অপমান মুখ বুজে সহ্য করে একদিন রাত্রে তুলসীতলায় মারা গেলেন মঙ্গরাজের উপেক্ষিতা সহধর্মিণী।

এই স্ত্রীর মৃত্যুও পাষাণহৃদয় মঙ্গরাজের চিত্তে ক্ষণকালের জন্যেও যে একটা ভাবান্তর ঘটায়, সে চিত্র অঙ্কনে ফকিরমোহন অসামান্যতা দেখিয়েছেন। এই পরিচ্ছেদের একটি অংশের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি রচনার বেশ স্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমে ফকিরমোহনের লেখা থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি : 'মঙ্গরাজ কি কর্ত্রীঠাকরুণের জন্য কাঁদিতেছেন? প্রিয় বস্তুর বিয়োগ মানুষের পক্ষে অসহ্য। মঙ্গরাজ কি পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের স্বর্গীয় মাধুরী অনুভব করিতেন? কই, কর্ত্রীঠাকরুণকে মিষ্ট করিয়া দুইটা কথা বলিতেও তো তাঁহাকে কেহ শুনে নাই? তবে আজ এত ব্যাকুল কিসের জন্য? যাহা হউক, কর্ত্রীঠাকরুণের বিচ্ছেদ যন্ত্রণাটা যে তিনি অনুভব করিতেছেন সহজ বিশ্বাসে আমরা ইহা অনুভব করিতেছি। যাহাকে আটটি পূর্ণ কুম্ভবেষ্টিত বেদীর উপরে বসিয়া অর্ধাঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছ সে ভাল হউক বা মন্দ হউক তাহার উপর একটা মায়া পড়িয়া যায়। এই নৈসর্গিক মানবধর্ম অতিক্রম করা সহজ নয়। যে স্ত্রী ধর্ম কার্যে সহধর্মিণী, প্রাণাধিক সন্তান সন্ততির জননী, যে স্ত্রী সুখ দুঃখের একমাত্র সমভাগিনী, যে স্ত্রী রোগে শুশ্রূষাকারিণী, বিপদে মন্ত্রী, শরীর রক্ষায় ধাত্রী, তুমি যদি নিতান্ত পাষণ্ড না হও তাহার গুণগরিমা অনুভব করিবার শক্তির অভাব যদি নিতান্তই তোমার না থাকে—বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে ভাল বাস বা না বাস, তাহার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। আর সাধ্বী, সচ্চরিত্রা, পতি-পরায়ণা ধার্মিকা স্ত্রীর গুণগরিমা যে একবার মাত্রও হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে, তাহার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা যে কিরূপ অসহ্য তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা সৃষ্টি হয় নাই।'

এইবার 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' উপন্যাসের পঁচিশ বছর আগে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত করছি। প্রবন্ধটি 'উত্তরচরিত'-এর সমালোচনা ; বঙ্গদর্শনের যে প্রথম বর্ষে বিষবৃক্ষ ছাপা হয়, সেই বছরেই প্রথম দিকের কয়েক সংখ্যায় 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সঙ্গে ফকিরমোহনের মিল চোখে পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা : 'সীতার নির্বাসন সামান্য স্ত্রীবিয়োগ নহে। স্ত্রীবিসর্জন মাত্রই ক্লেশকর—মর্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জন করে, তাহারই হৃদয়োচ্ছেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার সৌন্দর্যের প্রতিমা, বার্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্মে যে গুরু ;—ভাল বাসুক বা না

বাসুক্, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা—স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ,—অর্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ—বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে বিসর্জন করিতে পারে? আর যে ভালবাসে, পত্নীবিসর্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা।'

যদি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে স্কটের অনুকরণ থেকেও থাকে, যদি ফকিরমোহনের প্রথম উপন্যাস 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্তন ঘটেও থাকে তথাপি তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছুমাত্র দূষণীয় অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক নয় বলেই মনে করি। 'যখন উৎকৃষ্টে এবং অপকৃষ্টে একত্রিত হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাতই উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি? উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে।' কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রেরই। লোকের বিশ্বাস অনুকরণের ফলে কখনো প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয় না—সাহিত্যের দিক থেকে এ কথারও কিছুমাত্র ভিত্তি নেই। 'পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল অনুকরণ মাত্র। ড্রাইডেন এবং বোয়ালোর অনুকারী পোপ, পোপের অনুকারী জন্‌সন। এইরূপ ক্ষুদ্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথা সপ্রমাণ করিতে চাহি না। বর্জিলের মহাকাব্য, হোমারের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ। সমুদয় রোমকসাহিত্য, য়ুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমক সাহিত্য বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাত্র।...মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অন্যত্র অতুল—একা রামায়ণই তাহার তুলনীয়।' অক্ষম ব্যক্তির অনুকরণই নিন্দনীয় ; কিন্তু যিনি প্রতিভাসম্পন্ন তাঁর সৃষ্টি প্রথমে অনুকরণজাত হলেও পরে অভ্যাসে তা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। প্রতিভা থাকলে অনুকরণীয় অপেক্ষা অনুকৃত অধিকতর উৎকৃষ্টতা লাভও করতে পারে।

ফকিরমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মিল দেখে মনে হয় ফকিরমোহন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তাঁকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

ফকিরমোহন অবশ্যই একজন অসামান্য সৃষ্টিশীল প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নেই। একজন সৃষ্টিশীল লেখকের রচনায় তাঁর সমসাময়িক দেশ কাল সমাজ ও সাহিত্যের প্রভাব বা প্রতিফলন ঘটা স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভার আলো উনবিংশ শতাব্দীর অনেক লেখকের রচনাতেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের অনেক রচনাতেই রবীন্দ্রের উপর চন্দ্রের ছায়া আছে ; বঙ্কিম সমকালীন ওড়িয়া উপন্যাসসাহিত্যের জনক ফকিরমোহনও কিছু পরিমাণে চন্দ্রালোকিত হয়েছিলেন অনিবার্যভাবেই। সাহিত্যে সম্রাট ও সেনাপতির এই নৈকট্য বাংলা ও ওড়িশার মানুষের চিন্তা ভাবনা বোধ বিশ্বাস ও রুচির নৈকট্যই যেন আর একবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রালোকে ফুটেছিল বনফুল

'নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠমাস, তুফানের সময় ; ভার্যা সূর্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, দেখিও, নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না।' —এই ছত্রগুলির মধ্যে দিয়েই সম্ভবত বঙ্কিমসাহিত্যে একাদশবর্ষীয় বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবেশ।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রথম বছরের (১২৭৯ বঙ্গাব্দ /১৮৭২ খ্রি) প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ) থেকে শুরু হয়েছিল 'শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত' ধারাবাহিক 'বিষবৃক্ষ'। সাময়িকপত্রের পাতায় প্রকৃত বাংলা উপন্যাসের সূচনা বিষবৃক্ষেই। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় থেকেই বঙ্গদর্শনের একজন উৎসাহী নিয়মিত রসজ্ঞ পাঠক। প্রতি সংখ্যা আটচল্লিশ পাতার বঙ্গদর্শনে বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রধানতম আকর্ষণ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ওই ধারাবাহিক উপন্যাসটি। হয়তো দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী উপন্যাসের রচিয়তার নাম রবীন্দ্রনাথ আগেই শুনেছিলেন, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, রচয়িতার রচনাকালপর্বেই পাঠ করার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ পেলেন এই প্রথম। আট পেজি ছয় ফর্মার বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় একমাত্র উনিশ পাতায় লেখক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ছাপা হয়েছে : 'বিষবৃক্ষ/উপন্যাস/শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত।' প্রথম সংখ্যায় অপর কোনও রচনায় আর কোনো লেখকের নাম মুদ্রিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের অন্যান্য লেখাতেও তাঁর নাম অমুদ্রিত ছিল। সুতরাং লেখক হিসেবে প্রথম সংখ্যার বঙ্গদর্শনে অন্য নাম না থাকলেও বিষবৃক্ষ যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন সম্পাদক তথা ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি, তা পত্রিকার পাতা থেকেই রবীন্দ্রনাথ জানতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের স্মৃতিচারণ করেছেন। "নর্মাল স্কুলে সীতার বনবাস পড়া শেষ হল। সমাসদর্পণ ও লোহারামের ব্যাকরণের যোগে তার পরীক্ষাও দিয়েছি। পাস করে থাকব কিন্তু পারিতোষিক পাই নি। যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা সওদাগরী আপিস পার হয়ে আজ পেন্‌সন ভোগ করছেন। এমন সময় বঙ্গদর্শন বাহির হল।" [১] "বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ।" [২]

বঙ্গদর্শনের পাতায় মাসে মাসে এই বিষবৃক্ষ উপন্যাসপাঠের রবীন্দ্রসুখস্মৃতি এইরকম—

"তখন বঙ্গদর্শনের ধুম লেগেছে—সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মত

আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল, কী হবে, দেশশুদ্ধ সবার এই ভাবনা। বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুর বেলায় কারো ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল, কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না—কেননা, আমার একটা গুণ ছিল—আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বউঠাকরুন ভালোবাসতেন।"[৩]

১২৭৯ বৈশাখ থেকে ১২৮২ চৈত্র—এই চার বছর বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রথম শ্রেণীর ওই মাসিক পত্রিকাখানির প্রধান লেখকও ছিলেন তিনিই। ১২৮২ চৈত্রে রবীন্দ্রের বয়সও চৌদ্দ পূর্ণ হয়েছে। বলা বাহুল্য এই চার বছরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপাঠের প্রধান আহার্য যোগাত বঙ্কিমচন্দ্রের মাসিক পত্রিকা বঙ্গদর্শন। এই চার বছরে সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে বঙ্কিমের লেখা পূর্ববর্তী তিনখানি উপন্যাস—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনীও রবীন্দ্রের পাঠ করা হয়ে গিয়েছে। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকতর বাল্যরচনা—তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ললিতা পুরাকালিক গল্প তথা মানস'ও রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছেন। আর বঙ্কিম সম্পাদিত চার বছরের বঙ্গদর্শনের মোট আটচল্লিশ সংখ্যায় পাঠ করেছেন বিষবৃক্ষ ব্যতীত তাঁর অন্যান্য উপন্যাস—ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রজনী, রাধারাণী ও কৃষ্ণকান্তের উইলের কিছু অংশ। এই সময় পর্বে রবীন্দ্রনাথ আরও পড়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের এক-এক কিস্তি, তাঁর মূল্যবান ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলী এবং তাঁর কৃত সুতীব্র সুকঠিন সাহিত্যসমালোচনাগুলি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বয়সে চোখের সামনে একজন পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিকপুরুষ রূপে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার সূচনাপর্বে তাঁর মনের ওপর এই মহান সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবেন, তাতে অস্বাভাবিকতা কিছুমাত্র নেই।

সাময়িকপত্রের পাতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম দীর্ঘ রচনা তথা কাব্যোপন্যাসটির নাম 'বনফুল'। মাসিক জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকায় ১২৮২ অগ্রহায়ণ (১৮৭৫ ডিসেম্বর), মাঘ ও চৈত্র এবং ১২৮৩ জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, ভাদ্র ও কার্ত্তিক—সর্বমোট সাত সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। সদ্য পাঠ করা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনী ও তার চরিত্রগুলি কিশোর রবীন্দ্রের মনের ওপর যে কী গভীর ছায়া ফেলেছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে এই বনফুলের পত্রে পত্রে।

এই কাব্যোপন্যাস জ্ঞানাঙ্কুরে যখন শুরু হয়, বঙ্গদর্শনে তখন চলেছে ধারাবাহিক রজনী ও রাধারাণী। ইতিপূর্বে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ সম্পূর্ণ উপন্যাসটি ছিল চন্দ্রশেখর—যেটি বঙ্গদর্শনে সমাপ্ত হয় ১২৮১ ভাদ্র সংখ্যায়। রবীন্দ্রের বনফুলে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর পর্যন্ত প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্যগোচর হয়। মনে হয় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত চন্দ্রশেখরের উপাখ্যানই রবীন্দ্রকে তাঁর প্রথম কাব্যোপন্যাস লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রধানত শৈবলিনী প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরের কাহিনী নিয়ে চন্দ্রশেখর উপন্যাস। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের স্ত্রী কিন্তু তার প্রকৃত প্রেম প্রতাপের প্রতি। উপন্যাসের শেষে

"প্রতাপ কি তোমার জার"—এই প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্রশেখরের প্রতি স্ত্রী শৈবলিনীর সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা—"এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?"

বনফুল কাব্যোপন্যাসের নায়িকা কমলা। কমলা ছিল বনফুল। বিজয় তাকে বিবাহ করে সংসারে নিয়ে আসে। কিন্তু নীরদের প্রতি ভালবাসা জন্মায় কমলার। চন্দ্রশেখর-পত্নী শৈবলিনীর প্রতাপের প্রতি ভালবাসায় যে সংকট, তার সঙ্গে বিজয়-পত্নী কমলার নীরদের প্রতি ভালবাসার সংকটে মূলগত বা প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য নেই। কমলার প্রেমবিষয়ক সংকটটা শৈবলিনী ধাঁচের, তবে তার চরিত্রটিকে কপালকুণ্ডলার আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি থেকে আলো জল বাতাস ইত্যাদি নিয়ে জন্ম নিয়েছিল রবীন্দ্রের প্রথম কাব্যকুসুম বনফুল। বিষবৃক্ষে কুন্দের পিতার মৃত্যুবর্ণনার সঙ্গে বনফুলে কমলার পিতার মৃত্যুবর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো। কুন্দের পিতৃবিয়োগ হয়েছে বিষবৃক্ষের 'দীপনির্বাণ' শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, আর বনফুলে কমলার পিতার মৃত্যু ঘটে কাহিনীর প্রথম সর্গে ; এবং লক্ষ্য করবার বিষয় সেই সর্গটিরও শিরোনাম 'দীপনির্বাণ'। মধ্যরাত্রে কুন্দের পিতার শয্যাপার্শ্বে কুন্দ ব্যতীত অপর কেউ ছিল না, অপরদিকে মধ্যরাত্রে কুটীরমধ্যে কমলার কোলে মাথা রেখেই কমলার পিতৃবিয়োগ। বিষবৃক্ষে সেই সময় নৌকাপথযাত্রী নগেন্দ্রের আবির্ভাব আর বনফুলে কমলার কাছে সেই সময় এসে উপস্থিত হয় বিজয় নামে এক পথিক। এই নিঃসঙ্গ নির্জন ভগ্নকুটীর থেকে কুন্দ বহির্সংসারে প্রবেশ করেছিল নগেন্দ্রের সহায়তায়, অপরদিকে কমলাকে সেই সময় আহ্বান করেছিল ও আনুকূল্য দিয়েছিল বিজয়। পিতামাতাহীন কুন্দ রাত্রে মাকে স্বপ্ন দেখেছিল। নগেন্দ্র ও এক যুবতীকে স্বপ্নে দেখিয়ে কুন্দকে মা বলেছিল—'ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও। তাহারা যে পথে যাইবে, সে পথে যাইও না।' অপরদিকে বনফুলে 'যেও না! যেও না!' শীর্ষক দ্বিতীয় সর্গে কমলা বিজয়ের সঙ্গে যাত্রা করতে উদ্‌যোগী হলে—"নেত্র তুলি স্বর্গপানে দেখে পিতা মেঘযানে/হাত নাড়ি বলিছেন 'যেও না!—যেও না'—/বালিকা পাইয়া ভয় মুদিল নয়নদ্বয়,/এক পা এগোতে আর হয় না বাসনা—/আবার আবার শুন কানের কাছেতে পুনঃ/কে কহে অস্ফুট স্বরে 'যেও না!—যেও না!"

শুধু ভাবের মিল নয়, বর্ণনায় ও ভাষায় এমন অনেক মিল পাওয়া যাবে বনফুল কাব্যোপন্যাসের সঙ্গে কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর ইতাদি উপন্যাসের।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে কয়টি উপন্যাস রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রথম কাব্যোপন্যাসটি লিখতে প্রেরণা জুগিয়েছিল, সেই উপন্যাসগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে যদি কোথাও কোনও মন্তব্য করে থাকেন তবে তা একবার কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনটি উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে রোম্যান্স। আমাদের

প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। যেমন দূরদিগন্তের নীলিমায় অরণ্য পর্বতকে একটা অস্পষ্টতার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য দেয় এও তেমনি। সেই দৃশ্যছবির প্রধান গুণ হচ্ছে তার রেখার সুষমা, অন্য পরিচয় নয়, কেবল তার সমগ্র ছন্দের ভঙ্গিমা। দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনীতে সেই রূপের কুহক আছে। তা যদি রঙিন কুহেলিকায় রচিত হয় তবুও তার রস আছে।...বঙ্কিমচন্দ্রের গোড়ার দিকের তিনটে কাহিনী যেন দৃঢ় অবলম্বন পায় নি—তাদের সাজসজ্জা আছে, কিন্তু পরিচয়পত্র নেই। তারা ইতিহাসের ভাঙা ভেলা আঁকড়ে ভেসে এসেছে। তাদের বিনা তর্কে মেনে নিতে হয়, কেননা তারা বর্তমানের সামগ্রী নয়, তারা যে-অতীতে বিরাজ করে সে-অতীতকে ইতিহাসের আদর্শেও সওয়াল-জবাব করা চলে না, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার আদর্শেও নয়। সেখানে বিমলা আয়েষা জগৎসিংহ কপালকুণ্ডলা নবকুমার প্রভৃতিরা যা-খুশি তাই করতে পারে, কেবল তাদের এইটুকু বাঁচিয়ে চলতে হয় যে পাঠকদের মনোরঞ্জনে ত্রুটি না ঘটে।" [৪]

বঙ্গদর্শনের পাতায় ধারাবাহিক বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর উপন্যাস পাঠের স্মৃতি চিত্রিত হয়েছে এইভাবে—

"বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে এক গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, উপভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেক দিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।" [৫]

বিষবৃক্ষ সম্পর্কে এক জায়াগায় বলেছেন—

"সীতার বনবাস ইস্কুলে পড়েছিলেম। সেটা ইস্কুলেরই সামগ্রী। বিষবৃক্ষ পড়েছিলুম ঘরে, সেটা ঘরেরই জিনিস। সাহিত্যটা ইস্কুলের নয়—ওটা ঘরের। বিশ্বে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ করবার জন্যেই সাহিত্য।" [৬]

আর এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন—

"আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রস সম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন।" [৭]

অন্যত্র বিষবৃক্ষ সম্পর্কে মন্তব্য—

"বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল, তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে। সাহিত্য থেকে অস্পষ্টতার আবরণ এক পর্দা উঠে গেল।" [৮]

চন্দ্রশেখর উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি—

"বঙ্কিমের উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের অসামান্য পাণ্ডিত্য ; সেইটে অপর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করবার জন্যে বঙ্কিম তার মুখে ষড়্‌দর্শনের আস্ত আস্ত তর্ক বসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু, পাঠক বলত, আমি পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত প্রমাণ চাই নে, আমি চন্দ্রশেখরের সমগ্র ব্যক্তিরূপটি স্পষ্ট করে দেখতে চাই। সেই রূপটি প্রকাশ পেয়ে ওঠে ভাষায় ভঙ্গিতে

আভাসে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্বাচনে, বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে। সেইখানেই বঙ্কিম হলেন কারিগর, সেইখানে চন্দ্রশেখর-চরিত্রের বিষয়গত উপাদান নিয়ে রূপস্রষ্টার ইন্দ্রজাল আপন সৃষ্টির কাজ করে।" [৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি থেকে প্রায় যাবতীয় উপকরণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত ঘটাতে প্রয়াসী হন সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রেরই লেখা একটি সমালোচনা প্রবন্ধ পড়ে বা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। বঙ্গদর্শনে ১২৮১ পৌষ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রবন্ধে অনুকরণ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই।" এবং বলেছিলেন, "অনুকরণের ফলে কখনো প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয় না"—লোকের এই বিশ্বাসও যথার্থ নয়। "সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল অনুকরণ মাত্র। ...মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অন্যত্র অতুল—একা রামায়ণই তাহার তুলনীয়। অতএব অনুকরণমাত্র হেয় নহে। ...তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চিরকালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কখনো দেখা যায় না। ...অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই ; একে মন্দ, তাহাতে অনুকরণ। নচেৎ অনুকরণ মাত্র ঘৃণ্য নহে।" [১০]

রবীন্দ্রনাথ যখন বঙ্গদর্শনের পাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা এই ছত্রগুলি পড়েন তখনও তিনি নিজের সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হননি। সামনে একটা আদর্শ একটা লক্ষ্যের প্রয়োজন থাকেই সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিকর্মের সূচনায় নিঃসংশয়ে আদর্শ সাহিত্যস্রষ্টা রূপে পেয়েছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে। সেই কৈশোরেই রবীন্দ্র বুঝেছিলেন কাব্যকবিতাই তাঁর প্রকৃত স্বক্ষেত্র। বঙ্কিম অসামান্য গদ্যে লিখে চলেছেন একটির পর একটি উপন্যাস ; রবীন্দ্রনাথ সেই তরুণ বয়সেই স্থির করলেন সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রধান ভাণ্ডার হলেও বঙ্কিমের গদ্যবাহন তিনি গ্রহণ করবেন না তখনই। তিনি জানেন তাঁর স্বাভাবিক শক্তি ও প্রতিভা প্রকাশ পায় ছন্দের মালা গেঁথেই। সুতরাং, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মতো তিনি উপন্যাস রচনা করবেন, কিন্তু গদ্যে নয়, পদ্যে। তাই বনফুল তাঁর প্রথম দীর্ঘ সৃষ্টিকর্ম—প্রথম উপন্যাস, তবে তা কবিতায় রচিত কাব্যোপন্যাস। আত্মপ্রত্যয়ী রবীন্দ্রনাথ সেদিনই বুঝেছিলেন শক্তি ও প্রতিভা থাকলে 'প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে।' বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে স্বাতন্ত্র্য আসতে দীর্ঘ বিলম্ব হয়নি।

বনফুল প্রকাশের তিন বছর যেতে না যেতেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য-উপন্যাস বৌঠাকুরাণীর হাট গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে তরুণ রবীন্দ্রের মধ্যে প্রতিভার সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে বিলম্ব ঘটে না। নিজে তিনি অযাচিতভাবে একটি প্রশংসাপত্র লিখে পাঠান রবীন্দ্রকে। বলেন—বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে। ছেলেমানুষের ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে বঙ্কিমচন্দ্রকে

প্রবৃত্ত করেছিল। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল।

কিছু পরিমাণে কাব্য-কবিতা রচনায় রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলালের প্রভাব থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা ও মানসগঠনের প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন তাঁর প্রধান আদর্শ মুখ্য প্রেরণা। শুধু তরুণ রবি কেন, ঠাকুরবাড়ির প্রায় সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রালোকে অভিভূত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে ঠাকুরবাড়ি থেকে যে নতুন মাসিক পত্রিকা 'ভারতী' প্রকাশিত হয়েছিল তাও বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনকে আদর্শ করেই এবং অনুসরণ করেই। দ্বিজেন্দ্রনাথ তো স্পষ্টই বলে গেছেন—"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা।" আর তাই দেখি ১২৮৪ শ্রাবণে (১৮৭৭ খ্রি) ঠাকুরবাড়ির ভারতী পত্রিকা বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের প্রায় হুবহু আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়েই বঙ্গসমাজে প্রকাশিত হল। বঙ্গদর্শনের মতো ভারতীর কলেবরও হয়েছে ৮ পেজি ফর্মার ৬ ফর্মা, অর্থাৎ প্রতি সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠা। বঙ্গদর্শনে প্রতি পাতায় দুটি কলম, ভারতীর পৃষ্ঠাও তদ্রূপ। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের প্রতি পাতার চারদিকে বর্ডার এবং দুটি কলামের মাঝে যেমন রুল দেওয়া ছিল, ভারতীতেও ঠিক তেমনি অনুসৃত। সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে কোনও রুল বা বর্ডার ছিল না, বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের ছিল, ভারতীতেও থাকে। The Calcutta Review পত্রিকা ভারতীর প্রথম দুটি সংখ্যার বিস্তারিত আলোচনা-সূত্রে স্পষ্ট মন্তব্য করেন—This is a new monthly like the Banga Darsana.

ভারতী পত্রিকার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হলেও একথা বলতেই হয় যে, বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যসমাজে যেভাবে আন্দোলিত ও আলোড়িত করেছিল ভারতী তা পারেনি। পত্রিকা কর্তৃপক্ষেরও লক্ষ্য ছিল ভারতীকে বঙ্গদর্শনের মতো গড়ে তোলার, আর পাঠকসমাজের কাছে বঙ্গদর্শনই আদর্শ মাসিক পত্রিকা ছিল বলেই তাঁরাও ভারতীকে বঙ্গদর্শনের অনুরূপ হল কি না দেখতে আগ্রহী হয়েছিলেন। সে-যুগে বঙ্গদর্শনের পরবর্তী কোনো নতুন পত্রিকা তাঁদের পরিকল্পনাতেও বঙ্গদর্শনকে অতিক্রম করার কথা ভাবতে পারেননি।

'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের মত একখানা কাগজ' ভারতীর প্রথম সংখ্যাটি কতটা বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের মতো হল—সে বিষয়ে স্বভাবতই কৌতূহল জাগে।

ভারতীর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার সূচী ছিল এইরকম—

ভূমিকা (সম্পাদকীয়) ১, ভারতী (কবিতা) ৩, তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক (প্রবন্ধ) ৪, মেঘনাদবধ কাব্য (সমালোচনা) ভঃ ৭, জ্ঞান নীতি ও ইংরাজি সভ্যতা (বকল্ সাহেব-কৃত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস) সঃ ১৭, বঙ্গসাহিত্য (সমালোচনা) ২৪, গঞ্জিকা অথবা তুরিতানন্দ বাবাজীর আক্ড়া (ব্যঙ্গকৌতুক) ২৯, ভিখারিণী (গল্প) প্রথম—তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩৫, স্বাস্থ্য (প্রবন্ধ) যঃ ৪২, সম্পাদকের বৈঠক (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা) ৪৪—৪৮।

বঙ্গদর্শন বা সেকালের অন্যান্য সাময়িকপত্রের প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে

ভারতীও রচনার সঙ্গে লেখকদের নাম প্রকাশ থেকে বিরত থাকে। কেবল তিনটি রচনার একটি ভঃ স্বাক্ষরিত, একটি সঃ স্বাক্ষরিত এবং একটি যঃ স্বাক্ষরিত। প্রথম দুজন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ (ভানু) ও সত্যেন্দ্রনাথ ; তৃতীয়জন অজ্ঞাত।

এখন 'স্বাস্থ্য' শীর্ষক রচনাটি ব্যতীত কোন্ রচনার লেখক কে—নির্দেশ করা যেতে পারে। ভূমিকা—দ্বিজেন্দ্রনাথ, ভারতী—রবীন্দ্রনাথ, তত্ত্বজ্ঞান—দ্বিজেন্দ্রনাথ, মেঘনাদবধ কাব্য—রবীন্দ্রনাথ, জ্ঞান নীতি ও ইংরাজি সভ্যতা—সত্যেন্দ্রনাথ, বঙ্গসাহিত্য—অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, গঞ্জিকা—দ্বিজেন্দ্রনাথ, ভিখারিণী—রবীন্দ্রনাথ, স্বাস্থ্য—অজ্ঞাত, সম্পাদকের বৈঠক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র লেখক হিসাবে একই সঙ্গে উপাখ্যান-রচয়িতা কবি ও প্রাবন্ধিক-সমালোচকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভারতীর প্রথম সংখ্যাতেই যিনি একই সঙ্গে কবি প্রাবন্ধিক-সমালোচক ও উপাখ্যান-রচয়িতারূপে আবির্ভূত হলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। পূর্বেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে তখন আদর্শ সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। ভারতী পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কাহিনী নির্মাণ করে, তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় কঠোর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখে বঙ্গদর্শনের অনুরূপ করে তোলার আন্তরিক ইচ্ছা শুধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নয়, ভারতীর প্রধান লেখক রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষভাবে ছিল। বঙ্কিম বিষবৃক্ষ দিয়ে বঙ্গদর্শনের সূচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তখনও গদ্যকাহিনী রচনার তাগিদ না এলেও 'ভিখারিণী' লিখে ভারতীর প্রথম সংখ্যায় তাকে স্থান দিলেন। সর্বোপরি রবীন্দ্রকৃত মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র সাহিত্যসমালোচনা রীতির কৃত্রিম অনুসরণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিম তাঁর সমকালের স্বল্পশক্তিসম্পন্ন লেখকদের যেভাবে তীব্র কঠোর ভাষায় আক্রমণাত্মক সমালোচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন-সমালোচনায় সেই রীতিই অবলম্বন করেন। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে 'উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা' পেয়েছিলেন।

এই ভারতীতেই চার বছর পর রবীন্দ্রনাথ মাসে মাসে লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাসটি বৌঠাকুরাণীর হাট—যে লেখাটির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে অভিনন্দিত হতে তরুণ ঔপন্যাসিকের কিছুমাত্র বিলম্ব হয়নি।

ভারতীতে যখন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ধারাবাহিক মুদ্রিত হচ্ছে সেই সময় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় সন্ধ্যাসংগীত। বইটি প্রকাশের অল্প কয়েকদিন পরেই রমেশ দত্তের কন্যার বিবাহ-সভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে রমেশ দত্ত মালা পরাতে এলে বঙ্কিম সে মালা নিজের কণ্ঠ থেকে পার্শ্বে উপস্থিত তরুণ কবি রবীন্দ্রের গলায় প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—'রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?' রবীন্দ্রনাথ পরে সেই সুখস্মৃতির উল্লেখ করে বলেন—'সেই আমার জীবনের সাহিত্যচর্চার প্রথম গৌরবের দিন।'

নবীনচন্দ্র সেনের কাছেও বঙ্কিমচন্দ্র একবার রবীন্দ্রের সপ্রশংস উল্লেখ করে বলেন—He is a talented young man.

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে তাঁর নিজের একটি লেখাতেও তরুণ রবীন্দ্র প্রসঙ্গে বলেছেন, "রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ স্বভাব এবং আমার বিশেষ প্রীতি যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণ বয়স্ক।...তিনি এত অল্প বয়সেও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন—আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।" ১১

রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-পদ গ্রহণ করার পর বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর 'একটা বিরোধের সৃষ্টি' হয়েছিল। সে-ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে ও পরবর্তী কালে গবেষকরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইতিপূর্বে। সে-প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ এখানে আর প্রয়োজন বোধ করি না।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে একজন মননশীল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁকে দেখেছিলেন একজন অসামান্য সার্থক কৃতী সম্পাদক রূপেও।

শুধু সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেই নয়, সাময়িক পত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর্শরূপে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের 'সাধনা'য় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি রচনা আদায় করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি ; তবে বঙ্কিম অসুস্থতার কারণে একান্ত অপারগ হয়ে শেষ পর্যন্ত লেখা দিয়ে উঠতে পারেন নি প্রত্যাশী সম্পাদকের হস্তে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে সাধনার নিয়মিত পাঠক ছিলেন তার প্রমাণ মেলে। সাধনায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের লেখা 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ পড়ে বঙ্কিম প্রবন্ধকারকে সপ্রশংস যে পত্রখানি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা তাঁর পত্রিকায় ছাপিয়েও দিয়েছিলেন—একথা আমরা জানি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে যেমন প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর নিজের পত্রিকা বঙ্গদর্শনের তেমনি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আবশ্যক হয়েছিল অপরের কর্তৃত্ব-নিরপেক্ষ তাঁর একান্ত নিজের একটি কাগজ—মাসিক সাধনা পত্রিকার। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমই ছিলেন প্রধান লেখক, রবীন্দ্রনাথের সাধনায় মুখ্য লেখক রবীন্দ্রনাথই।

কোনো পত্রিকায় বিশেষ একজন লেখকের প্রাধান্য সেই পত্রিকার পক্ষে মঙ্গলজনক নয় বলে এবং সেই পত্রিকার স্থায়িত্বের পক্ষে অন্তরায় বলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শেষ বয়সে অনুভব করেছিলেন। প্রথম বছরের সাধনার সমালোচনার সূত্রে ১২৯৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় নব্যভারত লেখেন—"আমরা সাধনা সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম এবং তাহা নব্যভারতে ব্যক্তও করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্বৎসর পরে, ধীরে এবং নিরপেক্ষভাবে সাধনার চাল্‌চলতি নিরীক্ষণ করিয়া আমাদিগকে কিছু নিরাশ হইতে হইয়াছে। আমরা একদিন পরম শ্রদ্ধেয়, সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বাগ্রজ তীক্ষ্ণ প্রভাবশালী শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। নানা কথার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শন, প্রচার ও নবজীবন আমাদের বহু যত্নের ফল, কিন্তু একটানা সুরে সাধা ছিল বলিয়া স্থায়ী হইল না।' সাধনাও একটানা সুরে সাধা। এক ব্যক্তি যতই

প্রতিভাশালী হউন না কেন ; প্রতিমাসে বহু প্রবন্ধ লিখিলেই তাঁহাকে একটানা ভাবে চলিতে হইবে।"

বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি, রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত সাধনার পরিণতিও তাই। মিল শুধু এদিকেই নয়—সাদৃশ্য অন্যদিকেও দেখি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমগ্র রচনা বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত, আর রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার একটা প্রধান অংশ সাধনার পাতাতেই মুদ্রাঙ্কিত। এই সময়পর্বে রবীন্দ্রনাথের লেখনী যতখানি বেগবতী হয়ে উঠেছিল, সমগ্র জীবনে তেমন আর কখনও ঘটেনি।

সাধনাতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পাননি, তবে সাধনার পাতায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন।

পঞ্চভূতের নরনারী প্রবন্ধ সাধনায় ১২৯৯ চৈত্রে মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধে এক স্থানে দেখি পঞ্চভূতের অন্তর্গত সমীর ক্ষিতি ও দীপ্তির মধ্যে বঙ্কিমসাহিত্য নিয়ে এক মননশীল আলোচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'পুনঃপ্রণীত' রাজসিংহ উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দে (১৮৯৩ খ্রি)। রবীন্দ্রনাথ সাধনায় এই উপন্যাসের দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন ওই বছর চৈত্র মাসে। সেই বছরেই ২৬ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াণ ঘটে। এটিই ছিল রবীন্দ্রনাথ-কৃত বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত কোনও গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা। এই সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র তিরোধানের পূর্বে রোগশয্যায় পাঠ করার অবকাশ পেয়েছিলেন কিনা জানি না।

এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি সামগ্রিকভাবে রাজসিংহ উপন্যাসটির সপ্রশংস আলোচনা করেছিলেন? আমার কিন্তু তা ঠিক মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসটি বিচার করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র কোনও কবির কাব্যের সমালোচনায় বলেছিলেন, "সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে, দানবদলন কাব্য ইদানীন্তনের নূতন বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য।" তার পরেই বলেছেন, "ইহার সকল স্থান সমান নহে—অনেক দোষও আছে—বিশেষ দেখা যায় যে, কবির কবিত্ব শক্তি অদ্যাপিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।" অর্থাৎ কবির কবিত্বশক্তির পূর্ণতাপ্রাপ্তি না ঘটলেও কাব্যটি অনুৎকৃষ্ট নয়। আবার অন্য একটি সমালোচনায় আর একটি কাব্যকে 'অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য নহে' বলে উল্লেখ করেও শেষে কবির কবিত্বশক্তির বিচার করে বলেছেন, "এই কবি বিশেষ আদরের যোগ্য সন্দেহ নাই।" মনে হয় রাজসিংহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাটিও ছিল শেষোক্ত প্রকার। রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চেয়েছেন রাজসিংহের যিনি স্রষ্টা তিনি একজন দক্ষ কৃতী মহান্ সাহিত্যশিল্পী, কিন্তু তাঁর কৃত রাজসিংহ তদ্রূপ অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস নয়। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই উপলব্ধি করা যাবে, রাজসিংহ উপন্যাসটিকে রবীন্দ্রনাথ একটা নড়বড়ে ভাঙা ব্রিজের সঙ্গে তুলনা করেছেন, আর রেলগাড়ির ইঞ্জিনের দক্ষ চালকের সঙ্গে সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের।

রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে ওই অংশটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"বঙ্কিমবাবু রাজসিংহে সেই আবশ্যক ভারেরও কিয়দংশ যেন বাদ দিয়াছেন বোধ হয়। ভারে যেটুকু কম পড়িয়াছে গতির দ্বারায় তাহা পূরণ করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রত্যেক অংশ অসন্দিগ্ধরূপে সম্ভবপর ও প্রশ্নসহ করিয়া তুলেন নাই, কিন্তু সমস্তটার উপর দিয়া এমন দ্রুত অবলীলা ভঙ্গিতে চলিয়া গিয়াছেন যে প্রশ্ন করিবার আবশ্যক হয় নাই। যেন রেলপথের মাঝে মাঝে এমন এক-আধটা ব্রিজ আছে যাহা পুরা মজবুত বলিয়া বোধ হয় না, চালক তাহার উপর দিয়া এমন দ্রুত গাড়ি লইয়া চলে যে ব্রিজ ভাঙিয়া পড়িবার অবসর পায় না।" [১২]

এই সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের নিরপেক্ষ নির্ভীক সমালোচনার দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হওয়া উচিত। তবে এ-কথাও বলতে হবে সমালোচনার এই আদর্শ এই বলিষ্ঠতা এই নিরপেক্ষতা রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই সাধনা পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"বঙ্কিম যেদিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন সেদিন হইতে এ পর্যন্ত আর সে আসন পূর্ণ হইল না। সাহিত্যের প্রতি এখনকার সমালোচনার কোনো প্রভাব নাই। সাধারণে এখনকার সমালোচনা কেবল বিজ্ঞাপনস্তম্ভ সজ্জিত করিবার আয়োজন-স্বরূপে দেখে। যথার্থ রসবোধ এবং সূক্ষ্মবিচার প্রকাশ পায় এমন সমালোচনা বহুকাল দেখা যায় নাই। গ্রন্থসমালোচনার ভার অনেক সময়ে অযোগ্য লোকের হস্তে ন্যস্ত হয় এবং অনেক কৃতবিদ্য লেখকও অত্যুক্তি কাল্পনিকতা এবং অবান্তর প্রসঙ্গে তাঁহাদের সমালোচনা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন ; গ্রন্থের অন্তর্গত প্রকৃত সাহিত্যপদার্থকে প্রাধান্য না দিয়া তাহার আনুষঙ্গিক নীতি অথবা অন্য কোনো তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়া পাঠকের চিত্তকে যথার্থ সাহিত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করেন। অন্য হিসাবে তাহার মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু সমালোচনার হিসাবে তাহার মূল্য নাই।...এই বর্তমান দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া কাহারও প্রতি দোষারোপ করা আমার অভিপ্রায় নহে। বিশেষত এ দোষের অংশ যখন আমাদিগের সকলকেই বহন করিয়া লইতে হইবে তখন ইহার মধ্যে নিজের সান্ত্বনা বা শ্লাঘার কারণ কিছুই দেখি না। কিন্তু এই অরাজকতার চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্য-সিংহাসনে কে আমাদের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার অভাবে সে শাসনভার গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই উপস্থিত নাই। ইহাও বুঝিতে পারিবেন, বঙ্কিম যখন আমাদের সাহিত্যতরীর কর্ণধার হইয়াছিলেন তখন তরণী কেন এমন আশ্চর্য বেগে অগ্রসর হইয়াছিল, আর আজই বা কেন সে যথেচ্ছা ভাসিয়া যাইতেছে এবং নানা বাতাসে ঘুরিয়া মরিতেছে। আমাদের কাহারও সে ক্ষমতা নাই, সে সাহস নাই, সে প্রতিভা নাই। আমরা যদি বা স্ব স্ব শক্তি-অনুসারে কেহ কেহ কোনো কোনো বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারি, কিন্তু বর্তমানের গতিকে নিয়মিত করা, সমস্ত সাহিত্যকে চালনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। বঙ্গদর্শন তখনকার সমস্ত বঙ্গসাহিত্যের মর্মস্থলে শ্রীস্বরূপে বিরাজ করিতেছিল—এখন সে স্থান শূন্য। সেইজন্য এখনকার সাহিত্যের বিশেষ কোনো

আকারপ্রকার দেখা যায় না ; তাহার আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু তাহার রূপ নাই ; তাহার কোনো লক্ষণ নাই, আদর্শ নাই, বিবেকশক্তি নাই, তাহার পক্ষে সকল পথই সমান। সংসার-যুদ্ধে বঙ্গসাহিত্যের সারথি কৃষ্ণ যেন আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।" [১৩]

এই উদ্ধৃত অংশটি পরে রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধটি সংকলন কালে বর্জন করেন।

১৩০১ বৈশাখের সাধনায় 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রকাশিত হল, পরে মাঘ এবং ফাল্গুন দুই সংখ্যায় কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের দীর্ঘ সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ লেখেন। এই সমালোচনাটি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে করেছি 'স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মৃত বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রের বিরোধ' শীর্ষক প্রবন্ধে।

যে-বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্যসম্রাটের অবর্তমানে আর-একদিন সেই বঙ্গদর্শনেই সম্পাদকের আসনে বসতে হল রবীন্দ্রনাথকে। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বেরিয়েছিল ১২৭৯ বৈশাখে (১৮৭২ এপ্রিল), রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশ পেল ১৩০৮ বৈশাখে (১৯০১ এপ্রিল)। এই পত্রিকা সম্পাদনকালে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের আদর্শ ও সম্পাদনপ্রণালীই অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'রবি ঠাকুরের কুঠার' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গদর্শনের রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন চার বছর আর নবপর্যায় বঙ্গদর্শন রবীন্দ্রনাথ পাঁচ বছর সম্পাদনা করেন। তবে সাহিত্যে ও সমাজে বঙ্গদর্শনের যে গৌরব যে আধিপত্য ও প্রভাব ছিল, নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের তেমনটা ছিল না। বুঝি সম্পাদক ও পাঠকসমাজেরও ততটা প্রত্যাশা ছিল না। তবুও রবীন্দ্রনাথের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না—সে-কথা উল্লেখ করতেই হবে।

পাদটীকা

১. 'শরৎচন্দ্র'। প্রবাসী ১৩৩৮ আশ্বিন।
২. ঐ।
৩. ছেলেবেলা।
৪. 'শরৎচন্দ্র'। প্রবাসী ১৩৩৮ আশ্বিন।
৫. জীবনস্মৃতি। ঘরের পড়া।
৬. 'শরৎচন্দ্র'। প্রবাসী ১৩৩৮ আশ্বিন।
৭. চোখের বালি। সূচনা।
৮. 'শরৎচন্দ্র'। প্রবাসী ১৩৩৮ আশ্বিন।
৯. সাহিত্যের পথে। সাহিত্যরূপ।
১০. বিবিধ প্রবন্ধ। অনুকরণ।
১১. প্রচার ১২৯১ অগ্রহায়ণ।
১২. আধুনিক সাহিত্য। রাজসিংহ।
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র (বিশ্বভারতী)।

রামায়ণ রবীন্দ্রায়ণ

যখন 'পৃথিবীসুদ্ধ লোকে কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়িয়া জীবন কাটায়' [১] সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবের সূচনাতেই 'পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ' [২] পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। 'ইহার পূর্বে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করা ছাড়া সংস্কৃত পড়ার আর-কোনো চর্চা হয় নাই। পিতা আমাকে একেবারেই ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।' [৩]

রবীন্দ্রনাথ যখন পিতার কাছে বাল্মীকি-পাঠ শুরু করেন, সেটা তখন ১৮৭৩ সাল, রবীন্দ্রের বয়স তখন বারোর কাছাকাছি। আর যে-বইটি অবলম্বনে এই মহাকাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রের প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়, সেই পুস্তকের বয়স হিসাবের মাপে রবীন্দ্রের বয়সের অপেক্ষা মাত্র নয় বছরের বড়ো ; ১৮৫২ সালের মার্চ মাসে ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পাদনায়। ঋজুপাঠের প্রথমভাগ মুদ্রিত হয় আগের বছর ১৮৫১ সালে : 'SIMPLE LESSONS./Part1./COMPILED FOR THE USE/OF/The Govt. Sanskrit College/OF CALCUTTA./BY/ ESHWAR CHANDRA VIDYASAGAR/Principal of that Institution./ CALCUTTA./PRINTED AT THE SANSKRIT PRESS./1851' [৪]

বিদ্যাসাগর সম্পাদিত ঋজুপাঠের প্রথমভাগে 'পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি উপাখ্যান ও মহাভারতের কিয়দংশ উদ্ধৃত।' [৫] ঋজুপাঠের দ্বিতীয়ভাগে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের কিছু কিছু অংশ সংকলিত। হিমালয় ভ্রমণপর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই বইয়ের মাধ্যমেই বালক-পুত্রের সঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকির পরিচয় করিয়ে দেন।

ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগের 'বিজ্ঞাপন'-এ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, 'ঋজুপাঠের দ্বিতীয়ভাগ রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইল। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, রামায়ণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই প্রাচীন গ্রন্থ মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কোন কোন আলঙ্কারিকেরা রামায়ণকে মহাকাব্যমধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ কাব্যের যে সকল লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদায় কালিদাসাদিপ্রণীত রঘুবংশাদি অপেক্ষাকৃত নব্য কাব্যগ্রন্থসমূহে যেরূপ লক্ষিত হয়, প্রাচীন কাব্য রামায়ণে সেরূপ লক্ষিত হয় না। বাল্মীকিকাব্য পৌনরুক্ত, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতি বিস্তৃত বর্ণনা প্রভৃতি কতিপয় গুরুতর দোষ আছে। যাহা হউক, অনায়াসে এই নির্দেশ করা যাইতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় এরূপ প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট পদ্যগ্রন্থ আর নাই। রামায়ণের মধ্যে অযোধ্যাকাণ্ডের রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, অন্যান্য কাণ্ডের রচনা সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত

ঋজুপাঠের দ্বিতীয়ভাগে অযোধ্যাকাণ্ডের কতিপয় উৎকৃষ্ট অংশ সঙ্কলিত হইল। সঙ্কলিত অংশ সকলের কোন কোন ভাগ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।' [৬]

বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে পরিচয়ের আরও অনেক পূর্বে অতি বাল্যকালে কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল।

'ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাত-কাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুয্যে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল সুর-সমেত তার মুখস্থ। সে হঠাৎ আসন দখল করে কৃত্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হু হু করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালির পালা— 'ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।' [৭]

'ছেলেবেলা' বইতে রামায়ণ কাহিনী শ্রবণের কথা আছে, আর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠের স্মৃতিচারণ রয়েছে।

'নিতান্ত শিশুবয়সেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের মহলে যে-সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্য-শ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস-রামায়ণই প্রধান।' [৮] রবীন্দ্রনাথের 'সেই রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি' এইরকম :

'সেদিন মেঘলা করিয়াছে ; ...দিদিমা, আমার মাতার কোনো এক সম্পর্কে খুড়ি, যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা ; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্ণের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো-একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া, দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।' [৯]

পাঠকের শোকবিহ্বলতা দেখে দিদিমা হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন কৃত্তিবাসী-রামায়ণ ; আর সেই হাতেই হিমালয় যাত্রাপর্বে পিতৃদেব তুলে দেন সংস্কৃতে রচিত বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড। মা সারদা দেবীও বালকপুত্রের বাল্মীকিপাঠের অভিজ্ঞতায় আনন্দাভিভূত হয়েছিলেন। 'ততঃ শ্রুত্বা মহারাজঃ কৈকেয্যা দারুণং বচঃ/পপাত সহসা ভূমৌ নিশ্চেষ্টশ্চাভবত্তদা।' [১০] হয়তো এই অংশেরই কিছুটা ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ থেকে মাকে সেদিন শুনিয়েছিলেন রবি।

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে বাল্মীকি, কৃত্তিবাস ও রামায়ণ প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের রামায়ণচিন্তা বা চর্চাকে ধারাবাহিকভাবে দেখতে চেষ্টা করব।

জীবনের প্রথম সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধেই বাল্মীকির প্রসঙ্গ এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং সেই প্রথম প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই ভার্জিল, হোমার, ব্যাসের সঙ্গে বাল্মীকির নামোল্লেখ করেছেন।

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী' (১৮৭৫/১২৮২), নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' (১৮৭৫/১২৮২) ও রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসর-সরোজিনী' (১৮৭৬/১২৮৩) কাব্য তিনটির সমালোচনাসূত্রে রচিত 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' (জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব ১২৮৩ কার্তিক/১৮৭৬) সমালোচনা-নিবন্ধ। গ্রন্থসমালোচনায় প্রবেশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘ ভূমিকায় গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের মধ্যে মূলগত প্রভেদ কী—তা নির্দেশ করতে চেয়েছেন। (এই প্রবন্ধ পড়ার সময় বঙ্গদর্শনে ১২৮০ বৈশাখে মুদ্রিত বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যের সমালোচনাটি সহজেই মনে আসে। বঙ্কিমের সেই প্রথম বাংলা কাব্য সমালোচনায় সমালোচক মূল কাব্যের সমালোচনায় প্রবেশের পূর্বে দীর্ঘ ভূমিকায় গীতিকাব্য, নাটক ও মহাকাব্যের মধ্যে প্রভেদ কী তা নির্দেশ করেছিলেন। উল্লেখ করেছিলেন সেক্সপীয়র, ভবভূতি ও বাল্মীকির প্রসঙ্গ)।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে লিখছেন, 'মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে হয় ; গঠিত করিতে হয় ; গীতিকাব্যের উপকরণ সকল গঠিত আছে, প্রকাশ করিলেই হইল। নিজের মনোভাব প্রকাশ করা বড় সামান্য ক্ষমতা নহে। সেক্সপীয়র পরের হৃদয় চিত্র করিয়া দৃশ্যকাব্যে অসাধারণ হইয়াছেন, কিন্তু নিজের হৃদয়চিত্রে অক্ষম হইয়া গীতিকাব্যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। তেমনি বাইরন্ নিজ হৃদয়চিত্রে অসাধারণ ; কিন্তু পরের হৃদয়চিত্রে অক্ষম। গীতিকাব্য অকৃত্রিম, কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয়কাননের পুষ্প ; আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পর-হৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, ভার্জিল প্রভৃতি প্রাচীন কালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লিখিতে পারিব না ; কেননা সেই প্রাচীন কালে লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না, সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অনাবৃত হৃদয় সকল সহজেই চিত্র করিতে পারিতেন।' [১১] আধুনিক কালে কোনো কবির পক্ষে যে মহাকাব্য রচনা করা সম্ভব নয় বা করতে গেলেও যে তিনি সাফল্য লাভে অক্ষম হবেন—প্রসঙ্গত সে-কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি আধুনিক মহাকাব্য রচয়িতাদের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আজকাল মহাকাব্যের এত বাহুল্য হইয়াছে যে যিনিই এখন কবি হইতে চান তিনিই একখানি গীতিকাব্য লিখিয়াই একখানি করিয়া মহাকাব্য বাহির করেন, কিন্তু তাঁহারা মহাকাব্যে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন না। যদি বিদ্যাপতি-জয়দেবের সময় তাঁহাদের মনের এখনকার ন্যায় অবস্থা থাকিত তবে তাঁহারা হয়ত উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিতে পারিতেন। এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধহৃদয় লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখন কখন রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত মেঘনাদবধে বৃত্রসংহারে ঐ সকল কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে।' [১২]

রামায়ণ অবলম্বনে রচিত মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের

মনোভাব যে অনুকূল ছিল না সেটা ১২৮৪-তে 'ভারতী'তে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনার পূর্বেই 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে।

১২৮৪ বঙ্গাব্দের 'ভারতী' পত্রিকার শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ও পৌষ—মোট পাঁচ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনা করেন। এই নিবন্ধে বাল্মীকি রামায়ণের কাব্যোৎকর্ষের সঙ্গে তুলনায় 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দুর্বলতা ও অসাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রবন্ধ রচনার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে পরিচিত হন এবং খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত সংস্কৃত মূল ও তার গদ্যানুবাদও পাঠ করেন। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে অনেক স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রবীন্দ্রনাথ তাঁর ওই ষোলো বছর বয়সে মূল বাল্মীকি রামায়ণ থেকে নিজেও কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করে প্রবন্ধে ব্যবহার করেন। যে-অংশ হেমচন্দ্র-কৃত অনুবাদ, সেই অংশে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা অনুবাদকের উল্লেখ করেছেন পাদটীকায়। আর বাল্মীকি রামায়ণের যে-অংশ রবীন্দ্রনাথ নিজে অনুবাদ করেছেন সেখানেও তিনি তা স্পষ্ট করেই পাঠককে জানিয়েছেন। যেমন, 'বাল্মীকির রামায়ণে শোকের সময় রাবণের কিরূপ অবস্থা বর্ণিত আছে, এ-স্থলে তাহা অনুবাদ করিয়া পাঠকদের গোচরার্থে লিখিলাম, ইহাতে পাঠকেরা দেখিবেন বাল্মীকির রাবণ হইতে মেঘনাদবধের রাবণের কত বিভিন্নতা।' [১৩]

আমরা এখানে বাল্মীকি রামায়ণের রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদের অল্প অংশ উদ্ধৃত করছি। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এই অনুবাদের দুটি-একটি খসড়া পাঠ তাঁর 'মালতী পুঁথি'র পাতাতেও পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোরের প্রাপ্ত প্রথম লেখালিখির খাতা—যা পরবর্তী কালে 'মালতী পুঁথি' নামে পরিচিত—সেটি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। এখন রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত হল রবীন্দ্রনাথ-কৃত বাল্মীকি রামায়ণের গদ্যানুবাদের অংশবিশেষ।

'অনন্তর হনুমান-কর্তৃক অক্ষ নিহত হইলে রাক্ষসাধিপতি মনঃসমাধানপূর্বক শোক সংবরণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে রণে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন।...ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া কৃতাঞ্জলিবদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষকে কহিলেন, অকম্পনকে সেনাপতি করিয়া শীঘ্র যুদ্ধবিশারদ ঘোরদর্শন দুর্ধর্ষ রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থে নির্গত হউক। অতঃপর ক্রুদ্ধ রাবণ অকম্পন হত হইয়াছেন শুনিয়া কিঞ্চিৎ দীনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাক্ষসপতি মুহূর্তকাল মন্ত্রীদিগের সহিত চিন্তা করিয়া ক্রোধে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।' [১৪]

বাল্মীকির রামচন্দ্র চরিত্রের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা পাই রবীন্দ্রনাথের বর্তমান প্রবন্ধে, যেখানে তিনি বাল্মীকির রামের সঙ্গে মাইকেলের রামের তুলনামূলক বিচার করেছেন। আমাদের কৌতূহল বাল্মীকির রাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যানটি কিরকম?

'বাল্মীকি রামের চরিত্র-বর্ণনাকালে বলিয়াছেন "যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বল, বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি, পর্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য।" "ক্ষোভের কারণ উপস্থিত

হইলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন না।" যখন কৈকেয়ী রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন, তখন "মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত ও শোকাবিষ্ট হইলেন না।" "চন্দ্রের যেমন হ্রাস সেইরূপ রাজ্যনাশ তাঁহার স্বাভাবিক শোভাকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারিল না! জীবন্মুক্ত যেমন সুখে দুঃখে একইভাবে থাকেন, তিনি তদ্রূপই রহিলেন ; ফলতঃ ঐ সময়ে তাঁহার চিত্ত-বিকার কাহারই অণুমাত্র লক্ষিত হইল না।" "ঐ সময় দেবী কৌশল্যার অন্তঃপুরে অভিষেক-মহোৎসব-প্রসঙ্গে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ হইতেছিল। রাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া ওই বিপদে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জ্যোৎস্নাপূর্ণ শারদীয় শশধর যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না, সেইরূপ তিনিও চিরপরিচিত হর্ষ পরিত্যাগ করিলেন না।" সাধারণ্যে রামের প্রজারঞ্জন, এবং বীরত্বের ন্যায় তাঁহার অটল ধৈর্যও প্রসিদ্ধ আছে। বাল্মীকি রামকে মনুষ্যচরিত্রের পূর্ণতা অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; তিনি তাঁহাকে কোমলতা ও বীরত্ব, দয়া ও ন্যায়, সহৃদয়তা ও ধৈর্য প্রভৃতি সকলপ্রকার গুণের সামঞ্জস্য-স্থল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।' [১৫] বাল্মীকি রামায়ণের রাম-চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা পরবর্তী কালে তাঁর গদ্য পদ্য ইত্যাদি বিভিন্ন রচনায় আরও সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই সমালোচনা-নিবন্ধে 'রামায়ণের নায়ক মহাবীর রাম' 'মোঘনাদবধ কাব্যে'র কবির হাতে কিরূপ 'দুর্দশা' প্রাপ্ত বা 'কৃপাপ্রাপ্ত বালক'-এ পরিণত হয়েছে সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তীব্র আলোকপাত করেছেন। (বাল্মীকির রামের সঙ্গে তুলনায় ভবভূতির রামের নিকৃষ্টতা এইভাবেই আলোচনা করেছিলেন বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষের পর পর পাঁচ সংখ্যায়, 'উত্তরচরিত' শীর্ষক সমালোচনা-নিবন্ধে) বাল্মীকি রামায়ণে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন 'রামের চরিত্রে বীরত্ব ও কোমলত্ব সমানরূপে মিশ্রিত আছে। পৌরুষ এবং স্ত্রীত্ব উভয় একাধারে মিশ্রিত হইলে তবে পূর্ণ মনুষ্য সৃজিত হয়, বাল্মীকি রামকে সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।' [১৬] রবীন্দ্রনাথের মতে সেই প্রয়াস মধুসূদনের কবিতায় নেই—সেখানে রামের কোমলতা অপর্যাপ্তরূপে বর্ণিত, কিন্তু রামের বীরত্ব সেখানে যেন একান্তই অনুপস্থিত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'মূল রামায়ণে লক্ষ্মণের শক্তিশেল যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনুবাদিত করিয়া' [১৭] দেন। এই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদ নয়।

মূল রাময়ণের লক্ষ্মণচরিত্রও মধুসূদনের হাতে খর্ব হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ সেদিন মনে করেছিলেন। লক্ষ্মণের সঙ্গে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের তুলনা করেন এবং মেঘনাদবধে 'লক্ষ্মণের নীচতা, কাপুরুষতা, অক্ষত্রোচিত ব্যবহার' যে কীরকম তা স্পষ্ট করে বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের যেরূপ যুদ্ধবর্ণনা আছে' তা পাঠকবর্গের গোচরার্থে নিজে অনুবাদ করে দেন।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত মূল রামায়ণের অনুবাদ—ইন্দ্রজিতের সঙ্গে লক্ষ্মণের যুদ্ধবর্ণনা থেকে :

'তুমি এই স্থানে বয়স কাটাইয়াছ, তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, সুতরাং পিতৃব্য হইয়া কিরূপে আমার অনিষ্ট করিতেছ? জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব জাতি ও সৌহার্দ্যও তোমার নিকট কিছুই নয়। তুমি ধর্মকেও উপেক্ষা করিতেছ। নির্বোধ! তুমি যখন স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছ তখন তুমি শোচনীয় এবং সাধুগণের নিন্দনীয়। আত্মীয়স্বজনের সহবাস ও অপর নীচ ব্যক্তির আশ্রয় এই দুইটির যে কত অন্তর তুমি বুদ্ধিশৈথিল্যে তাহা বুঝিতেছ না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণও হয় তবুও নির্গুণ স্বজন শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। স্বজনের প্রতি তোমার যেরূপ নির্দয়তা, ইহাতে তুমি জনসমাজে প্রতিষ্ঠা ও সুখ কদাচই পাইবে না। আমার পিতা গৌরব বা প্রণয়বশতই হউক তোমাকে যেমন কঠোর ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন তেমনই তো আবার সান্ত্বনাও করিয়াছেন। গুরুলোক প্রীতিভরে অপ্রিয় কথা বলেন বটে কিন্তু অবিচারিত মনে আবার তো সমাদরও করিয়া থাকেন। দেখো, যে ব্যক্তি সুশীল মিত্রের বিনাশার্থ শত্রুর বৃদ্ধি কামনা করে ধান্যগুচ্ছের সন্নিহিত শ্যামাকের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া ক্রোধভরে লক্ষ্মণকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ রোষাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, রে দুষ্ট! কথা মাত্রে কখনো কার্যের পারগামী হওয়া যায় না, যিনি কার্যত তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান। তুই নির্বোধ, কেন দুষ্কর কার্যে কতকগুলি নিরর্থক বাক্য ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতকার্য জ্ঞান করিতেছিস। তুই অন্তরালে থাকিয়া রণস্থলে আমাদিগকে ছলনা করিয়াছিস। কিন্তু দেখ, এই পথটি তস্করের, বীরের নয়। এক্ষণে আত্মশ্লাঘা করিয়া কী হইবে, যদি তুই সম্মুখযুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিস, তবেই আমরা তোর বলবীর্যের পরিচয় পাইব। আমি তোরে কঠোর কথা কহিব না, তিরস্কার কি আত্মশ্লাঘাও করিব না অথচ বধ করিব। দেখ, আমার কেমন বল বিক্রম। অগ্নি নীরবে সমস্ত দগ্ধ করিয়া থাকেন এবং সূর্য নীরবে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।'[১৮]

এখানেই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনাটি সমাপ্ত। কিছুটা আকস্মিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের লিখিত দীর্ঘ সমালোচনাটি সমাপ্ত হয়েছে বলতে হয়।

গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রকাশিত হয় ১২৮৭ ফাল্গুনে, ১৮৮১ ফেব্রুয়ারিতে। বাল্মীকি সরস্বতী কৃপায় দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে করুণায় অভিষিক্ত হয়ে কিরূপে অমর কবিত্ব লাভ করেন, সেই কাহিনী বিবৃত করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। 'কৈশোর শেষের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যরচনা বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র দ্বারা উদ্‌বোধিত হলেও বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে তাঁর আকৈশোর পরিচয়েরই প্রমাণ দেয়।'[১৯] জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, 'শৈশব হইতেই রবীন্দ্রচিত্তে রামায়ণের প্রভাব নিগূঢ়ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনা 'বাল্মীকি-প্রতিভা' তাহার প্রথম স্বাক্ষর।'[২০] ১২৮৮ আশ্বিনের 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাল্মীকির জয় গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন, 'বাল্মীকি, ঋভুদিগের গান শুনিয়া অবধি দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন তিনি পরের দুঃখে বড় কাতর। পরের দুঃখে কাতর বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে পবিত্রতা জন্মিল। সেই

কাতরতাই নীতি—তাহার প্রকাশ কবিত্ব। পরের প্রতি প্রীতিমান্ বাল্মীকি হৃদয়ে কবি হইয়াছিলেন—ভারতীর কৃপায় তিনি বাক্যেও কবি হইলেন। যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মীকি প্রতিভা' পড়িয়াছেন, বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না।' [২১]

'বাল্মীকি প্রতিভার' অল্প পরেই রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে গীতিনাট্য রচনা করেন 'কালমৃগয়া' (১৮৮২ ডিসেম্বর)। রামায়ণের দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ এই নাটকের বিষয়বস্তু। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র মূলভাব ছিল করুণা। 'কালমৃগয়া'রও তাই। কবির কথায় 'ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন।'

'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৮ মাঘ সংখ্যায় 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' শিরোনামে দুটি গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ দু'টি গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'রাবণ-বধ দৃশ্য কাব্য' ও 'অভিমন্যু-বধ দৃশ্য কাব্য'। সম্প্রতি বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর ঊনত্রিশ খণ্ডে এটি সঙ্কলিত হয়েছে। [২২]

বর্তমান সমালোচনা-নিবন্ধে সমালোচক 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মধুসূদনের দুর্বলতা ও অক্ষমতার উল্লেখ করে কীভাবে গিরিশচন্দ্র মূল মহাকাব্যের ভাবানুসরণ ও চরিত্রের অনুসরণ করে দৃশ্য কাব্য রচনায় অনেকখানি সাফল্য দেখিয়েছেন তা নির্দেশ করেছেন। 'তাঁহার রাবণ বধে যদিও রাম-লক্ষ্মণের প্রকৃতি বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয় নাই, তবুও তাঁহার রাবণ ও মন্দোদরী এমন জীবন্ত হইয়াছে, যে সেইজন্যই রাবণ-বধ নাটকখানি এত প্রীতিকর লাগে। রাবণের মহান বীরত্ব ও মন্দোদরীর কবিত্বময় তেজস্বিতা এত পরিস্ফুট রূপে রাবণ-বধ নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে যে তাহার উপরে আমাদের একটি কথা কহিবার আবশ্যক নাই।' [২৩]

সাধারণভাবে রামায়ণ-মহাকাব্য অথবা শুধু মহাকাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র প্রবন্ধে সেই দিকটির প্রতি আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য থাকছে।

'ভারতী'র সূচনায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ধারাবাহিক সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সে কথা আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। পাঁচ বছর পর 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র একটি সমালোচনা লিখছেন ১২৮৯ ভাদ্র সংখ্যায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন মহাকাব্যের প্রকৃত স্বরূপ কী, এবং বাল্মীকির রামায়ণ-মহাকাব্যের প্রকৃত গৌরব ও মহিমা কোথায়—বাহুবলে না ধর্মবলে?

'মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয় হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না ; তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন একজন পরমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্য-চরিত্রের উদার-মহত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরমপুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্মাণ করিতে থাকেন ; সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দেশে নিবিষ্ট থাকে,

সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন, তাহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্য-কিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিগদেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য! মহাকাব্য পড়িয়া আমরা তাহার রচনাকালের যথার্থ উন্নতি অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি সেই সময়কার উচ্চতম আদর্শ কি ছিল। কাহাকে তখনকার লোকেরা মহত্ত্ব বলিত। আমরা দেখিতেছি, হোমরের সময়ে শারীরিক বলকেই বীরত্ব বলিত, শারীরিক বলের নামই ছিল মহত্ত্ব। বাহুবলদৃপ্ত একিলিসই ইলিয়ডের নায়ক ও যুদ্ধবর্ণনাই তাহার আদ্যোপান্ত। আর আমরা দেখিতেছি, বাল্মীকির সময়ের ধর্মবলই যথার্থ মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য ছিল—কেবলমাত্র দাম্ভিক বাহুবলকে তখন ঘৃণা করিত। হোমরে দেখ, একিলিসের ঔদ্ধত্য, একিলিসের বাহুবল, একিলিসের হিংস্র প্রবৃত্তি ; আর রামায়ণে দেখ, এক দিকে রামের, সত্যের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে লক্ষ্মণের, প্রেমের অনুরোধে আত্মত্যাগ, এক দিকে বিভীষণের ন্যায়ের অনুরোধে সংসার ত্যাগ। রামও যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধ ঘটনাই তাঁহার সমস্ত চরিত্র ব্যাপ্ত করিয়া থাকে নাই, তাহা তাঁহার চরিত্রের সামান্য এক অংশ মাত্র। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, হোমরের সময়ে বলকেই ধর্ম বলিয়া জানিত ও বাল্মীকির সময়ে ধর্মকেই বল বলিয়া জানিত। অতএব দেখা যাইতেছে, কবিরা স্ব স্ব সময়ের উচ্চতম আদর্শের কল্পনায় উত্তেজিত হইয়াই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন ও সেই উপলক্ষে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের বর্ণনা অবতারিত হইয়াছে—যুদ্ধের বর্ণনা করিবার জন্যই মহাকাব্য লেখেন নাই।' [২৪]

রামায়ণ যে নিছক যুদ্ধকাব্যমাত্র নয়, রাম-রাবণের যুদ্ধই যে এই মহাকাব্যের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়—এ অনুভব রবীন্দ্রনাথের প্রথমাবধি। তাঁর এই বোধ ও বিশ্বাস আরও স্পষ্ট ও আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তাঁর পরবর্তী কালের রামায়ণভাবনার মধ্য দিয়ে।

তাঁর রামায়ণ সম্পর্কিত মূল ভাবনার আরও বিস্তার লক্ষ্য করি পত্রাকারে রচিত প্রবন্ধ 'চিঠিপত্র'র মধ্যে (১৮৮৭ খ্রি)'। কল্পিত ষষ্ঠীচরণ ও নবীনকিশোরের এই পত্র বিনিময় প্রথমে ছাপা হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২ বঙ্গাব্দ/১৮৮৫-৮৬ খ্রি) মাসে-মাসে।

পত্রধারার ৫-সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্র-মন্তব্য :

'বৃহৎ ভাবের নিকটে আত্মবিসর্জন করা...ইহাই প্রকৃত বীরত্ব। কর্তব্যের অনরোধে রাম যে রাজ্য ছাড়িয়া বনে গেলেন তাহাই বীরত্ব, এবং সীতা ও লক্ষ্মণ যে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন তাহাও বীরত্ব। ভরত যে রামকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন তাহা বীরত্ব, এবং হনুমান যে প্রাণপণে রামের সেবা করিয়াছিলেন তাহাও বীরত্ব। হিংসা অপেক্ষা ক্ষমায় যে অধিক বীরত্ব, গ্রহণের অপেক্ষা ত্যাগে অধিক বীরত্ব, এই কথাই আমাদের কাব্যে ও শাস্ত্রে বলিতেছে। পালোয়ানিকে আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বড়ো জ্ঞান করিত না। এইজন্য বাল্মীকির রাম রাবণকে পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, রাবণকে ক্ষমা

করিয়াছেন। রাম রাবণকে দুইবার জয় করিয়াছেন। একবার বাণ মারিয়া, একবার ক্ষমা করিয়া। কবি বলেন, তম্মধ্যে শেষের জয়ই শ্রেষ্ঠ।' [২৫]

যুদ্ধ নয় বাহুবল নয়, ক্ষমা ত্যাগ সেবাধর্মই ভারতবর্ষের মানুষের চিরকালের ধর্ম। এইখানেই য়ুরোপীয় মহাকাব্যের সঙ্গে ভারতীয় মহাকাব্যের প্রভেদ। বাহুবলের অর্থ তো শারীরিক বল ; সে বল তো মানুষের অপেক্ষা পশুর অধিক। সেই বলে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা যায় কিন্তু জয় করা যায় না। ভারতবর্ষ যে চিরকাল মহৎ আদর্শের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এসেছে বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যে তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

রামায়ণ কাহিনীর (বালকাণ্ড, ৪৮-৪৯ সর্গ) অহল্যার শাপমুক্তিকে উপলক্ষ করে রচিত মানসী কাব্যের 'অহল্যার প্রতি' (১১-১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭/২৪-২৫ মে ১৮৯০) কবিতা। পাষাণী অহল্যার মধ্যস্থতায় কবির বিশ্বানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়। [২৬]

শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের'-এ ('সাধনা' ১২৯৯ পৌষ) রামায়ণ প্রসঙ্গ একাধিকবার এসেছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, পাশ দিয়া, কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে উর্ধ্বশ্বাসে, দ্রুত বেগে, দক্ষিণে বামে দৃক্‌পাত না করিয়া, পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনোকিছুর সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোনো শখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়। শখের বই জুটিবেই বা কোথা হইতে? বাংলায় সেরূপ গ্রন্থ নাই। এক রামায়ণ মহাভারত আছে, কিন্তু ছেলেদের এমন করিয়া বাংলা শেখানো হয় না, যাহাতে তাহারা আপন ইচ্ছায় ঘরে বসিয়া কোনো বাংলা কাব্যের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে।' [২৭]

এই সূত্রেই প্রবন্ধের আর এক স্থলে বলেছেন, 'যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত ; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত—গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া, প্রকৃতি-জননীর উপর সহস্র দৌরাত্ম্য করিয়া, শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত।' [২৮]

এমন একটি বালককেই বুঝি দেখতে পাই ১৩০২-এ 'সাধনা'র শেষ সংখ্যায় 'অতিথি' গল্পে। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে উল্লেখ করা যাবে।

১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৩ শ্রাবণ (২৮ জুলাই ১৮৯৩) রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘতম কবিতা 'পুরস্কার' রচিত। 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত। এই কবিতায় দেখতে পাই রামায়ণ ও সেই সঙ্গে মহাভারতেরও কাব্যগুণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বকীয়ভাবে একটি নির্দিষ্ট ধারণায় উপনীত ; শান্ত করুণ রস এবং বৈরাগ্যময় বিষাদ সম্পর্কে স্বীয় অনুভব 'পুরস্কার'-এর 'কবি'র মধ্যস্থতায় উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন।

রঘুকুলরবি রাঘবের যে পুণ্যকাহিনী রামায়ণের পটে আদি কবি বাল্মীকি একদিন অঙ্কন করেছিলেন তার মধ্যে বাস্তব উপাদান অতিক্রম করে রামচন্দ্রের একটি সত্যতম

নিত্যতম মূর্তিই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—যাবতীয় খণ্ড ঘটনা ও কাহিনীর অন্তর বিদীর্ণ করে এক মহান সত্য, জীবনের একটি মহারাগিণী মূর্ছিত হয়ে ওঠে। 'পুরস্কার'-এর 'কবি'—

"কহিল, 'বারেক ভাবি দেখো মনে/সেই এক দিন কেটেছে কেমনে/যেদিন মলিন বাকল বসনে/চলিলা বনের পথে—/ভাই লক্ষ্মণ বয়স নবীন, /ম্লান ছায়াসম বিষাদ-বিলীন/নববধূ সীতা আভরণহীন/উঠিলা বিদায় রথে।/রাজপুরীমাঝে উঠে হাহাকার,/প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে সার—/এমন বজ্র কখনো কি আর/পড়েছে এমন ঘরে!/অভিষেক হবে, উৎসবে তার/আনন্দময় ছিল চারিধার—/মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার/শুধু নিমেষের ঝড়ে।/আর-এক দিন, ভেবে দেখো মনে,/যেদিন শ্রীরাম লয়ে লক্ষ্মণে/ফিরিয়া নিভৃত কুটির-ভবনে/দেখিলা জানকী নাহি—/'জানকী জানকী' আর্ত রোদনে/ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,/মহা-অরণ্য-আঁধার আননে/রহিল নীরবে চাহি।/তার পরে দেখো শেষ কোথা এর,/ভেবে দেখো কথা সেই দিবসের—/এত বিষাদের, এত বিরহের,/এত সাধনের ধন,/সেই সীতাদেবী রাজসভামাঝে/বিদায়-বিনয়ে নমি রঘুরাজে/দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে/হইলা অদর্শন।/সে-সকল দিন সেও চলে যায় ; /সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়—/যায়নি তো এঁকে ধরণীর গায়/অসীম দগ্ধ রেখা।/দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,/দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,/সরযূর কূলে দুলে তৃণসার/প্রফুল্ল শ্যামলেখা।/শুধু সেদিনের একখানি সুর/চিরদিন ধরে বহু বহু দূর/কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর/মধুর করুণ তানে ; /সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে/যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে/আজিও সে গীত মহাসংগীতে/বাজে মানবের কানে।" [২৯] কবিকে উপলক্ষ করে রামায়ণের শাশ্বত মহিমার কথা স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'সাধনা' পত্রিকায় (১৩০১ বৈশাখ) 'বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় বাল্যকালে যে-সব বাংলা বই পড়েছেন তাতে কাশীরাম দাস, বিবিধার্থ সংগ্রহ, আরব্য ও পারস্য উপন্যাস, বাংলা রবিনসন ক্রুসো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবনচরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতির সঙ্গে কৃত্তিবাসের রামায়ণের নামোল্লেখ করেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রসঙ্গ পরেও তিনি কয়েকবার উত্থাপন করেছেন। [৩০]

'পঞ্চভূত'-এর কোনো কোনো প্রবন্ধে রামায়ণ প্রসঙ্গ এসেছে। 'কাব্যের তাৎপর্য' প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায় ১৩০১ অগ্রহায়ণে। এখানে ব্যোম ক্ষিতি সমীর ও স্রোতস্বিনী নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী 'বিদায়-অভিশাপ' কবিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে।

সমীর 'অভিশাপ'-এর তাৎপর্য তার মতো করে ব্যাখ্যা করে বলছে, 'তোমরা যে সকল কথা তুলিয়াছিলে সেগুলো বড়ো বেশি সাধারণ কথা। মনে করো যদি বলা যায়, রামায়ণের তাৎপর্য এই যে রাজার গৃহে জন্মিয়াও অনেকে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে...তবে সেটাকে একটা নূতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্তা বলা যায় না।' এর উত্তরে স্রোতস্বিনীর বক্তব্য, 'আমার তো মনে হয় সেই সকল সাধারণ কথাই কবিতার কথা। রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও সর্বপ্রকার সুখের সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমৃত্যুকাল অসীম দুঃখ রাম ও সীতাকে সংকট

হইতে সংকটান্তবে ব্যাধেব ন্যায় অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে—সংসারে এই অত্যন্ত সম্ভবপর, মানবাদৃষ্টেব এই অত্যন্ত পুরাতন দুঃখকাহিনীতেই পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট এবং আর্দ্র হইয়াছে।' [৩১]

১৩০১ পৌষে 'সাধনা'তে প্রকাশিত হয় 'পঞ্চভূত'-এর 'কৌতুকহাস্য' প্রবন্ধটি। এই নিবন্ধে কাব্যে কেন দুঃখকর প্রসঙ্গও আনন্দদায়ক ও পাঠসুখকর হয়ে ওঠে সেই আলোচনা সূত্রে কবি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সেখানেও রামায়ণের রাম ও সীতার প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। 'রামায়ণে সীতা-বিয়োগে রামের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই,...কিন্তু সেই দুঃখপীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে-সকল কাব্য আমাদের নিকট তুচ্ছ হইত। বরঞ্চ দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি। কারণ, দুঃখানুভবে আমাদের চিত্তে অধিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে।' [৩২]

একই পত্রিকায় দু'মাস পরে ফাল্গুনে 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধে দেখি ববীন্দ্রনাথ পুনরায় তাঁর আলোচনায় বামায়ণ প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। এ-কথাটা বোঝাতে চাইছেন যে অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনি আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়। 'রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করিয়া, বনবাস প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া, রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্যসুখের চরম শিখবে আরোহণ করিয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল—গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন।' [৩৩] এখানে ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার যে অসঙ্গতি তা হাস্যজনক নয়, তা দুঃখজনক ; তা কমেডি নয়—ট্রাজেডি।

'অপূর্ব রামায়ণ' 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয় ১৩০২ আষাঢ়ে। 'পঞ্চভূত'-এর এই নিবন্ধে রামায়ণ কাহিনীর এক অভিনব ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছে ক্ষিতি। তার বক্তব্যে রামচন্দ্র হলেন মানুষের প্রতীক আর সীতা প্রেমের প্রতীক। ধর্মশাস্ত্রের কলঙ্ক রটনায় এই প্রেম মৃত্যুতমসার তীরে নির্বাসিত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে অনিত্য পদার্থের সঙ্গে বাস করেছে। নির্বাসিত প্রেম লবকুশকে অর্থাৎ কাব্য ও ললিতকলাকে প্রসব করেছে। তারা কবির কাছে রাগিণী শিখে তাই গেয়ে পিতার মন চঞ্চল ও চোখ অশ্রুসিক্ত করে তুলেছে। এখন ত্যাগ প্রচারক প্রাচীন বৈরাগ্যধর্ম জয়ী হবে, না এই দুটি মঙ্গলগায়ক শিশু জয়লাভ করবে সেটাই দেখবার। ক্ষিতির এই রামায়ণ ব্যাখ্যায় ভারতের ত্যাগ ধর্মের শাশ্বত ঐতিহ্যেরই অনুসরণ রয়েছে। প্রেম-বিরহের কাব্য রামায়ণে রামচরিত্রে যে ত্যাগের মহিমা প্রকাশ পেয়েছে, তা কবির চোখে বিশেষভাবে ধরা পড়ে।

'চিত্রা'র 'নগরসংগীত' (প্রকাশ : সাধনা ১৩০২ ভাদ্র-আশ্বিন-কার্ত্তিক একত্রিত সংখ্যায়) কবিতায় উত্তেজনাপূর্ণ স্বার্থান্ধ নাগরিক জীবনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে কবি চিত্রানুষঙ্গে নিয়ে এসেছেন রামায়ণের মায়ামৃগের প্রসঙ্গ :

কোন্ মায়ামৃগ কোথায় নিত্য
স্বর্ণ ঝলকে করিছে নৃত্য

তাহারে বাঁধিতে লোলুপচিত্ত
ছুটিছে বৃদ্ধবালকে।

এই মায়াবী স্বর্ণমৃগের গূঢ়ার্থ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'রামায়ণ' শীর্ষক প্রবন্ধে।

যে সংখ্যার 'সাধনা'য় কবিতায় এসেছে রামায়ণের প্রসঙ্গ, পত্রিকার সেই সংখ্যাতেই দেখি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পুনরায় রামায়ণ প্রসঙ্গ। গল্পের নাম 'অতিথি'। 'অতিথি'র তারাপদ কার না চেনা? এই পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেটি তথাকথিত বিদ্যালয়-পাঠে শিক্ষিত নয় সত্য, কিন্তু প্রকৃতির শিক্ষায় সে এক আশ্চর্য সুন্দর আকর্ষক নির্মল চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল।' এই গৃহত্যাগী সুন্দর ব্রাহ্মণ বালকটির পরম-আত্মীয় ছিল কে? 'এই জল স্থল আকাশ, এই চারিদিকের সচলতা সজীবতা মুখরতা, এই ঊর্ধ্ব-অধোদেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা, এই সুবৃহৎ চিরস্থায়ী নির্নিমেষ বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল।' এই তারাপদর রামায়ণ পাঁচালি গাওয়ার প্রসঙ্গ আছে 'অতিথি' গল্পে।

'মতিলালবাবু চিরপ্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার স্ত্রীকন্যাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিলেন ; কুশলবের কথার সূচনা হইতেছে এমন সময় তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, "বই রাখুন। আমি কুশলবের গান করি, আপনারা শুনে যান।"—এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মতো সুমিষ্ট পরিপূর্ণস্বরে দাশু রায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল। দাঁড়ি-মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল ; হাস্য করুণা এবং সঙ্গীতে সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব রসস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল—দুই নিস্তব্ধ তটভূমি কুতূহলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া যে-সকল নৌকা চলিতেছিল তাহাদের আরোহিগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল ; যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিতচিত্তে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন।'[৩৪]

বাল্মীকি-রামায়ণের বালকাণ্ডের নবম ও দশম সর্গে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী রয়েছে। মূলে কোথাও বারাঙ্গনাদের মধ্যে নারীত্বের নির্বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা নেই। তাদের ছলনাময়ী রূপেরই বিস্তৃত বর্ণনা আছে। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনী অবলম্বনে লিখলেন তাঁর 'পতিতা' (৯ কার্ত্তিক ১৩০৪) কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ কাহিনী থেকে কবিতা রচনার প্রেরণা পেলেও তাঁর কবিতায় পতিতা, প্রেমপূজারিণী চিরন্তনী কল্যাণময়ী রমণীতে পরিণত। মূলকে অবলম্বন ও অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিকল্পনার নূতন সৃষ্টি হয়ে দেখা দিয়েছে।

যে-রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে একদিন বলেছিলেন রামায়ণের মধ্যে শুধু রামকথা নয়, ভারতবর্ষের পরিচয়ও বিধৃত—সেই রবীন্দ্রনাথই লোকসাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে (১৩০৫/১৮৯৮) শুধু রামায়ণ নয়, রামায়ণের পাঠককেও তাঁর

আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রবেশ করলেই দেখা যাবে রামায়ণ প্রসঙ্গে তাঁর ভাবনা নূতনতর পথে এগোচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের অভিমত—

'একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ-কথাই সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত, সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক। আমাদের দেশে হরগৌরী-কথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু তাহার প্রসর সংকীর্ণ, তাহাতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই। রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশ-প্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ, তাহা যেমন কঠোরগম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধকোমল। রামায়ণকথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যত প্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদয়বৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।' [৩৫]

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকায় যে বলেছিলেন 'রামায়ণ মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে', সে-কথার পূর্বাভাস পাই তাঁর সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩০৫ আশ্বিন)। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

'এক সময়ে রামায়ণ-মহাভারত ছিল ইতিহাস। এখনকার ইতিহাস তাহার সহিত কুটুম্বিতা স্বীকার করিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয় ; বলে কাব্যের সহিত পরিণীত হইয়া উহার কুল নষ্ট হইয়াছে। এখন তাহার কুল উদ্ধার করা এতই কঠিন হইয়াছে যে, ইতিহাস তাহাকে কাব্য বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে। কাব্য বলে, ভাই ইতিহাস, তোমার মধ্যে অনেক মিথ্যা আছে, আমার মধ্যেও অনেক সত্য আছে ; এসো আমরা পূর্বের মতো আপস করিয়া থাকি। ইতিহাস বলে, না ভাই, পরস্পরের অংশ বাঁটোয়ারা করিয়া বুঝিয়া লওয়া ভালো। জ্ঞান-নামক আমিন সর্বত্রই সেই বাঁটোয়ারা-কার্য আরম্ভ করিয়াছে। সত্যরাজ্য এবং কল্পনারাজ্যের মধ্যে একটা পরিষ্কার রেখা টানিবার জন্য সে বদ্ধপরিকর।' [৩৬]

এই প্রবন্ধ রচনার বছর কয়েক পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় (১৩০১ মাঘ-ফাল্গুন) বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থটির এক দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। বঙ্কিম মহাভারতের

মধ্য থেকে প্রকৃত ইতিহাস অংশ উদ্ধার করে কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক চরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের এই প্রয়াসের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত হতে পারেননি। ইতিহাসের সত্যই যে চূড়ান্ত সত্য নয়, কাব্যের সত্য যে তার চেয়ে অনেক বড়, গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান—রবীন্দ্রনাথ ওই প্রবন্ধে সে কথা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। রবীন্দ্রনাথ ওই সমালোচনায় বলেছেন—

'তথ্য, যাহাকে ইংরাজিতে fact কহে, সত্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি ও কল্পনা-বলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসের শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সত্য কবির প্রতিভাবলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।' কৃষ্ণ প্রসঙ্গে বলেছেন—'মহাভারতে কবি-বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের প্রত্যেক তথ্যটি প্রকৃত না হইতে পারে, কৃষ্ণের মুখে যত কথা বসানো হইয়াছে তাহার প্রত্যেক বৃত্তান্তটি প্রামাণিক না হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের যে মাহাত্ম্য তিনি পাঠকদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন তাহাই সর্বাপেক্ষা মহামূল্য সত্য।...কবি বাস্তবিকই ইতিহাস হইতে সত্যতম নিত্যতম কৃষ্ণকে উদ্ধার করিয়া লইয়াছেন।' [৩৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই তত্ত্বটি 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় মহর্ষি বাল্মীকি ও দেবর্ষি নারদের সংলাপে রামায়ণ কাব্যের রামচরিত্র নির্মাণসূত্রে উপস্থাপিত করেছেন।

বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডের সূচনাই এইরূপ—'মহর্ষি বাল্মীকি তপোনিরত স্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদবিদ্‌দিগের অগ্রগণ্য মুনিবর নারদকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন,—দেবর্ষে! এক্ষণে এই পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি গুণবান, বিদ্বান, মহাবল পরাক্রান্ত, মহাত্মা, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন? কোন্ ব্যক্তি সকল প্রাণীর হিতসাধন করিয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তি লোকব্যবহার কুশল, অদ্বিতীয়, সুচতুর ও প্রিয়দর্শন? কোন্ ব্যক্তিই বা রোষ ও অসূয়ার বশবর্তী নহেন? রণস্থলে জাতক্রোধ হইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভীত হন? হে তপোধন! এইরূপ গুণসম্পন্ন মনুষ্য কে আছেন, তাহা আপনিই বিলক্ষণ জানেন। এক্ষণে বলুন ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।' [৩৮]

বাল্মীকি রামায়ণের সূচনা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ধরা পড়েছে এইভাবে—

'ভগবন, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে
কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম

সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।'
নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম।' ৩৯

এ কথা শুনে মহর্ষি বাল্মীকি বললেন—তাঁকে জানি, তাঁর কীর্তিকথাও শুনেছি ; কিন্তু বাল্মীকির মনের ভিতরে তথাপি এক বিরাট সংশয়।

কহিলা বাল্মীকি, 'তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে।
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।' ৩৯

এর প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রভাবনা নারদের সংলাপে অভিব্যক্ত।

নারদ কহিলা হাসি, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' ৩৯

বঙ্কিম তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে মহাভারত থেকে প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি অনুসন্ধান নির্বাচন ও বর্জন করে কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা প্রমাণে প্রযত্ন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনায় বলেছিলেন কাব্যাংশের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করে বঙ্কিম যে পদ্ধতিতে মহাভারতের মূল ও প্রক্ষিপ্ত অংশের স্তরভাগ করতে চেয়েছিলেন সেইভাবে 'স্তর নির্ণয় করা নিতান্তই আনুমানিক।' তবে কেমনভাবে প্রাচীন কাব্যের মধ্য থেকে প্রক্ষিপ্ত অংশ নির্ধারণ করা যাবে? রবীন্দ্রনাথের মতে, 'ভাষার প্রভেদ ঐতিহাসিকের প্রধান সমালোচ্য বিষয়, কবিত্বের প্রভেদ নহে।' এ কাজ প্রভূত শ্রমসাধ্য ; এবং বঙ্কিম যে সে-দিক থেকে মহাভারতের বিচার করতে প্রয়াসী হননি রবীন্দ্রনাথ তা জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের রচিত 'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধটি (১৩০৬) তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত। শুধু ভাষা বিচারেই নয়, কাহিনীর স্বাভাবিক ধারা থেকেও যে একটা কাব্যের কোন্ অংশ, কোন্ সর্গ বা কাণ্ড প্রক্ষিপ্ত—তা যে অনুমান করা যায়, তার প্রমাণ আছে রবীন্দ্রনাথ কৃত 'কাদম্বরীচিত্র' সমালোচনায়। কেন ভারতীয় সাহিত্যে প্রক্ষিপ্ত কাহিনী বা অংশ মূল কাব্যে এমন উদারভাবে গৃহীত হয়েছে? এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা—

'অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখানো যাইতে পারে সাধারণ মানবপ্রকৃতি হইতে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। সেই অসামান্যতার আর একটি লক্ষণ এই দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই গল্প শুনিতে ভালোবাসে ; কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষেরই গল্প শুনিতে কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। সকল সভ্যদেশই আপন সাহিত্যে ইতিহাস, জীবনী ও উপন্যাস আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা যায় না ; যদি-বা ভারতসাহিত্যে ইতিহাস উপন্যাস থাকে, তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই। বর্ণনা, তত্ত্বালোচনা ও অবান্তর প্রসঙ্গে তাহার গল্পপ্রবাহ পদে পদে খণ্ডিত হইলেও প্রশান্ত ভারতবর্ষের ধৈর্যচ্যুতি দেখা যায় না। এগুলি মূল কাব্যের অঙ্গ, না প্রক্ষিপ্ত, সে আলোচনা নিষ্ফল। কারণ, প্রক্ষেপ সহ্য করিবার লোক না থাকিলে প্রক্ষিপ্ত টিকিতে পারে না।

পর্বতশৃঙ্গ হইতে নদী যদিও শৈবাল বহন করিয়া না আনে, তথাপি তাহার স্রোত ক্ষীণবেগ না হইলে তাহার মধ্যে শৈবাল জন্মিবার অবসর পায় না।' [৪০]

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিম মহাভারতের প্রক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের।

'কিষ্কিন্ধ্যা এবং সুন্দরকাণ্ডে সৌন্দর্যের অভাব নাই এ-কথা মানি, তবু রাক্ষস যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল তখন গল্পের উপর অতবড়ো একটা জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলে সহিষ্ণু ভারতবর্ষই কেবল তাহা মার্জনা করিতে পারে।...ছয়টি কাণ্ডে যে গল্পটি বেদনা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, একটিমাত্র উত্তরকাণ্ডে তাহাকে অসংকোচে চূর্ণ করিয়া ফেলা কি সহজ ব্যাপার! আমরা লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত এই দেখিয়া আসিলাম যে, অধর্মাচারী নিষ্ঠুর রাক্ষস রাবণই সীতার পরম শত্রু; অসাধারণ শৌর্যে ও বিপুল আয়োজনে এই ভয়ংকর রাবণের হাত হইতে সীতা যখন পরিত্রাণ পাইলেন, তখন আমাদের সমস্ত চিন্তা দূর হইল, আমরা আনন্দের জন্য প্রস্তুত হইলাম, এমন সময় মুহূর্তের মধ্যে কবি দেখাইয়া দিলেন সীতার চরম শত্রু অধার্মিক রাবণ নহে, সে-শত্রু ধর্মনিষ্ঠ রাম, নির্বাসনে তাঁহার তেমন সংকট ঘটে নাই—যেমন তাঁহার রাজাধিরাজ স্বামীর গৃহে; —যে সোনার তরণী দীর্ঘকাল যুঝিয়া ঝড়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইল, ঘাটের পাষাণে ঠেকিবামাত্র এক মুহূর্তে তাহা দুইখানা হইয়া গেল। গল্পের উপর যাহার কিছুমাত্র মমতা আছে সে কি এমন আকস্মিক উপদ্রব সহ্য করিতে পারে। যে বৈরাগ্যপ্রভাবে আমরা গল্পের নানাবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বাধা সহ্য করিয়াছি, সেই বৈরাগ্যই গল্পটির অপঘাত মৃত্যুতে আমাদের ধৈর্য রক্ষা করিয়া থাকে।' [৪১]

রামায়ণ কাহিনীর সূত্রে ভারতীয় মহাকাব্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিনব ব্যাখ্যা পাওয়া গেল—কেন রামায়ণে মহাভারতে মূলের সঙ্গে অজস্র প্রক্ষিপ্ত অংশ কালে কালে কাহিনীর অভ্যন্তরে জায়গা জুড়ে বসেছে। প্রক্ষেপ যে প্রশ্রিত হয়েছে ভারতীয় পাঠকই তার কারণ।

১৩০৭-এ রচিত 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মণ-পত্নী উর্মিলাকে পাঠকের কাছে নূতন করে আবিষ্কার করেছেন। রচনাটি প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত। এই লেখায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন রামায়ণ কাহিনীতে উর্মিলার ত্যাগের সঙ্গে বুঝি সীতা বা লক্ষ্মণের ত্যাগের তুলনা চলে না। সীতা বনবাসী হয়েছে, লক্ষ্মণও সর্বস্ব ত্যাগ করে রামসীতার অনুগমন করেছে—এ কাহিনীতে আমরা অভিভূত হই। এত বড় মহাকাব্যে উর্মিলার সন্ধান আমরা তেমনভাবে পাই না; আমাদের নিকট থেকে সে প্রায় হারিয়েই যায়। কিন্তু এই উপেক্ষিতা উর্মিলা রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে দাগ কেটে যায়। মহাকাব্যে বাল্মীকি কর্তৃক উর্মিলাকে কেন এই উপেক্ষা? রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিকে উদ্দেশ্য করে সে প্রশ্ন তুলে ধরেন, এবং বাল্মীকিকে যে বাধ্য হয়েই এই উপেক্ষার পথ বেছে নিতে হয় সে কথাও রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করে গেছেন। যদি দৈবাৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে বাল্মীকি উপস্থিত থাকতেন তো মহর্ষিদেব মুখ বুজে মৃদু হেসে ঘাড় কাত করে রবীন্দ্রের কথায় সম্মতি

জানাতেন।

'লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্বপ্রকারে আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, সে গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে কিন্তু সীতার জন্য ঊর্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসারে নহে, কাব্যেও। লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ঊর্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন, সে-কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে ঊর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল।/লক্ষ্মণ তো বারো বৎসর ধরিয়া তাঁহার উপাস্য প্রিয়জনের প্রিয়কার্যে নিযুক্ত ছিলেন—নারী-জীবনের সেই বারোটি শ্রেষ্ঠ বৎসর ঊর্মিলার কেমন করিয়া কাটিয়াছিল? সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকাশোন্মুখ হৃদয়মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভ সময় সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণ সীতাদেবীর রক্তচরণক্ষেপের প্রতি নত দৃষ্টি রাখিয়া বনে গমন করিলেন—যখন ফিরিলেন তখন নববধূর সুচির প্রণয়ালোকবঞ্চিত হৃদয়ে আর কি সেই নবীনতা ছিল। পাছে সীতার সহিত ঊর্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে এই শোকোজ্জ্বলা মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন—জানকীর পাদপীঠপার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই?' [৪২]

বাল্মীকি কী বলেন?

ইতিপূর্বে 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় দেখেছি 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম'-এর জীবন-ইতিবৃত্ত রচনার ব্যাপারে বাল্মীকির চিন্তাব্যাকুল উদ্বেগ। নারদ বলেছেন, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে।' রবীন্দ্রনাথের এখন জিজ্ঞাসা, রঘুপতি রামের কীর্তিকথা তো বাল্মীকি রচনা করলেন, কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকির জীবনবৃত্তান্ত রচনা করবে কে?

তারই উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত 'কবিজীবনী' (১৩০৮ আষাঢ়) প্রবন্ধে।

'আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো কবির জীবনচরিত নাই। আমি সেজন্য চিরকৌতূহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি। বাল্মীকি সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহাকে ইতিহাস বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। কিন্তু আমাদের মতে তাহাই কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত। বাল্মীকির পাঠকগণ বাল্মীকির কাব্য হইতে যে জীবনচরিত সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন তাহা বাল্মীকির প্রকৃত জীবনের অপেক্ষা অধিক সত্য। কোন্ আঘাতে বাল্মীকির হৃদয় ভেদ করিয়া কাব্য-উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল? করুণার আঘাতে। রামায়ণ করুণার অশ্রুনির্ঝর। ক্রৌঞ্চবিরহীর শোকার্ত ক্রন্দন রামায়ণকথার মর্মস্থলে ধ্বনিত হইতেছে। রাবণও ব্যাধের মতো প্রেমিকযুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে; লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধব্যাপার উন্মত্ত বিরহীর পাখার ঝট্‌পটি। রাবণ যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল মৃত্যুবিচ্ছেদের অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। মিলনের পরেও এ বিচ্ছেদের প্রতিকার হইল না।/সুখের আয়োজনটি কেমন সুন্দর হইয়া আসিয়াছিল। পিতার স্নেহ, প্রজাদের প্রীতি, ভ্রাতার প্রণয়, তাহারই মাঝখানে ছিল নবপরিণীত রামসীতার যুগলমিলন। যৌবরাজ্যের অভিষেক এই

সুখসম্ভোগকে সম্পূর্ণ এবং মহীয়ান করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছিল। ঠিক এমন সময়েই ব্যাধ শর লক্ষ্য করিল, সেই শর বিদ্ধ হইল সীতাহরণকালে। তাহার পরে শেষপর্যন্ত বিরহের আর অন্ত রহিল না। দাম্পত্যসুখের নিবিড়তম আরম্ভের সময়েই দাম্পত্যসুখের দারুণতম অবসান।/ক্রৌঞ্চমিথুনের গল্পটি রামায়ণের মূল ভাবটির সংক্ষিপ্ত রূপক। স্থূল কথা এই, লোকে এই সত্যটুকু নিঃসন্দেহে আবিষ্কার করিয়াছে যে, মহাকবির নির্মল অনুষ্টুপছন্দপ্রবাহ করুণার উত্তাপেই বিগলিত হইয়া স্যন্দমান হইয়াছে, অকালে দাম্পত্য প্রেমের চিরবিচ্ছেদ-ঘটনই ঋষির করুণার্দ্র কবিত্বকে উন্মথিত করিয়াছে।/আবার আর-একটি গল্প আছে, রত্নাকরের কাহিনী। সে আর-এক ভাবের কথা। রামায়ণের কাব্য প্রকৃতির আর এক-দিকের সমালোচনা। এই গল্প রামায়ণের রামচরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে। এই গল্পে বলিতেছে, রামসীতার বিচ্ছেদদুঃখের অপরিসীম করুণাই যে রামায়ণের প্রধান অবলম্বন তাহা নহে, রামচরিত্রের প্রতি ভক্তিই ইহার মূল। দস্যুকে কবি করিয়া তুলিয়াছে রামের এমন চরিত্র, ভক্তির এমন প্রবলতা! রামায়ণের রাম যে ভারতবর্ষের চক্ষে কতবড়ো হইয়া দেখা দিয়াছেন এই গল্পে যেন তাহা মাপিয়া দিতেছে।…/এই গল্পগুলি জনগণ কবির জীবন হইতে সংগ্রহ করে নাই, তাঁহার কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। কবির জীবন হইতে যে-সকল তথ্য পাওয়া যাইতে পারিত কবির কাব্যের সহিত তাহার কোনো গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ থাকিত না। বাল্মীকির প্রাত্যহিক কথাবার্তা-কাজকর্ম কখনোই তাঁহার রামায়ণের সহিত তুলনীয় হইতে পারিত না। কারণ, সেই-সকল ব্যাপার সাময়িক, অনিত্য ; রামায়ণ তাঁহার অন্তর্গত নিত্য-প্রকৃতির—সমগ্র প্রকৃতির—সৃষ্টি, তাহা একটি অনির্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ, তাহা অন্যান্য কাজকর্মের মতো ক্ষণিকবিক্ষোভজনিত নহে।'[৪৩]

রত্নাকর দস্যুর ঋষিত্ব লাভের কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে নেই, আছে অধ্যাত্ম রামায়ণে। রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাস থেকে এ-কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হন।

প্রাপ্তি নয়, ভোগ নয়, ত্যাগ ও বৈরাগ্যেই জীবনের মহত্ত্বের প্রকাশ। রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে যে এ-কথাটাই বিশেষভাবে ধ্বনিত হয়েছে, সে-কথা সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ আর একবার উল্লেখ করলেন ১৩০৮ বঙ্গাব্দে লেখা 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে—'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত।

কাব্যগ্রন্থের সপ্তম ভাগে 'শিশু' প্রকাশিত হল ২ আশ্বিন ১৩১০। একেবারে শিশুদের মনেও রাম-লক্ষ্মণ ও সীতাকে পৌঁছে দিতে আগ্রহী রবীন্দ্রনাথ। রামায়ণের ভ্রাতৃপ্রেমের ব্যাকুলতা 'বনবাস' কবিতাটিতে কী গভীরভাবে প্রকাশিত! সাত স্তবকের কবিতায় সাতবারই শিশুটি বলছে—'লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার থাকত সাথে সাথে'। রামায়ণ কাব্যরসে সঞ্জীবিত ভারতের মানুষ এই ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী ; আর তাই বাঙালীর কাছে এ-ছত্র পুনঃপুনঃ উচ্চারণে প্রবাদে পরিণত।

দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ ১৩১০-এর ৫ পৌষ। 'রামায়ণ' শিরোনামে প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের এটি প্রথম প্রবন্ধ।[৪৪]

বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রামায়ণ-মহাভারতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে। এই দুই মহাকাব্যকে তিনি বৃহত্তর অর্থে ইতিহাস বলে অভিহিত করতে চান। সে ইতিহাস ভারত ভূখণ্ডের ঘটনাবলীর ইতিহাস নয়, তা হল ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। ভারতবর্ষের যাহা কিছু সাধনা, আরাধনা, সংকল্প—তারই ইতিহাস এই মহাকাব্যের মধ্যে বিধৃত।

রামায়ণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শাশ্বত ভারতবর্ষের অনুসন্ধান করেছেন। 'রামায়ণে ভারতবর্ষ কী বলিতেছে, রামায়ণে ভারতবর্ষ কোন্ আদর্শকে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে' তারই বিচার করতে চেয়েছেন এই প্রবন্ধে।

বীররসপ্রধান কাব্যকে এপিক বলা হলেও, রবীন্দ্রনাথের মতে রামায়ণে যে-রস সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছে তা বীররস নয়। সে কাব্যে বাহুবলের গৌরব ঘোষিত হয়নি—যুদ্ধ ঘটনাই তার বর্ণনার মুখ্য বিষয় নয়।

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় যে কথা বলেছেন, এখানেও গদ্যে তারই পুনরাবৃত্তি। রামায়ণ নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নয়। 'রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।'

রামায়ণ কাব্যের মহিমা রামরাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করে নেই—সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্য। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে রামায়ণের মধ্যে তা-ই প্রদর্শিত হয়েছে। বাহুবল নয়, জিগীষা নয়, রাষ্ট্রগৌরব নয়, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে তাকে সুমহৎ বীর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অন্যদেশী সমালোচক তাঁদের কাব্যবিচারের আদর্শ অনুসারে রামায়ণ কাহিনী ও তার চরিত্রাবলীকে অতিপ্রাকৃত বলে উল্লেখ করতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষ রামায়ণের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আতিশয্য দেখেনি। রামায়ণে ভারতবর্ষ যা চায় তাই পেয়েছে। তাই রামায়ণ ভারতবর্ষের আপামরসাধারণের নিকট কেবল ধর্মশাস্ত্র মাত্র নয়—তা কাব্য—তা হৃদয়ের সামগ্রী।

সাহিত্যতত্ত্বমূলক আলোচনায় রামায়ণের প্রসঙ্গ নানা সূত্রে এসেছে রবীন্দ্রনাথের লেখায়। এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সৌন্দর্যবোধ' (১৩১৩ পৌষ), 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' (১৩১৪ বৈশাখ) এবং 'সাহিত্যসৃষ্টি' (১৩১৪ আষাঢ়) প্রবন্ধ তিনটির নামোল্লেখ করা যায়।

'প্রবাসী'তে ১৩১৯ বৈশাখে লিখলেন দীর্ঘ প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা', বর্তমানে 'পরিচয়' গ্রন্থের অন্তর্গত। রামায়ণ-কাহিনীর উৎস ও বিবর্তন ধারার মধ্যে ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস কিভাবে ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যসৃষ্টি' ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধ-দুটিতে তার কিছু পরিচয় দিয়েছেন।

রামায়ণ কাহিনীর মূলে আছে প্রাচীন আর্য-ইতিহাসের তিনটি বৃহৎ বৈপ্লবিক

ঘটনার প্রেরণা।

আর্যরা প্রথমে ছিলেন প্রধানত মৃগয়াজীবী ও গোধন-পরায়ণ। আর্যদের রাজ্যবিস্তার ও প্রভাববিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজারা ক্রমে হয়ে ওঠেন কৃষিনির্ভর। এই রাজ্যবিস্তার কৃষিবিস্তারের ফলেই তাঁদের সঙ্গে রাক্ষসজাতীয় অনার্যদের সংঘাত ঘটে। কৃষিবিস্তারের ফলে আর্য-অনার্যের যে সংঘাত, সেটাই হল রামায়ণের অন্যতম মূল কথা। এটিই হল রামায়ণের রূপকার্থে প্রকৃত তাৎপর্য। কৃষিসভ্যতার প্রতীক হলেন সীতা রাম ও লক্ষ্মণ, বিশ্বামিত্র ও জনক হলেন তাঁদের প্রবর্তক ও সহায়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বামিত্রের প্রবর্তনার ফলে রাম-সীতা মিলন, অহল্যা-উদ্ধার ও রাক্ষস-সংঘাতের সূত্রপাত।

রামায়ণের দ্বিতীয় বৃহৎ ঘটনা হল কৃষিবিস্তারের শত্রু রাক্ষস-শক্তির পরাভব সাধন। আর্যরা প্রথমে পূর্বভারতে ও দক্ষিণভারতে অনার্যশক্তিকে প্রতিহত করে কৃষিনির্ভর নবসভ্যতার বিস্তার ঘটান। এই সংঘাতের মূলে শুধু সভ্যতা নয়, ধর্মেরও বিরোধ ছিল। শিবোপাসক রাক্ষসদের শৈবশক্তির প্রতীক হরধনু। রামচন্দ্র কর্তৃক রাক্ষসশক্তিকে যে পরাভূত করা সম্ভব—হরধনু ভঙ্গের মধ্য দিয়ে সে-কথাই ইঙ্গিতিত। আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বের পরিণামে আর্যরাই জয়ী হয়। স্বীয় কৃষিসভ্যতাকে আর্যরা অনার্যশক্তির হাত থেকে রক্ষা করেন এবং অনার্য শৈবধর্মের উপরে আর্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। বলে নেওয়া ভাল, পরবর্তী কালে আর্য-অনার্যে বিরোধ মিটে গেলে শুধু যে দুই সভ্যতার সমন্বয় ঘটে তাই নয়, দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ঘটে যায়।

আদি রামায়ণ কাহিনীর তৃতীয় বৃহৎ ঘটনা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ ও ক্ষত্রিয়ের জয়লাভ। এই বিরোধের মূলে শুধু বৃত্তিগত স্বার্থভেদ নয়, ধর্মগত মতভেদও সক্রিয় ছিল। ব্রাহ্মণদের লক্ষ্য ছিল বেদবিহিত যজ্ঞের দেবতা ব্রহ্মার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, কিন্তু ক্ষত্রিয়রা বেদ ও যজ্ঞের দেবতা ব্রহ্মার প্রাধান্য না মেনে মানলেন বিশ্বের পালনকর্তা বিষ্ণুকে। রামকাহিনীর মূলেও ছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধ, যা ক্রমে ক্ষত্রিয়দের গৃহবিবাদে এসে দেখা দেয়। এই বিরোধের পরিণামেই একান্ত বাধ্য হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দশরথ তাঁর প্রিয় বীরপুত্র রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাতে বাধ্য হন।

'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রামায়ণচর্চা অন্য মাত্রা ও স্বতন্ত্র গুরুত্ব লাভ করেছে।

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরেই 'জীবনস্মৃতি' (১৩১৯) গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। এই স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে তাঁর শৈশবের রামায়ণপাঠের অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেছেন—কখনো কৃত্তিবাস, কখনো বা বাল্মীকি।

'রক্তকরবী' নাটকের প্রথম সংস্করণের (১৩৩৩/১৯২৬) প্রস্তাবনায় দেখি রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের রূপক তাৎপর্য নানাভাবে নির্দেশ করেছেন। 'রক্তকরবী'তে যে তত্ত্ব আছে তার সঙ্গে রয়েছে রামায়ণের তত্ত্বের মিল। রামায়ণ কাহিনীর অন্তর্নিহিত সত্যটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে রূপ দিতে চেয়েছেন। তিনি নিজেও বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে নানা দিক থেকে 'রক্তকরবী'র সাদৃশ্য নির্দেশ করেছেন।

এই 'প্রস্তাবনা'টি কবির একটি 'অভিভাষণ', ১৩৩১ বঙ্গাব্দে লিখিত।

'আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে।...আদিকবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন।... আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে। ...ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগোলিকদের কাছে মতের ঐক্য প্রত্যাশা করা মিছে। স্বর্ণলঙ্কা যে সিংহলে তা নিয়েও আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সে-স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তা-হলে লেজের আগুনে ভস্ম না হয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠত। স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনাস্থলের একটি ডাকনাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী বলে জানে।...কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। তাছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো।...নবদুর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা, না একালের? ...কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারি বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনে রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে।...হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি ; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর, আর-একটিতে শান বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখদুঃখ বিরহমিলন ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা ; মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ এক দিকে ব্যক্তিগত মানুষের, আর এক দিকে শ্রেণীগত মানুষের, রাম ও রাবণ এক দিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আরেকদিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর।' [৪৫]

রামায়ণের সঙ্গে নিজের সৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ আর কখনো এভাবে মিলিয়ে দেখেন নি।

'জাভা যাত্রীর পত্র'-এও দেখি রামায়ণ সম্পর্কে কী গভীর ঔৎসুক্য রবীন্দ্রনাথের। তার পরিচয় আছে গিয়ানয়ার থেকে লেখা ১৯২৭ সালের ১ আগস্টের পত্রে। রামায়ণের পাঠ ও পাঠান্তর বিষয়ে তাঁর কৌতূহল লক্ষ্য করবার মত।

'রামায়ণ-মহাভারতের যে সকল পাঠ এ দেশে প্রচলিত আমাদের দেশের সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ। যে যে স্থানে এদের পাঠান্তর তার সমস্তই যে অশুদ্ধ, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এখানকার রামায়ণে রাম সীতা ভাই-বোন, সেই ভাই-বোনে বিবাহ হয়েছিল। একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল ; তিনি বললেন, তাঁর মতে এই কাহিনীটাই প্রাচীন, পরবর্তী কাল এই কথাটাকে চাপা দিয়েছে।/এই মতটাকে যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় তা হলে রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে মস্ত কয়েকটি মিল দেখতে পাই। দুটি কাহিনীরই মূলে দুটি বিবাহ। দুটি বিবাহই আর্যরীতি-অনুসারে অসংগত। ভাই-বোনে বিবাহ বৌদ্ধ ইতিহাসে কোনো কোনো জায়গায় শোনা যায়, কিন্তু সেটা আমাদের সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অন্য দিকে এক স্ত্রীকে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বিবাহও তেমনি অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয় মিল হচ্ছে দুই বিবাহেরই গোড়ায় অস্ত্র পরীক্ষা, অথচ সেই পরীক্ষা বিবাহযোগ্যতা প্রসঙ্গে নিরর্থক। তৃতীয় মিল হচ্ছে দুটি কন্যাই মানবীগর্ভজাত নয়—সীতা পৃথিবীর কন্যা, হলরেখার মুখে কুড়িয়ে-পাওয়া ; কৃষ্ণা যজ্ঞসম্ভবা। চতুর্থ মিল হচ্ছে উভয়ত্রই প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও স্ত্রীকে নিয়ে বনগমন। পঞ্চম মিল হচ্ছে দুই কাহিনীতেই শত্রুর হাতে স্ত্রীর অবমাননা ও সেই অবমাননার প্রতিশোধ।/সেইজন্যে আমি পূর্বেই অন্যত্র এই মত প্রকাশ করেছি যে, দুটি বিবাহই রূপকমূলক [*] । রামায়ণের রূপকটি খুবই স্পষ্ট। কৃষির হলবিদারণরেখাকে যদি কোনো রূপ দিতেই হয়, তবে তাকে পৃথিবীর কন্যা বলা যেতে পারে। শস্যকে যদি নবদূর্বাদলশ্যাম রাম বলে কল্পনা করা যায় তবে সেই শস্যও তো পৃথিবীর পুত্র। এই রূপক অনুসারে উভয়ে ভাই-বোন, আর পরস্পর পরিণতবন্ধনে আবদ্ধ। /হরধনুভঙ্গের মধ্যেই রামায়ণের মূল অর্থ। বস্তুত সমস্তটাই হরধনুভঙ্গের ব্যাপার—সীতাকে গ্রহণ রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যে। আর্যাবর্তের পূর্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত কৃষিকে বহন করে ক্ষত্রিয়দের যে অভিযান হয়েছিল সে সহজ হয়নি ; তার পিছনে ঘরে-বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত, অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।' [৪৬]

এই চিঠি নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা। তাছাড়াও 'জাভাযাত্রীর পত্রে' প্রতিমা দেবীকে লেখা (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭), অমিয় চক্রবর্তীকে (একই তারিখে), রথীন্দ্রনাথকে (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭), নির্মলকুমারীকে (২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৭) ও মীরা দেবীকে লেখা (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭) চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

---

* এ বিষয়ে প্রথমে আলোকপাত করেন বঙ্কিমচন্দ্র 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধে।

হেমন্তবালা দেবীকে ২০ আষাঢ় ১৩৪১ তারিখে (১৯৩৪) একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

'তোমার কোনো একটি পত্রে জনশ্রুতির কথা লিখেচ যে, আমি সীতার নিন্দে করেচি। এমন অদ্ভুত অপবাদ বাংলা দেশেই সম্ভব। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে সন্দীপ বলে একটা মানুষ খাড়া করেছিলুম, তার চরিত্রে ভদ্রতার আদর্শ নেই। সীতার সম্বন্ধে সে যদি এমন কিছু বলে থাকে যা সীতার পক্ষে সম্মানকর নয়, তাহলে সেটাকে রবীন্দ্রনাথের বাণী বলা মূঢ়তা।' [৪৭]

রামায়ণের প্রক্ষেপ প্রসঙ্গে যে-কথা ১৩০৬-এ 'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধে বলেছিলেন, সেই প্রসঙ্গটাই অন্য সূত্রে অন্য প্রবন্ধে বললেন ১৩৪০ শ্রাবণে লেখা 'সাহিত্যের মাত্রা' শীর্ষক প্রবন্ধে, 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের অন্তর্গত।

'যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত রামায়ণে রামের যে দেখা পাওয়া গেছে সেটাতে চরিত্রই প্রকাশিত।...রামায়ণের কবি কোনো-একটি মতসঙ্গতির লজিক দিয়ে রামেব চরিত্র বানাননি, অর্থাৎ সে চরিত্র স্বভাবের, সে চরিত্র সাহিত্যের, সে চরিত্র ওকালতির নয়। কিন্তু উত্তরকাণ্ড এল বিশেষ কালের বুলি নিয়ে ; কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে মারে তেমনি করে চরিত্রকে দিলে মেরে। সামাজিক প্রয়োজনের গুরুতর তাগিদ এসে পড়ল, অর্থাৎ তখনকার দিনের প্রবলেম্। সে যুগে ব্যবহারের যে আটঘাট বাঁধবার দিন এল তাতে রাবণের ঘরে দীর্ঘকাল বাস করা সত্ত্বেও সীতাকে বিনা প্রতিবাদে ঘরে তুলে নেওয়া আর চলে না। সেটা যে অন্যায় এবং লোকমতকে অগ্রগণ্য করে সীতাকে বনে পাঠানোর এবং অবশেষে তাঁর অগ্নিপরীক্ষার যে প্রয়োজন আছে, সামাজিক সমস্যার এই সমাধান চরিত্রের ঘাড়ে ভূতের মত চেপে বসল। তখনকার সাধারণ শ্রোতা সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব উঁচুদরের সামগ্রী বলেই কবিকে বাহবা দিয়েছে। সেই বাহবার জোরে ওই জোড়াতাড়া খণ্ডটা এখনও মূল রামায়ণের সজীব দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে।' [৪৮]

মূল রামায়ণে সপ্তম কাণ্ডটি ছিল না, গল্পের স্বাভাবিকতার বিচারে রবীন্দ্রনাথ সে-কথাটাই বলতে চেয়েছেন। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত পণ্ডিতমহলেও সমর্থিত। রসের বিচারে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন পাঠের বিচারেও তা স্বীকৃত।

ঢাকা থেকে ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হল নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ আদিকাণ্ড। রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পৌঁছলো সে-বই। তন্ন তন্ন করে পড়লেন পুনর্বার কৃত্তিবাস। বইয়ের মলাটে রয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি মন্তব্য। [৪৯]

১৯৩৭। ১৩৪৪ আষাঢ়। শান্তিনিকেতন। কৃত্তিবাস পড়তে পড়তেই কি ফেলে আসা বালককালের জন্য মন ব্যাকুল হল? লিখলেন কবিতা 'বালক' ; 'ছড়ার ছবি' কাব্যের অন্তর্গত।

'কঙ্কালী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে ;
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।

দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া ;
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া—
মনে মনে ইচ্ছে হত, যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।' [৫০]

বাস্তবের কিশোরী চাটুয্যে কবিতার ছন্দে কঙ্কালী চাটুজ্জেতে পরিণত।

জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে ফিরে গেলেন ছেলেবেলায়। লিখলেন 'ছেলেবেলা'। প্রকাশ ১৯৪০, ১৩৪৭ ভাদ্র।

'বালক'-এর কঙ্কালী চাটুজ্জে এখানে কিশোরী চাটুয্যে। তাছাড়া ব্রজেশ্বরকেও কবি ভোলেননি।

'ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধ্যেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাত কাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুয্যে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল সুর-সমতে তার মুখস্থ। সে হঠাৎ আসন দখল করে কৃত্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হু হু করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালির পালা—ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।' [৫১]

এই কিশোরী চাটুয্যের জীবনে বড়ো একটা আপশোস ছিল। রবীন্দ্রনাথ সে কথা রসিয়ে বলেছেন। 'কিশোরী চাটুয্যের সব চেয়ে বড়ো আপশোস ছিল এই যে দাদাভাই, অর্থাৎ কিনা আমি, এমন গলা নিয়ে পাঁচালির দলে ভর্তি হতে পারলুম না। পারলে দেশে যা-হয় একটা নাম থাকত।' [৫২]

কিশোরী চাটুয্যে বেঁচে থাকলে একালে তাঁর আর এক আপশোস হত। বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রমে পিষ্ট আজকের প্রজন্মে রামায়ণ পাঁচালি শোনার লোক আর কি আছে?

পাদটীকা

১. প্রত্যাবর্তন, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১। (অতঃপর 'র-র' অর্থে শতবার্ষিক সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী বুঝতে হবে)।
২. ঐ।
৩. হিমালয়যাত্রা, জীবনস্মৃতি, র-র ১০, পৃ ৪৫।
৪. দ্রষ্টব্য, দেবকুমার বসু সম্পাদিত বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৬৮।
৫. ঐ, পৃ ৩৬৫।
৬. ঐ, পৃ ৩৬৬।
৭. ছেলেবেলা, র-র ১০, পৃ ১৩৭।
৮. শিক্ষারম্ভ, জীবনস্মৃতি, র-র ১০, পৃ ৮।
৯. ঐ।

১০. ঋজু পাঠ দ্বিতীয় ভাগ থেকে সংগৃহীত ডঃ নিখিলেশ চক্রবর্তীর সৌজন্যে।
১১. ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী, র-র ১৫, পৃ ১০৬।
১২. ঐ, পৃ ১০৭।
১৩. মেঘনাদবধ কাব্য, র-র ১৫, পৃ ১৯৯।
১৪ ঐ।
১৫. ঐ, পৃ ১৩৮।
১৬. ঐ, পৃ ১৪৩।
১৭. ঐ, পৃ ১৪৪।
১৮. ঐ, পৃ ১৪৮।
১৯. ক্ষুদিরাম দাশ, 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য', সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩-৪, পৃ ২২৫।
২০. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৩৫।
২১. দ্রষ্টব্য, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী, পৃ ৫৬১।
২২. রবীন্দ্র-রচনাবলী-ভুক্ত এই অস্বাক্ষরিত রচনাটি যথার্থই রবীন্দ্র রচনা কি না এ বিষয়ে আমার গভীর সংশয় আছে।
২৩. র-র (বিশ্বভারতী) ২৯, পৃ ২৮৪।
২৪. র-র (বিশ্বভারতী) অচলিত সংগ্রহ ২, পৃ ৭৫।
২৫. 'চিঠিপত্র', র-র (শতবার্ষিক সংস্করণ) ১২, পৃ ৬৬১-৬৬২।
২৬. অহল্যার প্রতি কবিতাটির প্রাসঙ্গিক বিস্তারিত আলোচনা আছে ভবতোষ দত্তর 'ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ' বইতে, পৃ ২৪।
২৭ শিক্ষার হেবফের, শিক্ষা, র-র ১১, পৃ ৫৩৭।
২৮. ঐ, পৃ ৫৩৯।
২৯. পুরস্কার, র-র ১, পৃ ৪২৬-৪২৭।
৩০. 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থ, বিশ্বভারতী, গ্রন্থপরিচয়।
৩১. কাব্যের তাৎপর্য, পঞ্চভূত, র-র ১৪, পৃ ৬৭৯।
৩২. কৌতুকহাস্য, পঞ্চভূত, র-র ১৪, পৃ ৬৮৭।
৩৩. কৌতুকহাস্যের মাত্রা, পঞ্চভূত, র-র ১৪, পৃ. ৬৯২।
৩৪. অতিথি, গল্পগুচ্ছ, র-র ৭. পৃ ৩২২।
৩৫. গ্রাম্যসাহিত্য, লোকসাহিত্য, র-র ১৩, পৃ ৭৩৩-৭৩৪।
৩৬. ঐতিহাসিক উপন্যাস, সাহিত্য, র-র ১৩, পৃ ৮১৭।
৩৭. কৃষ্ণচরিত্র, আধুনিক সাহিত্য, র-র ১৩, পৃ ৯৩১।
৩৮. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুবাদিত বাল্মীকি রামায়ণ, ভারবি সংস্করণ, পৃ ৩১।
৩৯. ভাষা ও ছন্দ, র-র ৩, পৃ ৯১৬।
৪০. কাদম্বরীচিত্র, প্রাচীন সাহিত্য, র-র ১৩, পৃ. ৬৬২ (২৯-৩০)।
৪১. ঐ, পৃ ৬৬২ (৩০)।
৪২. কাব্যে উপেক্ষিতা, প্রাচীন সাহিত্য, র-র ১৩, পৃ ৬৬২ (৪০)।
৪৩. কবিজীবনী, সাহিত্য, র-র ১৩, পৃ ৮২২-৮২৩।
৪৪. রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য, র-র ১৩, পৃ ৬৬২ (৩)।
৪৫. প্রস্তাবনা, রক্তকরবী, র-র ১৫, গ্রন্থপরিচয়।
৪৬. জাভা যাত্রীর পত্র, র-র ১০, পৃ ৬২০-৬২১।
৪৭. চিঠিপত্র ৯, পৃ ২৩৯।
৪৮. সাহিত্যের মাত্রা, সাহিত্যের স্বরূপ, র-র ১৪, পৃ ৫১৪-৫১৫।

৪৯. দ্রষ্টব্য, বিশ্বনাথ রায়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পাঠক রবীন্দ্রনাথ, গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ, পৃ ২৭ ; এবং উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বাংলা চর্চা, কবির অধ্যয়ন, পৃ ২১।

৫০. বালক, ছড়ার ছবি, র-র ১০, পৃ ১৩৭।

৫১. ছেলেবেলা, র-র ৩, পৃ ৫১২।

৫২. ঐ।

সহায়ক গ্রন্থ : প্রবোধচন্দ্র সেন—রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি ॥ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুবাদিত বাল্মীকি রামায়ণ ॥ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী—প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার ॥ হরনাথ পাল—রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য ॥ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—ত্রয়ী ॥ সুখময় ভট্টাচার্য—সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ ॥ সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদিপর্ব ॥ বিশ্বনাথ রায়—গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ ॥ মানস মজুমদার—রাম রামায়ণ রবীন্দ্রনাথ ॥ ভবতোষ দত্ত—ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ ॥ গৌরচন্দ্র সাহা—রবীন্দ্র পত্রাবলী : তথ্যপঞ্জী ॥ অনুত্তম ভট্টাচার্য—রবীন্দ্ররচনাভিধান ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী ॥ প্রশান্তকুমার পাল—রবিজীবনী ॥ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার—কবির অনুধ্যান ॥

রবীন্দ্রনাথের অভিধান ভাবনা

১৩০৮ বঙ্গাব্দে লেখা 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ('শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে সঙ্কলিত) রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট উচ্চারণ—'আজ পর্যন্ত বাংলা-অভিধান বাহির হয় নাই।' এই উক্তির পরবর্তী কালে বাংলা ভাষার প্রধান দুটি অভিধান প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে (১৯১৭) ও ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২)। এর প্রথমটি জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' ও দ্বিতীয়টি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। এ-ছাড়াও আরও দুটি সহজে ব্যবহারযোগ্য আয়তনে ছোট নির্ভরযোগ্য অভিধান হল রাজশেখর বসু সংকলিত 'চলন্তিকা'—১৩৩৭ বঙ্গাব্দে (১৯৩১) এবং সাহিত্য সংসদের 'সংসদ বাংলা অভিধান'—১৩৬২ বঙ্গাব্দে (১৯৫৫) প্রকাশিত।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩০৮-এ রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা-অভিধান প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তার অনেক আগে থেকেই তাঁর মনের মধ্যে বাংলা-অভিধানের আদর্শ কাঠামো কী হওয়া উচিত তার একটা খসড়া ছক অবশ্যই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই সময়পর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু লেখালেখি, তাঁর চিন্তা ভাবনা গবেষণা ও সংগ্রহ বাঙালী অভিধান-সংকলকদের অভিধান সংকলনের কাজকে অনেকটা সহায়তা করেছে ; রবীন্দ্রনাথ নিজে বাংলা শব্দকোষ সংকলন না করলেও বলা যায় এই কাজে তিনিই ছিলেন বাঙালীর প্রধান অধিনায়ক। শব্দের অর্থনিরূপণটুকুই যে অভিধান রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তাকে অতিক্রম করেও যে অনেক আকাঙ্ক্ষা ও দাবি থাকে অভিধান-পাঠকের, তারই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ অভিধান প্রস্তুতকারকদের সামনে। বাংলা সাহিত্যে বাংলা শব্দ-সংখ্যা যাঁর কলম দিয়ে সবচেয়ে বেশি নির্গত হয়েছে, তিনি তো রবীন্দ্রনাথ। সহজেই অনুমান করা যায় বা বলাই বাহুল্য, যিনি সারাজীবন শব্দের পর শব্দ গেঁথে সাহিত্যের তাজমহল গড়লেন—তাঁর হাতে অক্স্‌ফোর্ড ডিক্‌শনারির মতো দু-একটা প্রামাণিক আদর্শ বাংলা অভিধানও থাকা প্রয়োজন ছিল বৈকি। দুটো-একটা আদর্শ বাংলা অভিধান প্রস্তুত হোক—এ আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা বোধকরি সেদিন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আর কারও এত বেশি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে যত শব্দ ব্যবহার করেছেন কেবল সেটুকু সংকলন করলেই একটা স্বতন্ত্র শব্দকোষ (রবীন্দ্রশব্দাভিধান) তৈরি হতে পারে। বাংলা শব্দভাণ্ডারের কোন শব্দটি বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যের কোথাও ব্যবহৃত হয়নি, সেটুকু আবিষ্কার করাও এখন দুরূহ গবেষণার কাজ। মানুষের পক্ষে যা কঠিনসাধ্য, যন্ত্রে এখন ক্রমে তা সহজ হচ্ছে।

এইসব কথার মধ্য দিয়ে আমরা এ-কথাটাই বলতে চাইছি যে, নামেমাত্র নয়—

উপযুক্ত একটি বাংলা অভিধান যে বাঙালীর পাঠচর্চা বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যচর্চার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি এবং অত্যাবশ্যক—একথা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন এবং অপর সকলকেও এ-বিষয়ে মনস্ক ও সচেতন করে তুলেছিলেন।

অভিধান ব্যবহারের বুঝি প্রয়োজন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের একেবারে বাল্যকাল থেকেই। মনে হয় বাল্যকালে তিনি ব্যাকরণের প্রতি যতটা না অনুরাগী ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরশীল ছিলেন অভিধানের প্রতি। শৈশবে তিনি যে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাও ছিল মূলত ব্যাকরণনির্ভর নয়। পরবর্তী কালে প্রধানত সেই পদ্ধতিই ছিল জর্মান ভাষা শিক্ষায় ও ফরাসি ভাষা চর্চায়।

কবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে লিখে গিয়েছেন, 'জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাক্‌বেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাঙ্‌লা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল।' বুঝতে অসুবিধা হয় না জ্ঞানচন্দ্র ছাড়া সেই সময় অবশ্যই রবীন্দ্রের জ্ঞানান্বেষণের সবচেয়ে বড় সহায়ক ছিল ডিক্‌শনারি।

তাঁর সতেরো বছর বয়সে বিলাতযাত্রার পূর্বে মাস ছয়েক আমেদাবাদ-বোম্বাইয়ে কাটিয়েছিলেন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। এখানেও দেখি শাহিবাগ প্রাসাদের চূড়ার উপরকার ছোটো নির্জন ঘরটিতে রবীন্দ্রের দিবারাত্রির প্রিয় সঙ্গী ছিল অভিধান।

'ইংরেজিতে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বলিয়া সমস্ত দিন ডিক্‌শনারি লইয়া নানা ইংরেজি বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ার বাধা ঘটিত না। অল্পস্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার মনে একটা-কিছু খাড়া করিয়া আমার বেশ-একরকম চলিয়া যাইত। এই অভ্যাসে ভালো মন্দ দুইপ্রকার ফলই আমি আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি।'

শুধু যে শাহিবাগের দিনগুলিতেই ইংরেজি ডিকশনারি তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিল তাই নয় ; একেবারে বৃদ্ধবয়সে কবির পড়ার টেবিলে ছড়ানো বইপত্রের মধ্যে অক্সফোর্ডের ডিকশনারিটি বিশেষভাবে নজরে পড়ে। শেষ বয়সে নিজের লেখা কবিতার মধ্যে তাঁর সেই আবাল্য সঙ্গীর কথা উল্লেখ করে গেছেন। ১৯৩৮ সালে 'আকাশপ্রদীপ'-এর 'বেজি' কবিতায় তালিকাবদ্ধ হয়েছে কবির পড়ার 'ডেস্কে'তে কী কী বস্তু রয়েছে :

অক্সফোর্ড ডিক্সনারি, পদকল্পতরু,
ইংরেজি মেয়ের লেখা 'সাহারার মরু'
ভ্রমণের বই, ছবি আঁকা,
এগুলোর একপাশে চা রয়েছে ঢাকা

পেয়ালায় মডার্‌ন্ রিভিয়ুতে চাপা।
পড়ে আছে সদ্য ছাপা
প্রুফগুলো কুঁড়েমির উপেক্ষায়।

তবে শুধু অক্‌স্‌ফোর্ড নয়, ওয়েব্‌স্টার ডিকশনারিও নিশ্চয় তাঁর আর এক পুরাতন সঙ্গী। ১২৮৪ আশ্বিন (১৮৭৭) সংখ্যার 'ভারতী'তে কবি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'করুণা'র শুরুতেই কাহিনীর নায়ক নরেন্দ্রের হাতে বৃহদায়তন ওয়েব্‌স্টার ডিকশনারি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রের শৈশবজীবনের কিছু প্রতিবিম্ব নরেন্দ্রের চরিত্রনির্মাণেও লক্ষ্য করা যাবে বৈকি। অভিধান-অনুরাগী নরেন্দ্র ও রবীন্দ্রের বয়সের নৈকট্যও লক্ষণীয়।

মনিয়ের উইলিয়ামস্-এর বিশাল আকারের বিখ্যাত সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানও রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে ছিল এবং তিনি তাঁর প্রয়োজনে সেটি ব্যবহার করতেন। এ-বইয়ে তাঁর মার্জিনাল নোটও আছে।

ব্যাকরণ অভিধান ভাষাতত্ত্বের বই তাঁর প্রিয় পাঠসহচর ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া গেছে Elements of the Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages, Handbook of Pali, Student's Persian and English Dictionary কিংবা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের The Origin and Development of the Bengali Language এর মতো অনেক বই। এ সব বইয়ের বহু পাতা জুড়েই রয়েছে তাঁর মার্জিনাল নোট। শুধু 'শেষের কবিতা'র অমিতেরই যে কেবল সুনীতি চাটুজ্যের ভাষাতত্ত্বের বইটি বড় প্রিয় ছিল তা নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ODBL ও তার গ্রন্থকারের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' বইটি ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের করকমলেই উৎসর্গ করে যান।

এই সুনীতিকুমারই তাঁর ODBL রচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্ব বিষয়ক চিন্তার মৌলীন্যে বিস্মিত ও অভিভূত হন। সত্যি কথা বলতে কী, 'সাধনা' পত্রিকা হাতে নেবার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বাংলা শব্দতত্ত্বচর্চায় উৎসাহী ও উদ্‌যোগী হয়ে ওঠেন তা গভীরভাবে লক্ষ্য করবার মতো। তবে তারও পূর্বে ঠাকুরবাড়ির 'বালক' পত্রিকাতেই এ-বিষয়ে তাঁর লেখালেখির সূচনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলেত গিয়েছিলেন ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ; বাংলা ভাষাকে তিনি ব্যাকরণের চোখে অভিধানের চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করলেন সেই তখন থেকে একটি বিশেষ উপলক্ষের সূত্রে। সে-কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গেছেন 'বালক' পত্রিকায় মুদ্রিত (১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক) 'বাঙ্গালা উচ্চারণ' প্রবন্ধে। এখানে বলে রাখা ভালো বিলেত যাবার সময়ও সঙ্গে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন 'খানদুই বাংলা অভিধান'ও। ইংল্যান্ডে বসে সেই বাংলা অভিধান খুবই তাঁর কাজে লেগেছিল। তরুণ রবীন্দ্রের কাছে বাংলা ভাষা শিখতে একান্তই আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন তাঁর এক ইংরেজ বান্ধবী। সেই তরুণী মেমসাহেবটিকে বাংলা ভাষা শেখাতে গিয়ে মাতৃভাষার রাজপথে কোথায় ভাঙাচোরা খানাখন্দ গণ্ডগোল রয়েছে তা প্রথম প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলেন তিনি। বাংলা ভাষার

উচ্চারণে বানানে ব্যাকরণে পদেপদে যে এত বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম—এ-বিষয়টি ইতিপূর্বে কবির কখনো তেমনভাবে নজরে পড়েনি ; এবং এই কথাটির তাৎপর্য হল বাংলা ভাষার নানা স্তরে এত যে অসংগতি ও অনিয়ম—এ-নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এমন তীক্ষ্ণভাবে সুনির্দিষ্টভাবে অর্থবহভাবে কেউ কখনো ভাবেনওনি। বাংলা ভাষার শৃঙ্খলা নিরূপণের যে উদ্‌যোগ তাঁর দ্বারা শুরু হয়েছিল তাঁর সতেরো বছর বয়সে, সাতাত্তর বছর বয়সেও তা অব্যাহত থাকে, যখন দেখি ১৯৩৮-এ প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর লেখা বাংলা ভাষাতত্ত্বের বই 'বাংলাভাষা-পরিচয়'।

জীবনের পঞ্চাশ বছরে পৌঁছেও কবি ভোলেননি সতেরো বছর বয়সে বিলেতে তাঁর নিজের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দুখানি বাংলা অভিধানের কথা আর বাংলাভাষা পরিচয়ে আগ্রহী সেই ইংরেজ বালিকাটির কথা।

'পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল আমাদের বাংলা-অক্ষর উচ্চারণে কোনো গোলযোগ নাই। কেবল তিনটে স, দুটো ন ও দুটো জ শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। এই তিনটে স-এর হাত এড়াইবার জন্যই পরীক্ষার পূর্বে পণ্ডিতমশায় ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, "দেখো বাপু, সুশীতল সমীরণ লিখতে যদি ভাবনা উপস্থিত হয় তো লিখে দিয়ো ঠাণ্ডা হাওয়া।" এছাড়া দুটো ব-এর মধ্যে একটা ব কোনো কাজে লাগে না। ঋ ৯ঙঞ-গুলো কেবল সং সাজিয়ে আছে। চেহারা দেখিলে হাসি আসে, কিন্তু মুখস্থ করিবার সময় শিশুদের বিপরীত ভাবোদয় হয়। সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় দীর্ঘহ্রস্ব স্বর। কিন্তু বর্ণমালার মধ্যে যতই গোলযোগ থাক্ না কেন, আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কোনো অনিয়ম নাই, এইরূপ আমার ধারণা ছিল।

'ইংলন্ডে থাকিতে আমার একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার সময় আমার চৈতন্য হইল, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সমূলক নয়।

'এ বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বাংলা দেশের নানাস্থানে নানাপ্রকার উচ্চারণের ভঙ্গী আছে। কলিকাতা-অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার।

'হরি শব্দে আমরা হ যেরূপ উচ্চারণ করি, হর শব্দে হ সেরূপ উচ্চারিত করি না। দেখা শব্দের এ-কার একরূপ এবং দেখি শব্দের একার আর-একরূপ। পবন শব্দের প অকারান্ত, ব ওকারান্ত, ন হসন্ত শব্দ। শ্বাস শব্দের শ্ব-র উচ্চারণ বিশুদ্ধ শ-এর মতো, কিন্তু বিশ্বাস শব্দের শ্ব-এর উচ্চারণ শ্‌শ-এর ন্যায়। 'ব্যয়' লিখি কিন্তু পড়ি—ব্যায়। অথচ অব্যয় শব্দে ব্য-এর উচ্চারণ ব্ব-এর মতো। আমরা লিখি গর্দভ, পড়ি—গর্দোব। লিখি 'সহ্য', পড়ি—সোজ্‌ঝো। এমন কত লিখিব।...

'বাংলাভাষায় এইরূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়িল, তখন আমার জানিতে কৌতূহল হইল, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কিনা। আমার কাছে তখন খান দুই বাংলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিতে

লাগিলাম। যখন আমার খাতায় অনেকগুলি উদাহরণ সঞ্চিত হইল, তখন তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।'

রবীন্দ্রনাথের অভিধানচর্চার শুরু এই সময় থেকেই—ইংল্যান্ডে। ধন্যবাদ সেই ইংরেজ-কন্যাটিকে, যার জন্যই এই কাজে মন দিতে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়েছিলেন। হতে পারে আমরা এখন ব্যাকরণ অভিধান নিয়ে গুরুগম্ভীর ভাবনা-চিন্তা করছি, কিন্তু তা বলে কি আমাদের জানতে কৌতূহল হবে না কে সেই তরুণী বঙ্গভাষানুরাগিণী বিদেশিনী বন্ধু যিনি কবির কাছে বাংলাভাষা শিখতে শুরু করেছিলেন। কবি এই তরুণীটির পরিচয় 'বালক' পত্রিকায় দেননি, 'শব্দতত্ত্ব' বই হয়ে বেরলো যখন তখনও জানাননি। পাঠকদের শুধু কেবল, তাঁর 'একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার' কথাটুকু উল্লেখ করেছিলেন। এই 'বন্ধু' যে একজন ইংরেজ ললনা তা রবীন্দ্রনাথ জানালেন আরও পরে তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'লোকেন পালিত' অধ্যায়ে।

'আমাদের [লোকেন-রবি] অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বাংলা শব্দতত্ত্বের একটা আলোচনা ছিল। তাহার উৎপত্তির কারণটা এই। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধর্মজ্ঞান আছে, পদে পদে নিয়ম লংঘন করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, ইংরেজি বানানরীতির অসংযম নিতান্তই হাস্যকর, কেবল তাহা মুখস্থ করিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা দিতে হয় বলিয়াই সেটা এমন শোকাবহ। কিন্তু আমার গর্ব টিকিল না। দেখিলাম, বাংলা বানানও বাঁধন মানে না ; তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়ম-ব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইউনিভারসিটি কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম। লোকেন এই বিষয়ে আমাকে যে-সাহায্য করিত তাহাতে আমার বিস্ময় বোধ হইত।'

ডাক্তার স্কটের তিন কন্যার মধ্যে ছোট দুইজনই ভারতবর্ষীয় এই তরুণ অতিথির প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। এই দুয়েরই একজন বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করে কবির কাছে সেই বিদেশী ভাষা শিখতে যথেষ্ট মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। ছাত্রীকে ভাষা শিক্ষাদানে কবি যে কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নি তা তাঁর সেই সময়কার পরিশ্রমসাধ্য হোমওয়ার্ক থেকেই সুস্পষ্ট ঠাহর হয়। বিলেতে যদি রবীন্দ্রনাথ আর কিছুদিন থাকতেন তো লন্ডন ইউনিভারসিটি কলেজের লাইব্রেরি কক্ষে বসে ওই তরুণ বয়সেই তিনি একখানা বড়োসড়ো বাংলা উচ্চারণকোষ প্রস্তুত করে ফেলতে পারতেন। তাহলে বাংলা অভিধান সংকলনের ইতিহাসেও তাঁর নামটি চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে থাকত।

অনেক পরবর্তী কালে এক আলাপচারিতে রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন, 'আমি বিলেতে প্রথমে যে ডাক্তার পরিবারে অতিথি হয়ে ছিলাম তাঁর দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালোবাসত একথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপ্‌সা নেই—কিন্তু তখন যদি ছাই সেকথা বিশ্বাস করবার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকত।'

যাই হোক পিতার নির্দেশে লন্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে পাঠ অসম্পূর্ণ রেখেই রবীন্দ্রকে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। অসমাপ্ত থেকে যায় তাঁর বাংলা উচ্চারণ সংক্রান্ত অনুসন্ধানী গবেষণাও। অজস্র উদাহরণ সংগ্রহ করে খাতার পাতা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। বাংলা উচ্চারণের অনিয়মের মধ্যে নিয়ম আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। 'এই সকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পুরিয়া গিয়াছিল।'

কিন্তু কাজ শেষ করার অবসর না পেয়েই ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে আসতে হল। সঙ্গে নিয়ে এলেন 'ভগ্নহৃদয়' পাণ্ডুলিপি।

বিলেতে যে কাজ অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসতে হয়েছিল, দেশে ফিরে সেই কাজে ক্রমে ক্রমে আবার হাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বালক'-এ যার সূচনা, বার্ধক্যেও তা থেকে তিনি সরে আসেননি।

বাংলা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথকে সুনীতিকুমার 'একজন পাইওনিয়র বা অগ্রণী পথিকৃৎ' বলে উল্লেখ করে গেছেন। এবং শব্দতত্ত্বচর্চায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার অসামান্যতা সুনীতিকুমার তাঁর ODBL গ্রন্থের (১৯২৬) ভূমিকায় সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন।

'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যে প্রথম বাঙালী মনীষী ভাষা সমস্যার দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ। ভাষাতত্ত্বের অনুরাগীদের কাছে শ্লাঘার বিষয় যে, ইনি একদিকে বাংলাভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি ও দ্রষ্টা ; অন্যদিকে একজন তীক্ষ্ণধী ভাষাতাত্ত্বিক, যিনি ভাষারহস্যের সত্য সন্ধানে প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান এবং আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের বিচারপদ্ধতি ও আবিষ্কারসমূহের গুণগ্রাহী। বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান, বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ (onomatopoetics), বাংলা বিশেষ্য পদ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর রবীন্দ্রনাথের গবেষণা কয়েকটি প্রবন্ধের আকারে (বর্তমানে একটি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট) বাহির হয়—এদের প্রথমটির আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং মাত্র কয়েক বৎসর আগে আরো কতকগুলি নূতন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলি বাঙালীর কাছে তার ভাষা সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ নির্দেশ করে দিয়েছে বলা যেতে পারে।' (এই অনুবাদ সুনীতিকুমারের নিজের)।

সুনীতিবাবুর এই বই প্রস্তুত করতে সময় লেগেছিল বারো বছর। অর্থাৎ ১৯১৪ নাগাদ কাজ শুরু করেন। এরই পাঁচ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' বই প্রকাশিত হয়েছে, যার রচনাগুলি তার পূর্বেই 'বালক' 'সাধনা' 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। শুধু সুনীতিবাবুই নন, রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাদি পড়ে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন তিন বাংলা অভিধান প্রস্তুতকারক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু। বাংলা অভিধান শাখাটি আজ যে সমৃদ্ধ স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে প্রচ্ছন্নভাবে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি রবীন্দ্রনাথ। পূর্বেই বলেছি কেবল শব্দাবলীর সংকলন ও তার অর্থনিরূপণ অভিধানকর্তার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। সুতরাং বাংলা ব্যাকরণে অপণ্ডিত কোনো ব্যক্তির পক্ষে বাংলা অভিধান প্রস্তুত করা অসম্ভব। ১৮৮৫ সালেই বাঙালী বিদ্বৎসমাজকে সতর্ক ও

সচেতন করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—'প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়। বাংলা ব্যাকরণের অভাব আছে, ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।' আর এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ হিসেবে যে শ্রম স্বীকার করেছেন তার কোনো তুলনা হয় না। কোনো একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য 'দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, হ্যর্নলে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, কেলগ সাহেবের হিন্দি ব্যাকরণ, গ্রিয়র্সন সাহেবেব মৈথিলী ব্যাকরণ এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামি ব্যাকরণ' তিনি অবলম্বন করেছিলেন। ১৮৯৮-এ লেখা প্রবন্ধটির নাম 'বাংলা বহুবচন'। ওই বছরেই রবীন্দ্রনাথ আর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন—'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ'। লন্ডন থেকে ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত জন বীম্‌সের বইয়ের নাম 'A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India'।

সংস্কৃত ব্যাকরণবিধির শাসন থেকে বাংলা ব্যাকরণকে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সন্ধানে কবির তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শুধু বাংলা বহুবচন নয়, সম্বন্ধ পদ, উপসর্গ, শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, কৃৎ এবং তদ্ধিত ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গভীর অনুসন্ধানী গবেষণা ও তার তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা এ-বিষয়ে আমাদের চিন্তার সরণীতে মৌলিক আলোকসম্পাত করেছে।

প্রতিশব্দ নির্মাণ ও সংকলনের কাজটিও রবীন্দ্রনাথের আর এক মস্ত আভিধানিক কীর্তি। ইদানীং সব বাংলা অভিধানের পরিশিষ্টে পারিভাষিক শব্দাবলী সংযোজিত হতে দেখি। ইংরেজি শব্দের বঙ্গানুবাদের এই কাজে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাই ছিল সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০-এ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তিনি ইংরেজি শব্দের বাংলা অনুবাদের এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করেন. এই তালিকার বাইরেও সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য জুড়ে বহু সংখ্যক ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব প্রতিশব্দের অনেকগুলিই কবির নিজের সৃষ্টি।

বানান, অভিধানের ক্ষেত্রে এক জরুরি বিষয়। সেই বানান নিয়ে দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ নিজে ভেবেছেন, অন্যকেও ভাবিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা পত্রিকায় কবি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর লেখা 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা' 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে বাংলা বানানের নিয়ম রচিত হয় তারও মুখ্য অভিভাবকত্বে ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথই। তাঁরই প্রস্তাবে এবং প্রেরণায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানবিধি নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। সেই নিয়মবিধিই আধুনিককালের সকল বাংলা অভিধান মেনে চলেছে এবং অভিধানের পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত নিয়মধারা ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রজন্মের পাঠক প্রচলিত বাংলা অভিধানের পরিশিষ্টে সংযোজিত বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়ম পাঠ করছেন ; কিন্তু সেই নিয়ম রচনা ও প্রবর্তনার পিছনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যে এক মহান

ভূমিকা আছে তার কথা কয়জন জানেন? এ-বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যাবে বিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও বানানবিধির গোড়ার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে।

অভিধান থেকে পাঠক প্রধানত কী খোঁজে? সে জানতে চায় প্রথমত শব্দের মানে এবং দ্বিতীয়ত শব্দের বানান। আধুনিক বাংলা অভিধানে সেই বানান বিধিনির্দিষ্ট হয়েছে বস্তুতপক্ষে রীবন্দ্রনাথের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং প্রযত্নে, তাঁর সক্রিয় হস্তক্ষেপণে। বাংলা বানানের একটি নিয়মবিধি কিভাবে প্রস্তুত করা যায় সেই গবেষণা কাজের দায়িত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকেই দিয়েছিলেন ; পরে তা বানান-সমিতির উপর ন্যস্ত হয়। এ-বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের লেখা প্রবন্ধটি থেকে উদ্ধৃত করছি।

'[১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানায়।] রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই যে তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের হিতার্থে কয়েকটি ভাষণ দিবেন এবং বাংলা ভাষার অধ্যয়ন ও গবেষণা কর্মে উন্নতি সাধনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা করিবেন।...

'গবেষণা প্রসঙ্গে কবি নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, বাংলা বানানে যে বিশৃঙ্খলা চলিতেছে তাহার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করা আবশ্যক এবং এ-জাতীয় কাজের ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই গ্রহণ করা উচিত। বাংলায় বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা রচনা ও সংকলনের আবশ্যকতার কথাও তিনি উত্থাপন করেন।

'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখনও উপাচার্য হন নাই কিন্তু কার্যত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহারই হাতে। রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব তিনি অনুমোদন করিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকেই এই কাজের জন্য একটা প্রাথমিক পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

'কবি সে দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলে তাঁহারই কাছে থাকিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষণা সহায়কের (Research Assistant) পদ সৃষ্ট হইল। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে বর্তমান লেখক সেই পদে নিযুক্ত হইলেন। কবির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিভাষা সঙ্কলন এবং বানান সংস্কারের কাজ চলিল। ১৯৩৪-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে রবীন্দ্রনাথের কার্যকাল শেষ হইলে শান্তিনিকেতনে পরিভাষা ও বানানের কাজও একরকম বন্ধ হইল।

'ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষার কাজ ত্বরান্বিত করিবার জন্য রাজশেখর বসুকে সভাপতি এবং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনেই একটি সমিতি স্থাপন করিলেন। বর্তমান লেখকও ১৯৩৪ সালে শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কেন্দ্রীয় পরিভাষা সমিতির অন্যতম সদস্যরূপে যোগ দিলেন।'

১৯৩৫-এ গঠিত হয় বানান সংস্কার সমিতি। এই সমিতির সদস্যরা হলেন—

রাজশেখর বসু (সভাপতি), চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (সম্পাদক), প্রমথ চৌধুরী, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার ভূমিকায় তৎকালীন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ লেখেন, 'কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। গত নভেম্বর (১৯৩৫) মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠিত করেন।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আজ প্রতিটি বাংলা অভিধানের পরিশিষ্টে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ও প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়ম পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে, সেই উদ্যোগ ও কর্মযজ্ঞের মূলে ছিলেন কোন্ মানুষটি তা আমাদের কাছে এতক্ষণে নিশ্চয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

বাংলা বানান, সংস্কার সমিতি ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এই সূত্রে একদিনের একটি কাহিনী বলি। বিবরণটি হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি রচনা থেকে গৃহীত।

'...রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে সাহিত্য সম্পর্কে কিছু শোনার আগ্রহ ছিল। কিন্তু বাধা পড়ল সুনীতিবাবু, চারুবাবু ও বিজন ভট্টাচার্যের আগমনে।

'তারপর কি খবর?' রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন।

'বানান পরিষদের দায়িত্ব পড়েছে ঘাড়ে। তাই বাংলা বানান সম্বন্ধে আপনার কিছু মতামত দরকার'—বলে নিজেকে একটু এগিয়ে দিলেন সুনীতিবাবু। 'আপনার মতামত ছাড়া কি বাংলা ভাষার কোনো পরিবর্তন করা চলে! বিশেষ করে আমাদের যুগে যখন আপনাকে পেয়েছি।' বলে সুনীতিবাবু বানানের কথা পাড়লেন। 'কতকগুলো শব্দের মৌলিক রূপটা বজায় রাখবার জন্য চলতি বানান কিছু কিছু পরিবর্তন করতে চাইছি।'

'যথা?' রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

সুনীতিবাবু বললেন, 'যেমন গরু। আমরা বানান লিখি গরু। কিন্তু আমার মনে হয় শব্দটা গো-রূপ থেকে এসেছে। সুতরাং বানানটা গরু না হয়ে গোরু হলেই ভাল হয়।'

'হ্যাঁ। অন্তত কলেবর বৃদ্ধি হয়। গাইগুলো দিন দিন যেমন ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, কলেবর বাড়ানো ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে দুধ বাড়াবার সম্ভাবনা আছে কি?' রবীন্দ্রনাথ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখ তুলে চাইলেন। কারো পক্ষেই হাসি সংবরণ করা সম্ভব হল না।

১৯৩৬-এ 'বাংলা বানানের নিয়ম' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পাঁচ মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়। এই সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে এই অনুমোদন-পত্রটি মুদ্রিত হয়—

'বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১সেপ্টেম্বর ১৯৩৬।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বানানের নিয়ম নির্দিষ্ট হবার পূর্বেই ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে (১৯৩১) রাজশেখর বসুর অভিধান 'চলন্তিকা' ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২) প্রকাশিত হয়।

প্রকাশকাল যাই হোক হরিচরণ তাঁর বিশাল আয়তন অভিধানের কাজ শুরু করেছিলেন বই বেরবার ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে থেকে। এই শব্দকোষের জন্য শব্দসংগ্রহের কাজই তিনি সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন ১৩১৪ বঙ্গাব্দে (১৯০৭)। অপরদিকে 'চলন্তিকা' ছোট আকারের বই—সহজে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য অভিধান। 'বাংলাভাষায় একটি ছোট অভিধানের দরকার আছে—যাহা সহজে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় অথচ যাহাতে মোটামুটি কাজ চলে'—এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা' সংকলন করেছিলেন।

আমরা জানি ১৩২৪-এ (১৯১৭) জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান বের হয়। আরও জানি ১৩০৮-এ (১৯০১) 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আজ পর্যন্ত বাংলা অভিধান বাহির হয় নাই।' এই রবীন্দ্রনাথই আদর্শ বাংলা অভিধানের অভাব অনুভব করে ১৩১২ বঙ্গাব্দে (১৯০৫) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একখানি বাংলা অভিধান প্রণয়ন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

১৩৩৯ আশ্বিন ১০ তারিখে (১৯৩২) লেখা শব্দকোষের ভূমিকার প্রথম অনুচ্ছেদেই সংকলক হরিচরণ সে-কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে 'অভিধান বিষয়ে আমার বক্তব্য' শুরু করেন। হরিচরণ লিখেছেন—

'প্রায় সাতাশ বৎসর পূর্বে—যখন এই বিশ্বভারতীর শৈশবাবস্থা—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, সেই সময়ে একদিন কথাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ কবিবর আমাকে বাঙ্‌লাভাষার একখানি অভিধান-প্রণয়নের কথা বলিয়াছিলেন। তখন আশ্রমের বিদ্যার্থিগণের পাঠের কোন সংস্কৃত পুস্তক ছিল না ; কবিবরের নির্দেশানুসারে 'সংস্কৃত-প্রবেশ' রচনা করিতেছিলাম। সুতরাং, তখনই তাঁহার কথানুসারে অভিধানের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। 'সংস্কৃত প্রবেশ'-রচনা ক্রমে ক্রমে তিন খণ্ডে সমাপ্ত হইলে, আমি একদিন কবিবরের নিকটে পূর্বপ্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া, অভিধান-সংকলনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম ; তিনিও আমার ইচ্ছানুসারে আনন্দের সহিত তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অনুমতি দিলেন। সেই দিন হইতেই আমি তদীয় অনুমতিক্রমে অভিধান-রচনায় নিরত হইলাম। অভিধান-প্রণয়নের ইহাই মূল কারণ। সে অনেক দিন পূর্বেরই কথা, তখন ১৩১২ সাল।'

ওই সাতাশ বছরের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান বেরিয়ে যায়, 'চলন্তিকা'ও মুদ্রিত হয় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রকাশের বছর খানেক আগে। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হরিচরণের অভিধানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২-এ, শেষ খণ্ড ১৯৫২-তে। প্রায় অর্ধশতবর্ষের সাধনার ফসল 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'।

যাই হোক, রাজশেখর বসু সংকলিত অভিধান 'চলন্তিকা' প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে পত্রে তাঁকে অভিনন্দন

জানান। এই পত্রেও বাংলা অভিধান সম্পর্কে কবির সচেতন ভাবনার পরিচয় রয়েছে। পত্রটি এই—

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন শান্তিনিকেতন

এতদিন পবে বাঙ্‌লা ভাষাব অভিধান পাওয়া গেল। পরিশিষ্টে চলন্তিকায় বাঙ্‌লার যে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ দিয়েচেন তাও অপূর্ব হয়েচে।

প্রাকৃত বাংলার বানান সম্বন্ধে আমার একটা বক্তব্য আছে। ইংরেজি ভাষার লিখিত শব্দগুলি তাদের ইতিহাসের খোলস ছাডতে চায় না—তাতে করে তাদের ধ্বনিরূপ আচ্ছন্ন। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাকৃত এ পথের অনুসরণ করেনি। তার বানানের মধ্যে অবঞ্চনা আছে, সে যে প্রাকৃত, এ পরিচয় সে গোপন কবেনি। বাংলা ভাষায় ষত্বণত্বের বৈচিত্র্য ধ্বনিব মধ্যে নেই বললেই হয। সেই কাবণে প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পুঁথিতে লোকভাষা লেখবার সময় দীর্ঘহ্রস্ব ও ষত্বণত্বকে সরল করে এনেছিলেন। তাঁদের ভয় ছিল না পাছে সেজন্য তাঁদের কেউ মূর্খ অপবাদ দেয়। আজ আমরা ভারতের রীতি ত্যাগ করে বিদেশীর অনুকরণে বানানের বিড়ম্বনায় শিশুদের চিত্তকে অনাবশ্যক ভারগ্রস্ত করতে বসেচি।

ভেবে দেখলে বাঙ্‌লা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একেবারেই নেই। যাকে তৎসম শব্দ বলি উচ্চাবণের বিকাবে তাও অপভ্রংশ পদবীতে পড়ে। সংস্কৃত নিয়মে লিখি সত্য কিন্তু বলি শোত্তো। মন শব্দ যে কেবল বিসর্গ বিসর্জন করেচে তা নয় তার ধ্বনিরূপ বদলে সে হযেছে মোন্। এই যুক্তি অনুসাবে বাংলা বানানকে আগাগোড়া ধ্বনি অনুসাবী কবব এমন সাহস আমাব নেই—যদি বাংলায় কেমাল পাশার পদ পেতুম তা হলে হয়তো এই কীর্তি করতুম—এবং সেই পুণ্যে ভাবীকালেব অগণ্য শিশুদের কৃতজ্ঞতাভাজন হতুম। অন্তত তদ্ভব শব্দে যিনি সাহস দেখিয়ে ষত্বণত্ব ও দীর্ঘহ্রস্বের পণ্ডপাণ্ডিত্য ঘুচিয়ে শব্দের ধ্বনিস্বরূপকে শ্রদ্ধা করতে প্রবৃত্ত হবেন তাঁর আমি জয়জয়কার কবব। যে পণ্ডিতমূর্খরা 'গভর্নমেন্ট্' বানান প্রচার করতে লজ্জা পাননি তাঁদেরই প্রেতাত্মার দল আজো বাংলা বানানকে শাসন করচেন—এই প্রেতের বিভীষিকা ঘুচবে কবে? কান হোলো সজীব বানান, আর কাণ হোলো প্রেতের বানান একথা মানবেন তো? বানান সম্বন্ধে আমিও অপরাধ করি অতএব আমার নজীর কোনো হিসাবে প্রামাণ্য নয়। ইতি ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩১।

আপনার গুণগ্রাহী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৩১-এ কবি বাংলা অভিধান ও সেইসূত্রে বাংলা বানান নিয়ে রাজশেখর বসুকে পত্র লিখলেন ; আর তার পরের বছরেই দেখি পয়লা আগস্ট থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পার্টটাইম প্রফেসর' রূপে শান্তিনিকেতনে বসে বাংলা বানান সংক্রান্ত গবেষণার কাজ শুরু করে দিলেন গবেষণা সহায়ক বিজনবিহারীকে সঙ্গে নিয়ে। আর এই ১৯৩২-এই 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে কবি সেই অভিধানের সম্মুখে 'পরিচয়পত্র'তে লেখেন—

শান্তিনিকেতন-শিক্ষাভবনের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীর্ঘকাল বাংলা অভিধান সঙ্কলন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার এই বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত চিন্তা ও চেষ্টা আজ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহার এই অধ্যবসায় যে সার্থক হইয়াছে, আমার বিশ্বাস সকলেই তাহার সমর্থন করিবেন।

শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ই আশ্বিন, ১৩৩৯

হরিচরণবাবু যাতে তাঁর এই উদ্‌যোগ ও সাধনা সার্থকভাবে সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন সেজন্য প্রথমাবধি রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা ও তৎপরতার অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছাপ্রকাশ না করলে হরিচরণ কোনোদিনই হয়তো বাংলা অভিধান সংকলনের কথা ভাবতেন না, এবং গ্রন্থপ্রস্তুতপর্বে নিরবচ্ছিন্নভাবে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ আনুকূল্য ও প্রশ্রয় না থাকলে এই সংস্কৃত পণ্ডিতের পক্ষে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এত বড়ো সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা কখনোই সম্ভব হত না।

শুধু শব্দের অর্থ নয়, এই বিশাল কর্মযজ্ঞ চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, তার প্রকাশের জন্য যে অন্য অর্থেরও প্রয়োজন—সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ সদা-সচেতন ছিলেন এবং হরিচরণকে নানা সূত্র থেকে আনুকূল্যের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সহযোগিতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোদিনই বিস্মৃত হননি। বইয়ের ভূমিকার শেষ ছত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর প্রণতি নিবেদিত হয়েছে।

ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে, সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে, শব্দের অর্থ উদ্ধারের জন্য অভিধানের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রশ্ন হল কোনো অভিধানই কি বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথের কাছে যথেষ্ট হতে পারে? কোনো শব্দ কি কেবল তার ব্যবহৃত বা প্রচলিত সীমিত অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? অভিধানকার তাঁর অভিধানে একটি শব্দের এক বা একাধিক যতপ্রকার অর্থ আছে—তা সংকলন করে নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁর দায়িত্ব সেখানেই শেষ। আমাদের মতো সাধারণ পাঠক সেখানেই সন্তুষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এমন বিশাল সাহিত্যকর্মের মহান্ স্রষ্টার পক্ষে সেই সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকা কি সম্ভব ? শব্দ তার সীমাকে অতিক্রম করে যেমন বৃহত্তর অর্থ প্রকাশ করতে পারে ; আবার বিশ্বসৃষ্টির রহস্যকে শব্দের মালায় গাঁথতে গিয়েও অনেক সময় আকাঙ্ক্ষিত উপযুক্ত শব্দের সংকুলান হয় না। এ-সব সমস্যা আমার আপনার ক্ষেত্রে সামান্য, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অসামান্য।

যা লিখতে চাইছেন, শব্দসমষ্টির দ্বারা যখন তা প্রকাশ করতে পারছেন না—কবির তখনকার মনের অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৮৯৫ জুন ২৮ তারিখের পত্রে—

'বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি, একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প ['অতিথি']। ...আমি যে-সকল দৃশ্য এবং লোক এবং ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারিদিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম,

এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে এবং সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে—আমার নিজের কাছে বেশ রমণীয় হয়ে উঠছে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্য পায়, কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ এবং বাতাস, শিশির এবং শ্যামলতা, সবুজ এবং সোনালি এবং নীল সে-সমস্তই বাদ দিয়ে পায়। আমার গল্পের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ রৌদ্ররঞ্জিত ছোটো নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি, এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তা হলে গল্পটি কেমন সুমিষ্ট সজীব হয়ে দেখা দিত। তা হলে সবাই তার মর্মের সত্যটুকু কেমন অতি সহজেই বুঝতে পারত।…অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা কিছুতেই পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে, তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেননি।'

শব্দ অর্থপ্রকাশ করতে পারে—কিন্তু সে কি পারে রৌদ্রদগ্ধ পাঠকচিত্তে ছায়ার স্নিগ্ধতা এনে দিতে, সে কি পারে শব্দের মালা রচনা করে ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে দিতে? তাই কবি লেখনী হাতে নিয়ে শব্দের মালা গাঁথতে গাঁথতেও শব্দের শক্তির সীমাবদ্ধতায় অপরিতৃপ্ত।

আবার এই রবীন্দ্রনাথই মস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে আমাদের জিজ্ঞাসা করে বলেন শব্দের অর্থ নিরূপণে অভিধানেরই বা ক্ষমতা কতখানি? অভিধানের পাতায় যেটুকু অর্থ প্রকাশ পেল, জীবনের মধ্যে এসে সেই শব্দ কি সেই অর্থটুকুর সীমানার মধ্যেই সীমিত থাকে?

এ-বিষয়ে 'শেষের কবিতা'র অমিত ও যতিশঙ্করের কথোপকথন অংশটুকু উদ্ধৃত করলেই কবির ভাবনাটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে।

'দেখো যতি, মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিক্‌শনারিতে যে কথার এক মানে বেঁধে দিই, মানবজীবনের মধ্যে মানেটা সাতখান হয়ে যায়, সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।'

যতি বলে, 'অর্থাৎ তুমি বলছ বিবাহ মানে বিবাহ নয়।'

'আমি বলছি, বিবাহের হাজারখানা মানে—মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয় ; মানুষকে বাদ দিয়ে তার মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে।'

জীবনের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অভিধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বারে বারে বলেও এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা বুঝি অমিত রায়ের মুখ দিয়েই নির্গত হয়েছে। শব্দের অর্থ শুধু শব্দাভিধানেই নয়, জীবনের অভিধান থেকেও খুঁজে নিতে হবে।

কবির দুর্গোৎসব

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যে আশ্বিন মাস শরৎকাল দুর্গাপূজা শারদোৎসব বিজয়াদশমী ইত্যাদি প্রসঙ্গ একটা বিশেষ তাৎপর্য ও মাত্রা লাভ করেছে। দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ তাঁর সাহিত্যে যে এমন বিপুল ভাবে জায়গা জুড়ে আছে, তা আমাদের অনেকেরই তেমনভাবে জানা ছিল না। কী কাব্য-কবিতায়, কী গল্প-উপন্যাসে, কী নাটকে-প্রহসনে—তাঁর সাহিত্যের সব শাখাতেই আনন্দময়ীর আগমনের বার্তা ছড়িয়ে রয়েছে। বর্ষা তাঁর মনের উপর যতই ছায়া ফেলুক, পুস্তকাকারে শরতকেই তিনি প্রথম বন্দনা করেছিলেন ; তার অনেক পরে বসন্ত এবং শ্রাবণ-গাথা।

এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমি যে গৃহে জন্মেচি সেখানকার ধর্মেই দীক্ষা পেয়েছিলুম। সে ধর্মও বিশুদ্ধ। কিন্তু আমার মন তারই মাপে নিজেকে ছেঁটে নিতে কোনোমতেই রাজি ছিল না।" [১]

আর এক স্থানে বলছেন, "ধর্মমত আমার আছে কিন্তু কোনো সম্প্রদায় আমার নেই। আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্যই করি নে···আমি ধর্মসমাজের তক্‌মা পরা ছাপ মারাদের মধ্যে কেউ নই,—রাজার দত্ত উপাধি আমি ত্যাগ করেছি সম্প্রদায়ের দত্ত উপাধিও আমার নেই।" [২]

এই রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই দুর্গাপূজা শারদোৎসব আশ্বিনের আকাশ বাতাস জুড়ে ঢাকিদের ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আরও মনোহর আরও তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাণস্পর্শী হয়ে ওঠে। তিনি দেখতে পান বিশ্বব্যাপী শারদীয়া পূজার উদ্বোধন।

এই রবীন্দ্রনাথই বলতে পারেন—"আজ এই মধ্যাহ্নে শারদরৌদ্রে এবং নিস্তব্ধ শান্তিতে আমার মাঠ ও পল্লী প্লাবিত হয়ে গেছে—আমাকে নেশায় ধরেছে—মাথার মধ্যে রৌদ্রের আমেজ মদের মত প্রবেশ করেছে—চোখ অর্ধ নিমীলিত করে সমস্ত পৃথিবীকে সোনার স্বপ্নের মত দেখ্‌চি—শস্যক্ষেত্রের সুকোমল সবুজ রংটি আমার মোহাবিষ্ট নয়নপল্লব চুম্বন করচে। আকাশে আজ বিশ্বব্যাপী শারদীয়া পূজার উদ্বোধন দেখ্‌চি—আগমনীর করুণামিশ্রিত রাগিণীতে অনন্ত শূন্য বাষ্পবিজড়িত হয়ে রয়েছে—তোমাদের শহরে এমন নিঃশব্দ নিস্তব্ধ এমন অপরূপ সমারোহের পূজার আয়োজন কোথাও নেই। আমার মনে হচ্চে যেন, আমি বিদেশী সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে আজ বাড়িতে ফিরে এসেছি—তাই এমন আকাশপূর্ণ প্রসন্নতা, এমন জগদ্ব্যাপী স্মিতহাস্য।" দুর্গা পূজার ষষ্ঠীর দিন শিলাইদহ থেকে এই পত্র লিখিত। [৩]

পার্বতীর ঘরে ফেরার সঙ্গে কবি নিজেকে তাঁর ভাবনা ও অনুভূতি দিয়ে একাকার

করে ফেলেছেন। দুর্গার পিত্রালয়ে ফেরার কাহিনীর সঙ্গে নিজের অবস্থানকে এমন একাত্ম করে তোলা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

এই রবীন্দ্রনাথই বলতে পারেন, "সমস্ত সবুজ মাঠে, সমস্ত শিশির-সিক্ত বাতাসে উৎসবের আনন্দ-হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। অন্তরে বাইরে ছুটি ছুটি ছুটি—এই রব উঠেছে। ছুটিরও আর কেবল দুই সপ্তাহ বাকি আছে। আমাদের যখন ছুটি আরম্ভ, তখন তোমাদের শৈলপ্রবাস বোধহয় সাঙ্গ হবে। পার্বতী যখন হিমালয়ে তাঁর পিতৃভবনে যাবেন তখন তোমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেখানে থাকবে না। হিমালয়ের খবর আমরা রাখি নে, কৈলাসের তো নয়ই ; আমরা তো এই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, স্বর্ণকিরণচ্ছটায় শারদা আমাদেরই ঘর উজ্জ্বল করে দাঁড়িয়েছেন। গোটাকতক মেঘ দিগন্তের কোণে মাঝে মাঝে জটলা করে ; কিন্তু তাদের নন্দী-ভৃঙ্গীর মতো কালো চেহারা নয়, তারাও শ্বেতকিরণের মালা পরেছে, শ্বেত চন্দনের ছাপ লাগিয়েছে—ললাটে ভ্রূকুটির লেশ নেই।" [৪]

এই রবীন্দ্রনাথেরই সমগ্র সাহিত্য জুড়ে আগমনীর আগমন বার্তা ছড়িয়ে রয়েছে গদ্য ও পদ্যের বর্ণময় বিপুল সমারোহে। এর প্রাচুর্য যে কত জানতে হলে অবশ্যই আমাদের পড়তে হবে তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্যের অসামান্য গ্রন্থ 'রবীন্দ্রভাবনায় দুর্গা'। প্রাসঙ্গিক যাবতীয় তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে বইটিতে। এমন একটি পুস্তক হাতে পেলে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রবন্ধকারকে দিশেহারা হতে হয় না। ধন্যবাদ তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্যকে।

প্রথমেই উল্লেখ করি 'কড়ি ও কোমল'-এর (১২৯৩/১৮৮৬) সেই 'কাঙালিনী' কবিতাটির কথা।

> আনন্দময়ীর আগমনে,
> আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
> হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
> দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।

দুর্গোৎসব নিয়ে তাঁর এই প্রথম কবিতাটিই আমাদের সাহিত্যে যেন এক চিরায়ত কবিতা হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর এই কবিতা ১৮৮৬ সালে যেমন সত্য ১৯৮৬ সালে তেমনি সত্য, ২০৮৬ সালের পক্ষেও তেমনি সত্য। শুভ উৎসবের, বিশেষ করে দুর্গোৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য যে কী তা রবীন্দ্রনাথ অসামান্যভাবে চিত্রিত করেছেন এই কবিতায়। অবশ্যই কোনো বাস্তব ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে এই কবিতা লিখতে উদ্বেজিত করেছিল। কবিতাটি পড়লে বোঝা যায় এর অন্তর্গত ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথকে পরে আরও কিছু কবিতা এমন কি ছোটগল্প লিখতেও অনুপ্রাণিত করেছিল।

> ওর প্রাণ আঁধার যখন
> করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি,
> দুয়ারেতে সজল নয়ন
> এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি।

আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার,
গেহ নেই, স্নেহ নেই, আহা
সংসারেতে কেহ নেই তার।
শূন্য হাতে গৃহে যায় কেহ
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে,
কী দিবে কিছুই নেই তার
চোখে শুধু অশ্রুজল আছে।
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব।
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।

এই কবিতাটি পড়তে পড়তে 'স্বর্ণমৃগ'র সেই দুঃখী বৈদ্যনাথের কাহিনী কি মনে পড়ে যায় না? 'আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্তী হইল। চতুর্থীর দিন হইতেই ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল।' সেই কাহিনী! কিংবা 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে মিনির বিবাহ-উৎসবে রহমতের উপস্থিতি, মিনির বাবার মনের প্রতিক্রিয়া! অথবা 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'পূজার সাজ' কবিতাটি?

পূর্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের গল্পে কবিতায় নাটকে উপন্যাসে এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধে দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা বর্তমান আলোচনায় এ-প্রসঙ্গে মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গল্পকেই অবলম্বন করব। এই সীমারেখার মধ্যেই আমাদের আলোচনাটি দাঁড়িয়ে থাকবে। সীমা লঙ্ঘন না করতেই আমরা সচেষ্ট থাকবো।

'হিতবাদী'তে 'দেনাপাওনা' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে।

পণের সব টাকা মিটোতে পারেনি নিরুপমার গরীব বাবা রামসুন্দর। তাই মেয়েকে বাড়ি আনার প্রস্তাবও তুলতে পারেন না নিরুর শ্বশুরবাড়িতে।

বহুদিন গেল। অবশেষে "আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন, 'এবার পূজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে আমি—' খুব একটা শক্ত রকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, 'দাদা আমার জন্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস?' বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনী

আসিয়া সরোদনে কহিল, পূজার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই।

রামসুন্দর তাহা জানিতেন, এবং সে-সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদুরের বাড়ি যখন পূজার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাঁহার বধূগণকে অতি যৎসামান্য অলঙ্কারে অনুগ্রহপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ-কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ললাটের বার্ধক্যরেখা গভীরতর অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর-কোনো ফল হয় নাই।"

এখানেও দেখি বাঙালী জীবনের পূজার দুই রূপ। একদিকে রায়বাহাদুরের বাড়ির পূজা, অন্যদিকে পূজার দিনে বৃদ্ধ দরিদ্র রামসুন্দরের বৃহৎ সংসারের নিরানন্দ চেহারা। 'কড়ি ও কোমল'-এর 'কাঙালিনী' মেয়েটির সঙ্গে রামসুন্দরের পাঁচ বছরের নাতি বা ছয় বছরের নাতনী বা কন্যা নিরুর বেদনার প্রকৃতিগত বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন পুজোর আনন্দ কি কেবল ধনী-সম্প্রদায়ের জীবনেই? সে আনন্দ কি দরিদ্র বাঙালী পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না?

'স্বর্ণমৃগ' গল্পটি প্রাকশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৯ ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায়।

এখানেও দরিদ্রের হতাশায় বেদনায় ব্যর্থতায় কবির গভীর শোক। শরতে একদিকে প্রফুল্ল আকাশ, উল্লসিত ধানক্ষেত, মন্দমধুর হাওয়া, ঘরে-ঘরে উৎসব ও আনন্দের কলরব ; অপরদিকে দারিদ্র্যের নিরানন্দ করুণ বেদনাময় বিষণ্ণ চিত্র।

গল্পের সেই অংশটির উল্লেখ করি যেখানে দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ রয়েছে।

"এদিকে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্তী হইল। চতুর্থীর দিন হইতেই ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ঝুড়িতে মানকচু, কুমড়া, শুষ্ক নারিকেল, টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের জন্য জুতা ছাতা কাপড় এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স সাবান নূতন গল্পের বহি এবং সুবাসিত নারিকেল তৈল।

মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সূর্যকিরণ উৎসবের হাস্যের মতো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, পক্বপ্রায় ধান্যক্ষেত্র থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির সির করিয়া উঠিতেছে—এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া কাঁধে একটি পাকানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতি মাথায় প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মুখে চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখেন এবং তাহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গৃহের সহিত বাংলাদেশের সহস্র গৃহের মিলনোৎসবের তুলনা করেন এবং মনে মনে বলেন, 'বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্মণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছেন।'

ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমা নির্মাণ দেখিবার জন্য আদ্যনাথের বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়া হাজির হইয়াছিল। খাবার বেলা হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপূর্বক গ্রেফতার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের

জীবনের নিষ্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলে দুটিকে উদ্ধার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া বড়োটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁরে অবু, এবারে পুজোর সময় কী চাস বল্ দেখি।'

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, 'একটা নৌকো দিয়ো, বাবা।'

ছোটোটিও মনে করিল, বড়ো ভাইয়ের চেয়ে কোনো বিষয়ে ন্যূন হওয়া কিছু নয়, কহিল, 'আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো, বাবা।'

বাপের উপযুক্ত ছেলে! এক অকর্মণ্য কারুকার্য পাইলে আর কিছু চাহে না। বাপ বলিলেন, 'আচ্ছা'...

দিন দুই-তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া কুঁদিয়া জোড়া দিয়া দুইখানি খেলনার নৌকা তৈরি করিলেন।...সপ্তমীর পূর্বরাত্রে যখন নৌকা দুটি লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন, তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একে তো নৌকার খোলটাই যথেষ্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড় আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথাস্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সমধিক বিস্ময়ের কারণ হইল।

ছেলেদের আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন।

দেখিয়া, রাগিয়া কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলনা দুটো কাড়িয়া জানলার বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল সাটিনের, জামা গেল, জরির টুপি গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মনুষ্য দুইখানা খেলনা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে। তাও আবার দুই পয়সা ব্যয় নাই, নিজের হাতে নির্মাণ।"

গল্পের এই অংশের ভাবটিই যে পরবর্তী কালে 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের 'পূজার সাজ' কবিতায় আর একভাবে রূপ নিয়েছে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।

কবিতায় মধু আর বিধু দুই ভাই। গল্পেও বৈদ্যনাথ ও মোক্ষদার দুই ছেলে—বড়ো ছেলে ও ছোট ছেলে। বড়োটির নাম অবু। গল্পের দুই ছেলের মা মোক্ষদাই কবিতায় 'মধু'র মাতে পরিণত হয়েছে।

আরও আকর্ষণীয় বিষয় হলো গল্পে দুই ছেলের সেই নিষ্ঠুর অকরুণ রাগী ক্রোধী এবং নিশ্চয় সেইসঙ্গে দুঃখীও মায়ের নামটি। মায়ের নাম মোক্ষদা। আজ দুর্গোৎসব—মহাষষ্ঠী। ঘরেই মা মোক্ষদা—মা দুর্গা। ঘরেই 'আনন্দময়ী'র অবস্থান, কিন্তু সে-মোক্ষদা যে একান্ত স্বর্ণমৃগলোভী এক রমণী—আনন্দের সংসার সেখানে কেমন করে রচিত হবে? দুর্ভাগ্য বৈদ্যনাথের, বৈদ্যনাথের দুই পুত্রেরও।

'স্বর্ণমৃগ' প্রকাশের পরের মাসেই লিখলেন, ১৪ কার্তিক ১২৯৯-এ লিখলেন বিখ্যাত কবিতা 'যেতে নাহি দিব'। গল্পে আছে পূজারম্ভের কথা, আর কবিতাটিতে আছে পূজা অবসানের কাহিনী ; গল্পে ভরা-আশ্বিনের সংবাদ, কবিতায় আশ্বিন শেষের বৃত্তান্ত। গল্পে আছে পূজা উপলক্ষে প্রবাসীদের ঘরে ফেরার কাহিনী, কবিতায় পূজার ছুটির শেষে দূরদেশে কর্মস্থলে ফিরে যাবার তাগিদ।

গিয়েছে আশ্বিন,—পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে
সেই কর্মস্থানে।

'খাতা' গল্পটি সম্ভবত এই সময়েই লেখা। নির্দিষ্ট তারিখ জানা যায় না। ১৩০০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'ছোট গল্প' বইতে অর্ন্তভুক্ত হয়।

নায়িকার নাম উমা। আমরা ইতিপূর্বে 'স্বর্ণমৃগ' গল্পে মোক্ষদা নাম পেয়েছি, এখন 'খাতা' গল্পে উমাকে পাওয়া গেল। এই নামটিও লক্ষ্য করবার মত। এই নামটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এই কাহিনীতে।

এখানেও শরৎকালের প্রভাত ও সেইসঙ্গে রয়েছে আগমনী গানের উল্লেখ। শ্বশুরবাড়ি থেকে উমার পিত্রালয়ে ফেরার আকাঙ্ক্ষা। আগমনী গানের উমা তার মায়ের কোলে ফিরে এলেও প্যারীমোহনের বালিকাবধূর একবারের জন্য পিতৃগৃহে আসার অনুমতি মেলে না। উমার একান্ত নিজস্ব একখানা লেখালেখির খাতা ছিল। বিবাহের পর শ্বশুরবাড়িতে এলে বাপের বাড়ি থেকে উমার সঙ্গে পুরাতন দাসী যশি বা যশোদাও এসেছিল। কয়েকদিন এ-বাড়িতে গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ে দাসী বাপের বাড়ি চলে গেলে 'সেদিন উমা দুপুরবেলা শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া টিনের বাক্স হইতে খাতাটি বাহির করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিল—যশি বাড়ি চলে গেছে আমিও মার কাছে যাব।' কৈলাস থেকে উমা আসেন বাপের বাড়ি, কিন্তু প্যারীমোহনের স্ত্রী উমার মার কাছে আসার সুযোগ মেলে না। তার বুকের মধ্যে তার বেদনা ও কান্না বহন করতে হয়। অথচ বাইরে আগমনী গানে উমার ঘরে ফেরা।

"একদিন শরৎকালের প্রভাতে একটি গায়িকা ভিখারিনী আগমনীর গান গাহিতেছিল। উমা জানালার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া শুনিতেছিল। একে শরৎকালের রৌদ্রে ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়ে, তাহার উপরে আগমনীর গান শুনিয়া সে আর থাকিতে পারিল না।

উমা গান গাহিতে পারিত না ; কিন্তু লিখিতে শিখিয়া অবধি এমনি তাহার অভ্যাস হইয়াছে যে, একটা গান শুনিলেই সেটা লিখিয়া লইয়া গান গাহিতে না পারার খেদ মিটাইত। আজ কাঙালি গাহিতেছিল—

পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ওই।
শুনে পাগলিনীপ্রায়, অমনি রানী ধায়,
কই উমা বলি কই।
কেঁদে রানী বলে, আমার উমা এলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা করি কোলে।
অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি

অভিমানে কাঁদি রানীরে বলে—
কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে।”

এই অভিমান এই কান্না আগমনী গানে যেমন হিমালয়-মেনকার কন্যা শিবানী উমার, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে শরতের উৎসবহাস্যরঞ্জিত প্রভাতে সেই একই কান্না একই অভিমানের বেদনাগাথা শুনতে পাই রামসুন্দরের কন্যা রায়বাহাদুরের পুত্রবধূ নিরুপমার কাহিনীতে কিংবা প্যারীমোহনের স্ত্রী উমার সকরুণ উপাখ্যানে।

১৩০১ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হয় ‘প্রায়শ্চিত্ত’ গল্প। দুর্গাপূজার পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ যে গল্পগুলি বা কবিতা লিখেছেন, অনেক ক্ষেত্রেই দেখি পৌরাণিক পটভূমিটিকে কবি আধুনিক কালের প্রেক্ষাপটে যেন কিছুটা উলটে-পালটে দেখতে চাইছেন। তাঁর গল্পে ‘উমা’ ‘মোক্ষদা’ নামগুলি যেমন সরাসরি এসেছে, তেমনি নামের মিল না ঘটিয়ে পুরাতনী কাহিনীকে নতুন গল্পে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। কৈলাস শিব পার্বতী হিমালয় মেনকা রবীন্দ্রনাথের গল্পে বঙ্গদেশের পটভূমিতে কন্যা-জামাতা , পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী এবং শ্বশুরালয় ও পিত্রালয়ের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় উমাদের বেদনা একই রকম রয়েছে। বৎসরান্তে কন্যার পিত্রালয়ে আসার জন্য আবেগ তো চিরন্তন সত্য। তবে সংসারে সব নগেন্দ্র গিরিন্দ্র মেনকা গিরিজায়া উমাপতি ভোলানাথ গৌরীকান্ত তো এক নয়।

যদিও স্ত্রীর নাম বিন্ধ্যবাসিনী, কিন্তু স্বামী অনাথবন্ধু আদৌ মহাদেব বা ভোলামহেশ্বর নয়। ‘প্রায়শ্চিত্ত’ হল দুর্গাপূজার পটভূমিতে বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামীর গল্প।

“শরৎকালে পূজা নিকটবর্তী হইল। কন্যা এবং জামাতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য রাজকুমারবাবু বহু সমারোহে যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। এক বৎসর পরে কন্যা স্বামীসহ পুনরায় পিতৃভবনে প্রবেশ করিল। ধনী কুটুম্বের যে আদর তাহার অসহ্য হইয়াছিল, জামাতা এবার তদপেক্ষা অনেক বেশি আদর পাইলেন। বিন্ধ্যবাসিনীও অনেককাল পরে মাথার অবগুণ্ঠন ঘুচাইয়া অহর্নিশি স্বজনস্নেহে ও উৎসবতরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

আজ ষষ্ঠী। কাল সপ্তমীপূজা আরম্ভ হইবে। ব্যস্ততা এবং কোলাহলের সীমা নাই। দূর এবং নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়পরিজনে অট্টালিকার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একেবারে পরিপূর্ণ।

সে রাত্রে বড়ো শ্রান্ত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী শয়ন করিল। পূর্বে যে ঘরে শয়ন করিত এ সে ঘর নহে ; এবার বিশেষ আদর করিয়া মা জামাতাকে তাঁহার নিজের ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনাথবন্ধু কখন শয়ন করিতে আসিলেন তাহা বিন্ধ্য জানিতেও পারিল না। সে তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

খুব ভোরের বেলা হইতে শানাই বাজিতে লাগিল। কিন্তু, ক্লান্তদেহ বিন্ধ্যবাসিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কমল এবং ভুবন দুই সখী বিন্ধ্যর শয়নদ্বারে আড়ি পাতিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া অবশেষে পরিহাসপূর্বক বাহির হইতে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল ; তখন বিন্ধ্য

তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, তাহার স্বামী কখন উঠিয়া গিয়াছেন সে জানিতে পারে নাই। লজ্জিত হইয়া শয্যা ছাড়িয়া নামিয়া দেখিল, তাহার মাতার লোহার সিন্দুক খোলা এবং তাহার মধ্যে তাহার বাপের যে ক্যাশবাক্সটি থাকিত, সেটিও নাই।

তখন মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যাবেলায় মায়ের চাবির গোছা হারাইয়া গিয়া বাড়িতে খুব একটা গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই চাবি চুরি করিয়া কোনো একটি চোর এই কাজ করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তখন হঠাৎ এই আশঙ্কা হইল, পাছে সেই চোর তাহার স্বামীকে কোনোরূপ আঘাত করিয়া থাকে। বুকটা ধড়াস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বিছানার নিচে খুঁজিতে গিয়া দেখিল, খাটের পায়ের কাছে তাহার মায়ের চাবির গোছার নিচে একটি চিঠি চাপা রহিয়াছে।

চিঠি তাহার স্বামীর হস্তাক্ষরে লেখা। খুলিয়া পড়িয়া জানিল, তাহার স্বামী তাহার কোনো এক বন্ধুর সাহায্যে বিলাতে যাইবার জাহাজ ভাড়া সংগ্রহ করিয়াছে, এক্ষণে সেখানকার খরচপত্র চালাইবার অন্য কোনো উপায় ভাবিয়া না পাওয়াতে গতরাত্রে শ্বশুরের অর্থ অপহরণ করিয়া বারান্দা সংলগ্ন কাঠের সিঁড়ি দিয়া অন্দরের বাগানে নামিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের লেখায় ফুটে উঠেছে শারদীয় দুর্গোৎসবে একালের বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামীর হালচাল কর্মকাণ্ড।

১৩০৬ অগ্রহায়ণে ভারতীতে মুদ্রিত 'কল্পনা'র অন্তর্গত কবিতা 'উন্নতিলক্ষণ'। ব্যঙ্গাত্মক কবিতার সেই চারটি ছত্র সহজেই মনে পড়ে—

দেবী দশভুজা, হবে তাঁরি পূজা
মিলিবে স্বজনবর্গ—
হেথা এল কোথা দ্বিতীয় দেবতা,
নূতন পূজার অর্ঘ্য?

'উৎসর্গ'র ২৮ সংখ্যক কবিতায় ('হে হিমাদ্রি দেবতাত্মা') হরগৌরীর প্রসঙ্গ আছে। কবিতাটি ৬ আষাঢ় ১৩১০-এ রচিত। এই কাব্যের ৪৫ সংখ্যক কবিতাতেও ('অত চুপি চুপি কেন কথা কও') হরগৌরীর উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গদর্শনে ১৩০৯ ভাদ্রে 'মরণ' শিরোনামে প্রথমে মুদ্রিত।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯) প্রকাশিত হয় 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের অন্তর্গত একাধিক কবিতায় দুর্গাপূজার প্রসঙ্গ এসেছে।

আশ্বিনে পুজোর ছুটিতে নদীর ঘাটে প্রবাসীর প্রত্যাগমনের চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের কাছে বড়ো প্রিয়। 'ছোটবড়ো' কবিতায় তারই চিত্ররূপ :

আশ্বিনেতে পুজোর ছুটি হবে,
মেলা বসবে গাজনতলার হাটে,
বাবার নৌকো কত দূরের থেকে
লাগবে এসে বাবুগঞ্জের ঘাটে।

বাবা মনে ভাববে সোজাসুজি,
খোকা তেমনি খোকাই আছে বুঝি,
ছোটো ছোটো রঙিন জামা জুতো
কিনে এনে বলবে আমায় 'পরো'।
আমি বলব, 'দাদা পরুক এসে,
আমি এখন তোমার মতো বড়ো।
দেখছ না কি যে ছোটো মাপ জামার—
পরতে গেলে আঁট হবে যে আমার।'

অন্য ছবি পাই 'বিদায়' কবিতায়—

পুজোর কাপড় হাতে করে
মাসি যদি শুধায় তোরে,
'খোকা তোমার কোথায় গেল চলে।'
বলিস, 'খোকা সে কি হারায়,
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।'

আর 'পূজার সাজ' তো বিখ্যাত কবিতা—আমাদের সকলেরই পরিচিত। 'মধু বিধু দুই ভাই'কে এমন কোনো বাঙালী সম্ভবত নেই যে চেনে না।

'স্বর্ণমৃগ' গল্পে গরীব বাপের দেওয়া পূজার সামান্যতম উপহারটিও দুই বালকপুত্র দুহাত বাড়িয়ে পরম খুশি মনে গ্রহণ করেছিল। বরং তাদের মা সেই উপহার দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তাদের বাপের ওপর রাগ করে। 'পূজার সাজ' কবিতায় বাপের দেওয়া উপহারে মধুকে দেখি অসন্তুষ্ট ক্ষুব্ধ। 'রাগিয়া আগুন ছেলে, কাপড় ধূলায় ফেলে' চলে যায় রায়বাবুদের বাড়ি। তার করুণ মুখ দেখে রায় মহাশয় 'ছেলেরে ডাকিয়া চুপি কহিলেন, ওরে গুপি, তোর জামা দে তুই মধুকে। গুপির সে জামা পেয়ে মধু ঘরে যায় ধেয়ে, হাসি আর নাহি ধরে মুখে।'

কিন্তু 'শিশু'র মধু-বিধুর মা আর 'স্বর্ণমৃগ'র অবিনাশ বা অবুর মা তো এক নয়। মা হয়েও দুই মায়ের দুই রূপ। মধুর এই কাণ্ড দেখে মধুর মা দুঃখে লজ্জায় অসম্মানে হতবাক।

মা শুনি কহেন আসি লাজে অশ্রুজলে ভাসি
কপালে করিয়া করাঘাত,
'হই দুঃখী হই দীন কাহারো রাখি না ঋণ,
কারো কাছে পাতি নাই হাত।
তুই আমাদেরই ছেলে ভিক্ষা লয়ে অবহেলে
অহংকার কর ধেয়ে ধেয়ে।
ছেঁড়া ধুতি আপনার ঢের বেশি দাম তার

ভিক্ষা-করা সাটিনের চেয়ে।
আয় বিধু আয় বুকে,   চুমো খাই চাঁদ মুখে।
তোর সাজ সবচেয়ে ভালো।
দরিদ্র ছেলের দেহে   দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো।'

দুর্গোৎসবকে উপলক্ষ করে এক-একটি রচনার মধ্য দিয়ে মর্ত্যের শিব-পার্বতীর সংসারের এক-একটি ছবি আঁকতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর গল্পে কবিতায় আশ্বিনের পূজার বাজনার সঙ্গে আমাদের সংসার জীবনের মধ্যে কখনো কার্তিক-গণেশের কাহিনী, কখনো উমা বা উমাপতির কাহিনী এবং কখনো বা হিমালয়-মেনকার কাহিনী প্রাধান্যলাভ করেছে।

'রাসমণির ছেলে' গল্পটি প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায় ১৩১৮ আশ্বিনে। এটিও পূজার গল্প। এবারের গল্প কালীপদর বাবা-মা'র—ভবানীচরণ ও রাসমণির।

ভবানীচরণ বনেদী চৌধুরী পরিবারের মানুষ। কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেছে।

"পূজার সময় তাহার মনে পড়ে, কর্তাদের আমলে নূতন সাজসজ্জা পরিয়া তাঁহারা কিরূপ উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। পূজার দিনে রাসমণি কালীপদর জন্য যে সস্তা কাপড়জামার ব্যবস্থা করিয়াছেন সাবেককালে তাঁহাদের বাড়ির ভৃত্যেরাও তাহাতে আপত্তি করিত। রাসমণি স্বামীকে অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কালীপদকে যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সে খুশি হয়, সে তো সাবেক দস্তুরের কথা কিছু জানে না—তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক। কিন্তু ভবানীচরণ কিছুতেই ভুলিতে পারেন না যে, বেচারা কালীপদ আপন বংশের গৌরব জানে না বলিয়া তাহাকে ঠকানো হইতেছে। বস্তুত সামান্য উপহার পাইয়া সে যখন গর্বে ও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাকে ছুটিয়া দেখাইতে আসে তখন তাহাতেই ভবানীচরণকে যেন আরও আঘাত করিতে থাকে। তিনি সে কিছুতেই দেখিতে পারেন না। তাঁহাকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে হয়।"

দেখা যাচ্ছে দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে কবির এক-একটি রচনায় এক-একটি চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটিত হচ্ছে। পূজা-উপহারের সামান্যতা নিয়ে 'স্বর্ণমৃগ' গল্পে মায়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া, 'পূজার সাজ' কবিতায় বিধু খুশি কিন্তু মধু অসন্তুষ্ট আর 'রাসমণির ছেলে' গল্পে দেখি পিতা ভবানীচরণ পুত্রের জন্য পূজা-উপহারের সামান্যতা দেখে নিজের অক্ষমতার জন্য নিজে মর্মে লজ্জিত ; কিন্তু এখানে কালীপদর মায়ের সঙ্গে বিধুর মায়ের ভাবনার দিক থেকে কোনো তফাৎ নেই। নিজের সঙ্গতির মধ্যে পিতার দেওয়া পুজোর উপহার যত সামান্যই হোক তাই তো অসামান্য।

'শিশু ভোলানাথ' প্রকাশিত হয় ১৩২৯-এ (১৯২২) । এই কাব্যের অন্তর্গত 'দূর' শীর্ষক কবিতায় পুজোর ছুটির প্রসঙ্গ আছে। 'পুজোর ছুটি' দিয়েই কবিতার শুরু।

প্রবাসীতে অগ্রহায়ণ ১৩৩২-এ মুদ্রিত হয় 'নামঞ্জুর গল্প'। এই গল্পে 'পুজোর

বাজার' এবং সাময়িকপত্রের 'পুজোর সংখ্যার' প্রসঙ্গ আছে।

জীবনের শেষ পর্যায়ে দুর্গাপূজা কবির কাছে ভিন্নতর তাৎপর্য ও অর্থ নিয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে শিব দুর্গা উমা মোক্ষদা ইত্যাদি প্রসঙ্গ সরে-সরে যাচ্ছে। গ্রামের পূজা গ্রামের পরিবেশও শিথিল হয়ে আসছে। কবি এখন অনেকটা তাঁর নিজের বোধ ও অনুভূতির কথা সরাসরি বলছেন। গল্প-কবিতার চরিত্রগুলি অধিকাংশই শিক্ষিত মার্জিত এবং নগরকেন্দ্রিক। 'কাছে এল পূজার ছুটি'। তারই পরিপ্রেক্ষিতে—

ভবানীপুরের তেতালা বাড়িতে
আলাপ চলছে সরু মোটা গলায়—
এবার আবু পাহাড়, না মাদুরা,
না ড্যাল্‌হৌসি কিম্বা পুরী
না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিঙ।
আর দেখছি সামনে দিয়ে
স্টেশনে যাবার রাঙা রাস্তায়
শহরের-দাদন-দেওয়া দড়ি বাঁধা ছাগল-ছানা
পাঁচটা ছটা করে।
তাদের নিষ্ফল কান্নার স্বর ছড়িয়ে পড়ে
কাশের-ঝালর-দোলা শরতের শান্ত আকাশে।
কেমন করে বুঝেছে তারা
এল তাদের পূজার ছুটির দিন।

এটি 'পুনশ্চ' কাব্যের 'ছুটির আয়োজন' কবিতার শেষাংশ। কবিতার রচনাকাল ১৭ ভাদ্র ১৩৩৯।

এর কয়েক দিন পরেই ১লা আশ্বিনে লিখলেন 'পয়লা আশ্বিন' কবিতাটি। 'আশ্বিনের এই প্রথম দিনে' শরৎকালের সকাল, পুব আকাশের শুভ্র আলো, শিউলি ফুলের সুবাস আর পুজোর গন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

পুজোর সময় লেখার দাবি নিয়ে সম্পাদকদের দ্বারা আক্রান্ত হতে হত রবীন্দ্রনাথকে। সকলেই চায় রবি ঠাকুরের লেখা—গল্প অথবা কবিতা কিংবা নিদেনপক্ষে একখানা ছড়া। সম্পাদকদের আবেদন-নিবেদন-তাগিদ উপেক্ষা করাও কি তাঁর মত সহৃদয় কবির পক্ষে সম্ভব বিশেষ করে শারদীয়া পূজা উপলক্ষে যখন তাঁদের এই অনুরোধ। তাই কলম না চললেও তাঁকে কলম চালাতেই হয়। 'লিখি কিছু সাধ্য কী' বলেও পরমুহূর্তে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলেন—

পুজোর বাজারে আজি যদি লেখা না জোটাই,
দুটো লাইনেরো মতো কলমটা না ছোটাই—
সম্পাদকের সাথে রবে সৌহার্দ্য কি।

'তিনসঙ্গী'র 'রবিবার' গল্পটি তো পূজা সংখ্যার জন্যই লিখিত। ব্রাহ্মঘরের কন্যা

বিভা ও নাস্তিক অভয়াচরণ তথা অভীককুমারের কাহিনী 'রবিবার'।

"বিভা বললে, 'যাচ্ছ কোথায়।'

[অভীক বললে,] 'মিটিং আছে।'

'কিসের মিটিং'।

'ছুটির সময়কার ছাত্রদের নিয়ে দুর্গা পূজা করব।'

'তুমি পুজো করবে?'

'আমিই করব। আমি যে কিছুই মানি নে। আমার সেই না-মানার ফাঁকার মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর অপদেবতার জায়গার টানাটানি হবে না।'

হেমন্তবালাকে লেখা চিঠির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবনার প্রকাশ, বিভার প্রতি অভীকের উক্তির মধ্যে তো তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৯০৯ সাল নাগাদ বিজয়ার দিনে মানুষে-মানুষে আলিঙ্গনের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমি কিন্তু বিজয়ার দিনেই দেশের সকল লোকের সঙ্গে কোলাকুলি করিতে সঙ্কুচিত হওয়াকে সঙ্কীর্ণতা মনে করি—এই দিনের শুভদিনত্ব বহুদিন ও বহুজনের অন্তর হইতে জাগ্রত হইয়াছে ইহা আমার বা কয়েকজনের পরামর্শ করা নূতন সৃষ্টি নহে—এই দেশব্যাপী সদ্ভাবের বন্যাকে যে ব্যক্তি প্রত্যাখান করিতে পারে সে আর যাই করুক ধর্মের দোহাই যেন না দেয়—যে ধর্মের শিক্ষায় এই সমগ্র দেশের আলিঙ্গনকে উপেক্ষা করিতে উৎসাহিত করে তাহার মধ্যে এমন নিশ্চয় কিছু আছে যাহা ধর্ম নহে—যাহা দলীয় দম্ভ। পৌত্তলিকতাকে সর্বপ্রযত্নে বার করিবার চেষ্টা করিয়া তুমি পৌত্তলিকতাকে নষ্ট করিতে পার না—যেখানে তোমার ধর্ম সেখানে তুমি নিজেদের মধ্যে দৃঢ় থাক—কিন্তু সেই দৃঢ়তা দুর্গপ্রাচীরের মতো তোমাকে অন্যের সঙ্গে এবং দেশের সঙ্গে মিশিতে যেন বাধা না দেয়।"

এই রবীন্দ্রনাথই পূজা উপলক্ষে উপহার দেন, উপহার নেন, বিজয়ায় আলিঙ্গন করেন আশীর্বাদ দেন, উৎসবের আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেন, আর সম্পাদকদের নিরাশ না করে পুজো সংখ্যার জন্য কলম ছোটান। পুজোর সময় তাঁর লেখালেখির চাপ বোধহয় একটু বেশিই পড়তো ; তারপর শারদীয় অবকাশ উপভোগ করতেন প্রফুল্ল প্রসন্নচিত্তে।

পাদটীকা

১. হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র, ৮ নভেম্বর ১৯৩১।
২. ঐ, ৮ নভেম্বর ১৯৩২।
৩. প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্র, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০০।
৪. বালিকা রাণু অধিকারীকে লিখিত পত্র, ৬ আশ্বিন ১৩২৫।
৫. দ্রষ্টব্য ১ ও ২ সংখ্যক পাদটীকা।

রবীন্দ্রনাথ পড়তেন রবীন্দ্রনাথ

সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের সবচেয়ে সতর্ক, পদে-পদে খুঁত ধরা ভ্রান্তি ধরা খড়গহস্ত প্রতিবাদী পাঠক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। নিজের লেখা তাঁর নিজের একেবারেই পছন্দ হত না। কলম দিয়ে ভাবের আবেগে তাৎক্ষণিক যা বেরিয়ে এল তা-ই কবিতা, তা-ই সংগীত, তা-ই সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ তা মনে করতেন না। তাজমহল গড়তে একটির পর একটি পাথর বসাতে হয়েছে পাথরের উপরে যত্ন করে সুন্দর করে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাব্য-কবিতাদি শব্দের পর শব্দ গেঁথে, ছত্রের পর ছত্র রচনা করে নির্মাণ করেছেন। কিন্তু সেই নির্মাণের পিছনে যে কী শ্রম, কী অতৃপ্তি, মনঃপূত না হওয়ার কারণে শিল্পীর যন্ত্রণা, স্বহস্ত-রচিত সৃষ্টিকে নির্মমভাবে পরিত্যাগ করা এবং পরিমার্জিত করে পুনর্নির্মাণের যে ঐকান্তিক প্রয়াস তা রবীন্দ্রনাথকে একই সঙ্গে স্বতন্ত্র ও অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। তিনি তাঁর প্রতিটি রচনাই একজন রুচিশীল শিক্ষিত রসজ্ঞ পাঠকের চোখ দিয়ে নিজে বারবার পাঠ না করে কখনও তা ছাপাতে দিতেন না। আমার মনে হয় স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক রবীন্দ্রনাথ, সমালোচক-রবীন্দ্রনাথ, সংশোধক-রবীন্দ্রনাথ আরও বড় মহত্তর। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক রবীন্দ্রনাথ যদি এত সতর্ক এত সচেতন এত খুঁতখুঁতে এত উচ্চ সাহিত্যিক গুণমানের অধিকারী না হতেন, পছন্দ-অপছন্দের বাছবিচার যদি তাঁর এমন তীব্র না থাকত, যে কোনও প্রাপ্তিতেই যদি তাঁর তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি ঘটত, নিজের লেখার প্রতি মমত্ব যদি তাঁকে কাতর এবং দুর্বল করত, যদি লেখক ও পাঠক-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লেখক-রবীন্দ্র-পাঠক রবীন্দ্রনাথকে কাবু করে তাঁর ঘাড়ের উপরে উঠে বসত, তাঁকে কথা বলতে প্রতিবাদ করতে ত্রুটিনির্দেশ করতে বাধা দিত, পাঠক-রবীন্দ্রনাথের মতামতকে লেখক-রবীন্দ্রনাথ যদি তেমন মূল্য ও গুরুত্ব না দিত, আত্মতুষ্টিতে যদি রবীন্দ্রনাথ পরিতৃপ্ত ও বিভোর থাকতেন, সংশোধন ও পরিমার্জনে যদি তাঁর অনাগ্রহ ও আলস্য থাকত—তাহলে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা বহু কাব্যকবিতা আমরা যে অত্যন্ত দুর্বল অসার্থক ও নিম্নমানের পেতাম তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার প্রথম খসড়া একেবারেই দুর্বল অকিঞ্চিৎকর ও অসফল সৃষ্টি। তাঁর অনেক গান অনেক কবিতা অনেক নাটক অনেক উপন্যাসের ফার্স্ট ড্রাফটেই যদি আত্মতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকতেন কবি, তাহলে আজকে আমরা রবীন্দ্রনাথকে যে-রবীন্দ্রনাথ রূপে পেয়েছি, সেই রবীন্দ্রনাথকে পেতাম না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক তথা সমালোচক-রবীন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ ; তিনিই শুদ্ধতর কবি রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সামনে উপস্থিত করে গেছেন।

কী গদ্য কী পদ্য, তিনি সব লেখাই লিখতে লিখতে পড়তেন, পড়তে পড়তে

কাটতেন, তার পরে আবার লিখতেন এবং তার পরে আবারও পড়তেন । ফলে লিখতে লিখতেই তাঁর সংশোধন পরিমার্জনের কাজ চলত। তাই দেখি তাঁর পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটির অন্ত নেই। যদি তাঁর সমগ্র রচনার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেত তাহলে তাঁর হাতের লেখায় ফুলস্ক্যাপ খাতার পাতার পরিমাণ হত আনুমানিক এক লক্ষ তিরিশ-চল্লিশ হাজার পৃষ্ঠা। এর মধ্যে তাঁর কাটা পাঠের পরিমাণ হয়ে যাবে তা সব মিলিয়ে কম করেও হাজার পনের-কুড়ি পৃষ্ঠা। অপছন্দ শব্দ, কবিতার চরণ, গানের কথা, গদ্যের বাক্য, নাটকের সংলাপ, প্রবন্ধের অনুচ্ছেদ, উপন্যাসের পরিচ্ছেদ—কবি নির্দয়ভাবে কেটে বাদ দিয়েছেন তাঁর লেখা পাণ্ডুলিপিতে। মনে হয় না কোনদিনও তিনি তাঁর নিজের লেখা কখনও আরাম করে বসে প্রসন্ন চিত্তে পড়েছেন। তিনি বেশ নবাবিচালে মশগুল হয়ে শুয়ে বসে হেলান দিয়ে অন্যের লেখা পড়তে কিন্তু খুবই ভালবাসতেন। কবিতার বই বা ভ্রমণের বই কলকাতায় বসে পড়তে তাঁর একেবারেই ইচ্ছে করত না। কলকাতার বাইরে কোথাও কোনও নিরিবিলিতে মধ্যাহ্নে বা সন্ধ্যায় একটা সুখপাঠ্য মোটা বই হাতে নিয়ে বসার মতো সুখ খুব কমই আছে ; কবির ভাষায়—এমন নবাবিয়ানা পৃথিবীতে অতি অল্প আছে। কিন্তু এই নবাবিয়ানা ছিল না তাঁর নিজের লেখাপড়ার সময়। সেই সময় তিনি তাঁর লেখার টেবিলে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসতেন—তখন তিনি এক অতিশয় তীক্ষ্ণ সতর্ক পাঠক এবং সেই সঙ্গে এক নির্মম কঠিন সমালোচক।

কবি যে শুধু তাঁর পাণ্ডুলিপিরই পাঠক ছিলেন, তা তো নয়। সংশোধিত পাণ্ডুলিপি প্রেস-কপি করা হল। যদি সেই প্রেসকপি নিজে না করে অন্যে কেউ করে থাকেন তো সে-লেখা তিনি ছাপতে দেবার আগে আবারও পড়বেন। এবং অপছন্দ অংশ কেটে আবার লিখবেন বা নতুন কিছু সংযোজন করবেন। তাঁর প্রতিটি লেখাতেই প্রেসে পাঠাবার আগে এই বর্জন সংযোজনের ব্যাপারটা অবধারিত ছিল বলেই তাঁর লেখার প্রেস-কপি করারও নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল। ফুলস্ক্যাপ কাগজ সাদা বা রুল যা-ই হোক লম্বালম্বি ভাঁজকরা হত দু'দিক সমান রেখে। লিপিকর কাগজের ডান দিকের অংশে লিখতেন ; রবীন্দ্রনাথ কাগজের বাঁদিকের অর্ধাংশে পরিমার্জন সংযোজনের কাজ চালাতেন। বহু পাণ্ডুলিপিতেই দেখি এই বাঁদিকের সাদা অংশ ভরে রয়েছে কবির হস্তাক্ষরে। কখনো বা পাতার পর পাতা কেটে বাদ দিয়েছেন। যথেষ্ট পরিণত বয়স পর্যন্ত নিজের বইয়ের প্রুফ নিজেই দেখেছেন। লেটারিং ঠিক আছে কিনা, ছাপার ভুল শুদ্ধ হয়েছে কিনা, টাইটেল পেজ যথাযথ হয়েছে কিনা, বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্ভুল রইল কিনা—শুধু এইটুকু দেখাই রবীন্দ্রনাথের প্রুফ দেখা ছিল না। তাই প্রুফ রিডিংয়ের সময় কবি নিজেকে শুধু প্রুফ-রিডার রূপেই সীমিত রাখতেন না ; নিজের পাঠক ও সমালোচক সত্তাটিকেও সজাগ রাখতেন সর্বদা। তাই কবির কাটা-প্রুফের পাতার মধ্যেও তাঁর সাহিত্যের অনেক বর্জন সংযোজনের ইতিহাস রচিত হয়ে গেছে।

যেমন হয়, বড় বড় লেখকমাত্রেরই লেখা প্রথমে সাময়িকপত্রে বেরোয়, পরে বই হয়ে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর সাহিত্যেরও সিংহভাগ

লেখাই প্রথমে পত্র-পত্রিকায় ও পরে পুস্তকাকারে প্রাকশিত হয়। কোনও লেখা রবীন্দ্রনাথ যখন সাময়িকপত্র থেকে বইয়ে ছাপতে যান, তখন সেই পাঠক-রবীন্দ্রনাথ তথা সমালোচক-রবীন্দ্রনাথ আবারও একবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। পত্রিকায় রচিত রচনাটি তখন আর তাঁর ঠিক মনের মতো মনে হয় না ; পাঠক-রবীন্দ্রনাথের কানে সেই রচনার অনেক অংশই বেসুরো লাগে, পছন্দ হয় না। সুতরাং পালটাতে হয় অপছন্দ অংশগুলো।

তাঁর নৌকাডুবি বেরিয়েছিল নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ১৩১০ বঙ্গাব্দে ধারাবাহিকভাবে অনেক দিন ধরে। শেষ হয়েছিল ১৩১২-তে এসে। অর্থাৎ ১৯০৩ থেকে ১৯০৫। ১৯০৬-এ উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। মাসিক পত্রিকা থেকে কপি নিয়ে উপন্যাসটি বই করে ছাপার দায়িত্ব এই সময় শুধু প্রকাশকেরই থাকে—এমনটা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কিন্তু নয়। তিনি উপন্যাসটি একবার লিখেই তার দায়দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাননি কখনই। আমি একালে এমন কোনও কোনও বিখ্যাত লেখককে বারবার বলতে শুনেছি যে তাঁরা তাঁদের লেখা ছেপে বেরোবার পর কখনও আর তা ফিরে পড়েন না। যেন এক ধরনের গভীর নিরাসক্ত নিষ্কাম ভাব। ছেপে বেরিয়ে যাওয়া নিজের লেখা পাতা উল্‌টে-উল্‌টে নিজে আবার কী পড়ব? বরং সেই সময়টা বসে বসে আবার একটা নতুন উপন্যাসের মস্‌কো করা যেতে পারে। নিজের লেখা নিজে পড়ে তাঁরা তাঁদের অমূল্য সময়ের 'অপব্যয়' করতে চান না। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথরা কিন্তু এই ভাবনার মানুষ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে তো কম পড়াশোনা করেননি ; তাঁর বিপুল অধ্যয়ন নিয়ে গবেষণা চলছে একালে, এ বিষয়ে বইপত্র পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে। গ্রন্থসমুদ্র মন্থনকারী এই বিশ্বজয়ী মানুষটি বিশ্বসাহিত্য পড়া ছাড়াও আর যা পড়েছেন তা হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সমগ্র রচনাবলী। এবং সেটা একবার নয় দুবার নয়, কম করেও পড়তে হয়েছে পাঁচ সাত দশবার। যতবারই কাব্য-কবিতা নাটক উপন্যাসের নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে তখনই তিনি তা পূর্ণ মনঃসংযোগ সহকারে সংশোধন ও পরিমার্জনে প্রয়াসী হয়েছেন। সুন্দরকে সুন্দরতর করে তুলতে রবীন্দ্রনাথ জীবনে কখনও ক্লান্তি অনুভব করেননি। তাই নিজের লেখাটি একবার লিখেই সেই লেখার দায়দায়িত্ব থেকে নিজেকে কোনওদিন তিনি মুক্ত করতে চাননি। তাঁর কাছ থেকে বঙ্গীয় পাঠকসমাজ যত না দাবি করেছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠক-রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা ছিল তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। এই পাঠক-রবীন্দ্রনাথই লেখক-রবীন্দ্রনাথকে সারা জীবন শাসন তর্জন নিয়ন্ত্রণ করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে বরাবর। প্রত্যেক বড় লেখকই সামনে একজন উচ্চ মানের আদর্শ পাঠক খাড়া করে তাঁর লেখা লেখেন। আমার মনে হয় লেখক জীবনের প্রথম দুটি দশক যে দুটি মানুষকে চোখের সামনে জাগ্রত রেখে এবং পাঠকের সিংহাসনে যে দুটি মানুষকে অধিষ্ঠিত করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখক জীবনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন তাঁদের একজন তাঁর কবিতার পাঠক কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ও অপরজন তাঁর গদ্যের পাঠক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম অবশ্য শুধু যে তাঁর গদ্যের পাঠক তা নয়, কাব্য-কবিতারও অনুরাগী পাঠক ছিলেন। যদি কোনও লেখা বঙ্কিমের মনঃপূত হয়ে থাকে তবেই তরুণ রবীন্দ্রনাথের

লেখক হিসেবে সবটুকু পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণ সাফল্য। এমনটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখক জীবনের সেই সময়কার মনের অবস্থা।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই দেশবাসী আয়োজিত শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, "একদিন আমার প্রথম বয়সে কোনো নিমন্ত্রণসভায় তিনি নিজকণ্ঠ হইতে আমাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়াছিলেন, সেই আমার জীবনের সাহিত্যচর্চার প্রথম গৌরবের দিন। তাহার পরে সেদিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদর সহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন ; সে সৌভাগ্য অন্য লোকের পক্ষে এমন বিরল ছিল এবং সেই সমাদরবাক্য এমন অন্তরের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল যে, আজ তাহা লইয়া সর্বসমক্ষে গর্ব করিলে ভরসা করি সকলে আমাকে মার্জনা করিবেন। কিন্তু সেই পুরস্কার যে তাঁহার হস্ত হইতে আমার শেষ পুরস্কার হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। সেই সকল উৎসাহবাক্য সাহিত্য পথযাত্রার মহামূল্য পাথেয় স্বরূপে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে সাদরে রক্ষিত হইল ; তদপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার আর এ জীবনে প্রত্যাশা করিতে পারি না।"

রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্র-রচনার পাঠকরূপে পেয়েছিলেন সে-কথা রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালেও কখনও বিস্মৃত হননি। বঙ্কিমের মৃত্যুর প্রায় দুই দশক পরেও তাঁর প্রসঙ্গে কবি বলছেন, "সন্ধ্যাসংগীতের জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় না, তাহা নহে।...রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন ; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে-মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, 'এ-মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?' তিনি বলিলেন, 'না'। তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে-মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।"

বলছিলাম 'নৌকাডুবি'র কথা। বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক প্রায় আড়াই বছর বেরোবার পর উপন্যাস শেষ হলে রবীন্দ্রনাথ সেটি স্বাভাবিকভাবেই বই করার সিদ্ধান্ত নেন। সুতরাং বঙ্গদর্শনের পুরনো ফাইল খুলে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে পড়তে বসেন রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'। ইতিপূর্বে এই বঙ্গদর্শনেই 'চোখের বালি' ধারাবাহিক মুদ্রিত হয়েছে এবং গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু নতুন উপন্যাস নৌকাডুবি তেমনভাবে পছন্দ হল না পাঠক-রবীন্দ্রনাথের। উপন্যাসের অনেক জায়গায় যে অকারণ বিস্তার ও বাহুল্য আছে, অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও বর্ণনা উপন্যাসকে যে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে তা রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি আর-একবার পড়েই বুঝতে পারলেন। বাঙালী পাঠক হয়তো পুস্তকাকারে রবীন্দ্রনাথের একটা বড় মাপের নতুন উপন্যাস পেয়ে বিগলিত হবে ; কিন্তু নিজের লেখা পড়ে খুশি হতে পারছেন না কবি নিজে। একজন লেখক যখন নিজের লেখারও সতর্ক পাঠক হন তখনই এমন পরিস্থিতি আসতে পারে। যে লেখক মনে করেন তাঁর কলম থেকে

একবার যা বেরিয়েছে তাই চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয়, তাঁর ক্ষেত্রে তাঁর নিজের লেখা নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাববার আর কোনও অবকাশ থাকে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনওদিনই সেই দলের লেখক ছিলেন না। তাই নিজের লেখা বারবার পড়ার প্রয়োজন হত রবীন্দ্রনাথের। 'নৌকাডুবি' পড়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হল এ লেখা বড়ই শিথিল এবং ঢিলেঢালা। বই করার সময় এই মেদবহুল স্থূলাঙ্গিনীকে কবি কেটে ছেঁটে আঁটসাঁট করে একেবারে তন্বী করে তুললেন। সেই সময়কার একটি চিঠিতে কবি লিখছেন, 'নৌকাডুবিকে নানা স্থানে খর্ব করিয়া তাহাকে বেশ একটু আঁটসাঁট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এরূপ স্থলে তাহার অনেক সুরচিত সুপাঠ্য অংশও নিশ্চয় বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু বাগান সাজাইতে হইলে আবশ্যক মতো অনেক ভালো গাছও ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়—এ সকল কাজ নিপুণভাবে করিতে হইলে নিষ্ঠুরভাবেই করিতে হয়। নিজের লেখার সম্বন্ধে সুবিচার করা শক্ত—তাহার কারণ, অন্ধ মমত্ব বাধা দেয়—কিন্তু ছাঁটিবার বেলায় সেই মমত্ব অতিছেদনের হাত হইতে রক্ষা করে। আমি যদি লেখক না হইয়া সমালোচক হইতাম হয়ত আরো বেশি কাটিতাম।"

এই পত্রাংশটি অনুধাবন করলে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক ভাবনাটি আমাদের কাছে আর একটু পরিষ্কার হতে পারে। (ক) প্রথম দফায় যে উপন্যাস লেখা হয়েছিল (বঙ্গদর্শনে) তা ছিল অনাবশ্যক মেদবহুল বৃহৎ। (খ) উপন্যাসের নানা অংশ পরিত্যাগ করে তাকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত ও সংহত করা হয়। (গ) এই বর্জন প্রক্রিয়ায় হয়তো অনেক সুরচিত ও সুপাঠ্য অংশ উপন্যাস থেকে বাদ পড়তে পারে ; কিন্তু সেই সুখপাঠ্যতা স্বতন্ত্রভাবে সেই বর্জিত অংশের, কিন্তু মূল উপন্যাসের পক্ষে তা অত্যাবশ্যক নয়। (ঘ) একটি সুন্দর বাগান তৈরি হয় তার বৃক্ষরোপণের বিন্যাসের উপর ; ভালো ভালো গাছ এলোমেলো পুঁতে জঙ্গল তৈরি করে নয়। সুতরাং বাগানকে সুন্দর করে সাজাবার পক্ষে বৃক্ষবাহুল্য অন্তরায়। অতএব অনাবশ্যক গাছ বাগান থেকে বাদ দেওয়াই প্রয়োজন। বর্জিত বৃক্ষসমূহের মধ্যে কিছু কিছু ভালো দামী গাছও হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু সাজানো বাগানের মধ্যে তার স্থান সংকুলান হবার উপায় নেই। (ঙ) যেমন মালীর পক্ষে বাগানকে সাজাবার প্রয়োজনে ভালো একটা গাছকে কেটে ফেলতে মন সরে না, তেমনি লেখকের পক্ষেও নিজের লেখার কোনও অংশ অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় পরিহার করতে গায়ে লাগে। নিজের রচনার প্রতি লেখকের মমত্ব তো স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনা পাঠ করার সময় অতিশয় কঠোর, বলা যায় নিষ্ঠুর হয়ে উঠতেন। বঙ্গদর্শনের নৌকাডুবির বিভিন্ন স্থান থেকে এত অংশ বাদ দিয়েছেন যে সেই বর্জিত অংশগুলিকে একত্র করলে পাঁচ-ছ' ফর্মার মতো একটা বই হয়ে যায়। একটু কৌতুক করেই কবি বলেছেন, তিনি স্বয়ং লেখক না হয়ে যদি সমালোচক হতেন তাহলে উপন্যাসের আরও অনেক অংশ হয়তো ছেঁটে বাদ দিতেন। এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-সাহিত্যের কত বড় কঠিন পরীক্ষক ছিলেন। নৌকাডুবির প্রথম সংস্করণের বই ছিল চারশো পাতার। বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত উপন্যাসের পাঠ যদি আগাগোড়া ছাপা হত তো বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচশোতে দাঁড়াত। তাহলে বইয়ের

দাম দু' টাকার স্থলে আড়াই টাকা হত। তাতে বসুমতীর উপেন মুখার্জির ঘরে বেশি পয়সা আসত, ঔপন্যাসিকও বছর শেষে রয়্যালটি বেশি পেতেন। কিন্তু লোভ রবীন্দ্রনাথের ছিল না। উপন্যাসের নাম 'নৌকাডুবি', সেই উপন্যাসের পাতা বাড়িয়ে ওজন বৃদ্ধি করে বইটিকে কিন্তু কবি ডোবাতে চাননি। তাঁর নিজের সৃষ্টিকে অসুন্দর থেকে সুন্দর করতে বা সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তুলতে রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক প্রযত্ন ও প্রচেষ্টার সারা জীবন কোনও অন্ত ছিল না। তিনি তাঁর উপন্যাসের পাঠ এক এডিশন থেকে আর এক এডিশনে এসে ছাপার মুখে পরিবর্জন পরিমার্জন করলে তখন আমরা পাঠকরা বুঝি কোথায় ছিল পূর্বের সংস্করণে ত্রুটি ও দুর্বলতা। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ পূর্বের পাঠ পরে সংশোধন করেছেন নাটকে গানে কবিতায় প্রবন্ধে। 'রক্তকরবী'র আগের পাঠ ও পরের পাঠের মধ্যে বিস্তর ফারাক ; কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। পত্রিকার পাঠ ও প্রথম সংস্করণ কিংবা প্রথম সংস্করণ ও শেষ সংস্করণে যে পাঠবৈষম্য লক্ষ্য করি তাতেই বুঝতে পারি পত্রিকায় মুদ্রিত কবিতাটি বা প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত রচনাটি কত দিক থেকে কত দুর্বল ও অসার্থক ছিল।

তাঁর বিপুল সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনিই আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন একটা রচনার মধ্যে কেমন করে দেখতে হয় কোথায় আছে তার দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকগুলি। পাঠক রবীন্দ্রনাথ বরদাস্ত করেননি নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে, গীতিকার রবীন্দ্রনাথকে, প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথকে ও কবি রবীন্দ্রনাথকে। লেখক রবীন্দ্রনাথ বরাবরই পাঠক রবীন্দ্রনাথকে সমীহ করে চলেছেন ; পাঠক রবীন্দ্রনাথের অভিভাবকত্ব বরাবরই লেখক-রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে চলেছেন, মান্য করে চলেছেন। কেবল এক জায়গায় লেখক রবীন্দ্রনাথ ও পাঠক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সহমত ও সখ্যতা লক্ষ্য করা গিয়েছে ; পাঠক রবীন্দ্রনাথ সেখানে লেখক রবীন্দ্রনাথকেই মান্য করেছেন, তাঁর সৃষ্টির সার্থকতাকে বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়েছেন, বারবার পাঠ করেও মনে হয়েছে এর কোনও সংশোধন পরিবর্তন অসম্ভব, এই সৃষ্টির সার্থকতা প্রথম পাঠেই চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। রবীন্দ্রনাথের সেই লেখাগুলি হল তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ছোটগল্প—রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা সাহিত্যে যার প্রথম আবির্ভাব। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় পাঠক রবীন্দ্রনাথের চোখে কোন্ রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রথমাবধি সংশোধনের অতীত ত্রুটিহীন ও শিল্পসার্থক, তাহলে তার একটি উত্তরই অনিবার্যভাবে আসবে—সেই লেখক ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সব গল্পই প্রথমে সাময়িকপত্রে ও পরে বইয়ে মুদ্রিত হয় ; এবং বইয়েরও একাধিক সংস্করণ তাঁর জীবৎকাল মধ্যেই প্রকাশিত হয়। এই বিশাল গল্পমালার মধ্যে সংশোধনের পরিমাণ অতিশয় সামান্য, নামমাত্র, নেই বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথের মতো খুঁতখুঁতে পাঠকও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে খুঁত ধরতে পারেননি, এমনই ছিল রবীন্দ্রনাথের নিখুঁত ছোট গল্প।

শুধু স্বতন্ত্রভাবে কাব্য-কবিতা গল্প-উপন্যাস নাটক নয়, একেবারে তাঁর শেষ জীবনে তাঁর আটাত্তর বছর বয়সে বিশ্বভারতী যখন তাঁদের প্রকাশন বিভাগ থেকে সমগ্র

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশে উদ্‌যোগী হলেন তখন রবীন্দ্রনাথ আরও একবার সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলীর পাঠক হয়ে তাঁর পড়ার টেবিলে চেয়ার টেনে বসলেন। নিজের রচনার প্রতি কবির 'বিতৃষ্ণা' যে ছিল কত সুগভীর তা রবীন্দ্র-রচনাবলীর সম্পাদকমণ্ডলী লক্ষ্য করে বিস্মিত হলেন এবং পরিকল্পনা রূপায়ণে যথেষ্ট বিপদেও পড়লেন। কথা ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যোপন্যাস 'কবিকাহিনী' দিয়েই রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের সূচনা ঘটবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই রাজি হলেন না। তাঁর প্রথম জীবনের অনেকগুলি বই—গদ্য পদ্য নাটক তাঁর কাছে সংরক্ষণের পক্ষে অনাবশ্যক বর্জনযোগ্য ও পরিত্যাজ্য বলে মনে হল। কবির হাতে থাকে কলম, কিন্তু পাঠক-রবীন্দ্রনাথের হাতে সদা উদ্যত বিচারের দণ্ড। সেখানে তিনি কঠোর এবং অনমনীয়। ফলে সম্পাদকদের অনুনয় অনুরোধ সত্ত্বেও রবীন্দ্র-নির্দেশে রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে বাদ পড়ল 'কবি কাহিনী', 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'কাল-মৃগয়া', 'শৈশব সঙ্গীত' ইত্যাদি অনেকগুলি রবীন্দ্র-রচিত গ্রন্থ।

১৯৩৯ সালে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশকালে প্রথম খণ্ডের 'ভূমিকা'য় রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "ইতিহাস সবই মনে রাখতে চায় কিন্তু সাহিত্য অনেক ভোলে। ছাপাখানা ঐতিহাসিকের সহায়। সাহিত্যের মধ্যে আছে বাছাই করার ধর্ম, ছাপাখানা তার প্রবল বাধা। কবির রচনাক্ষেত্রকে তুলনা করা যেতে পারে নীহারিকার সঙ্গে। তার বিস্তীর্ণ ঝাপসা আলোর মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে সংহত ও সমাপ্ত সৃষ্টি। সেগুলিইকাব্য। আমার রচনায় আমি তাদেরই স্বীকার করতে চাই। বাকি যত ক্ষীণ বাষ্পীয় ফাঁকগুলি যথার্থ সাহিত্যের সামিল নয়। ঐতিহাসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ; বাষ্প, নক্ষত্র, ফাঁক, কোনোটাকেই সে বাদ দিতে চায় না।

"আমার আয়ু এখন পরিণামের দিকে এসেছে। আমার মতে আমার শেষ কর্তব্য হচ্ছে, যে লেখাগুলিকে মনে করি সাহিত্যের লক্ষ্যে এসে পৌঁচেছে তাদের রক্ষা করে বাকিগুলোকে বর্জন করা। কেননা রসসৃষ্টির সত্য পরিচয়ের সেই একমাত্র উপায় সবকিছুকে নির্বিচারে রাশীকৃত করলে সমগ্রকে চেনা যায় না। সাহিত্য রচয়িতারূপে আমার চিত্তের যে একটি চেহারা আছে সেইটেকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যেতে পারলেই আমার সার্থকতা। অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার।"

কবির হাতে ছিল কলম—'সোনা-মোড়া ফাউন্টেন পেন', আর পাঠক-রবীন্দ্রনাথের মুঠিতে ছিল ইস্পাতের শাণিত কুঠার। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ পাঠক-রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে কোনদিনই নিষ্কৃতি পাননি।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর সব রচনাই কি রবীন্দ্র-রচনা?

বেশ অনেক বছর আগের কথা। তখন সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনোর পাঠ শেষ করেছি। আনন্দবাজার পত্রিকার 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলাম। চিঠিটির শিরোনাম ছিল : মালঞ্চ উপন্যাসের নাট্যরূপ। শীর্ষপত্র হয়ে চিঠিটি বেরিয়েছিল ১৯৬৫ সালের ৫ জুলাই (২০ আষাঢ় ১৩৭২) সোমবার। তাতে সেদিন লিখেছিলাম—

"রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' উপন্যাসটি 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রে ১৩৪০ সালের আশ্বিন-কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু গল্প-উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত করেছেন আমরা জানি। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' অবলম্বনে 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রাজর্ষি' অবলম্বনে 'বিসর্জন', 'মুকুট' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস অবলম্বনে 'মুকুট' নাটক, 'একটা আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বনে 'তাসের দেশ' ইত্যাদি নাটক এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয় অংশে আছে, 'মালঞ্চ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ নাটকটি পাণ্ডুলিপি আকারে রবীন্দ্র-ম্যুজিয়মে রক্ষিত আছে।'

আমাদের প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ-কৃত মালঞ্চ-এর সম্পূর্ণ নাট্যরূপ—যা পাণ্ডুলিপি আকারে রবীন্দ্রভবনে বর্তমান, আজও পর্যন্ত কেন অপ্রকাশিত রয়েছে? সরকার প্রচারিত রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এই নাটকটি প্রকাশ করা যেতে পারত। সম্প্রতি বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বহু রচনা যা ইতিপূর্বে রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তা মুদ্রিত হয়েছে ; কিন্তু সেখানেও মালঞ্চ নাটকের পাণ্ডুলিপিটি সম্পর্কে কোনও উল্লেখ নেই।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত মালঞ্চ-এর নাট্যরূপ—সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি থাকা সত্ত্বেও যা এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত—সম্পর্কে রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।"

সংবাদপত্রে এই চিঠি প্রকাশের তিন বৎসর পর বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রানুশীলন বার্ষিক পত্রিকা 'রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা'র দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৬৮ নভেম্বর ১৩৭৫ অগ্রহায়ণে মালঞ্চের পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত হয়। অতঃপর বিশ্বভারতী থেকে মালঞ্চ নাটক স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে (১৯৭৯ খ্রি)। গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণ ছাপা হয় ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে (১৯৯০ খ্রি)। ১৪০২ পৌষে (১৯৯৫ খ্রি) এই নাটক বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টাবিংশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মালঞ্চ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন এ-সংবাদ আমরা

প্রথম জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের এক বৎসর পরে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে (১৯৪২ খ্রি) প্রকাশিত বিশ্বভারতী রবীন্দ্র- রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে মালঞ্চ উপন্যাসের গ্রন্থপরিচয়ে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি—সেখানে বলা হয়েছিল—'মালঞ্চ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। সম্পূর্ণ নাটকটি পাণ্ডুলিপি আকারে রবীন্দ্র ম্যুজিয়মে রক্ষিত আছে।' ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের পৌষে (১৯৫১ খ্রি) পুনর্মুদ্রিত দ্বাদশ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ের মন্তব্যে পরিবর্তন কেবল 'রবীন্দ্র ম্যুজিয়মে'-স্থলে 'রবীন্দ্র-ভবনে'।

১৯৬৮ অক্টোবর ২২ তারিখে লিখিত রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার দ্বিতীয় খণ্ডের (এই খণ্ডে মালঞ্চ নাটক মুদ্রিত) ভূমিকায় বিশ্বভারতীর তদানীন্তন উপাচার্য কালিদাস ভট্টাচার্য লেখেন, "রবীন্দ্রনাথ তাঁর মালঞ্চ উপন্যাসের একটি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, এবং তা পাণ্ডুলিপি আকারেই বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে (রবীন্দ্রভবন) রক্ষিত।"

পরবর্তী কালে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে যে বই প্রকাশিত হয় তাতে এই পাণ্ডুলিপিকে মালঞ্চ উপন্যাসের নাট্যরূপ বলে উল্লেখ না করে সরাসরি 'মালঞ্চ নাটক' বলেই উল্লেখ করা হয়। বইয়ের আখ্যাপত্র এইরকম :

মালঞ্চ
নাটক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

সম্প্রতি যে-রচনাবলীর অষ্টাবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, তাতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'মালঞ্চ নাটক'-এর পুনর্মুদ্রণ ঘটেছে। এই রচনাবলীতে ২৯৮ পৃষ্ঠায় 'মালঞ্চ নাটকের পাণ্ডুলিপি'র একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন এই ছবি কিন্তু মালঞ্চ উপন্যাসেরই পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত—তার নাট্যরূপের পাণ্ডুলিপি থেকে নয়। রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার দ্বিতীয় খণ্ডে এই পৃষ্ঠারই চিত্র মুদ্রিত হয়েছিল। সেখানে ছবির নিচে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে 'মালঞ্চ উপন্যাস : পাণ্ডুলিপি ৪৫-এ পৃষ্ঠা ২৫'। এখানে আরও বলা প্রয়োজন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মালঞ্চের নাট্যরূপের পাণ্ডুলিপির 'অভিজ্ঞান সংখ্যা' ৪৫বি (১-৩)।

এইসব সংবাদ ও তথ্য উপস্থাপনের তাৎপর্য এইজন্য যে আমাদের জিজ্ঞাসা—রবীন্দ্রনাথ মালঞ্চ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকও রচনা করেছিলেন—এমন কথা যথার্থই বলা যায় কি না বা বলা আদৌ সঙ্গত কি না। আমাদের প্রশ্নটা এইভাবেও দাঁড়ায়—রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে 'মালঞ্চ নাটক' নামে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করা উচিত হয়েছে কিনা এবং সেই রচনাটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরিশিষ্টে বা সংযোজনে নয়—মূল রচনা রূপে রচনাবলীর একেবারে অভ্যন্তরে সংকলন করা সঠিক বা সঙ্গত হয়েছে কি না।

রবীন্দ্রভবনে এই নাটকের যে একটি মাত্র কপি আছে তা সুধীরচন্দ্র করের

হস্তাক্ষরে। লিপিকাল ১৩৪০। আবাঁধা তিনটি একসারসাইজ বুকে এটি লিখিত।

নির্মলকুমারী মহলানবিশকে ১৩৪০ ভাদ্র ১ (১৯৩৩ আগস্ট ১৭) তারিখে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"বিশেষ মনোযোগ করেই ছন্দ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছি। বিস্তর সময় লেগেছে, কেননা মনের গতি হয়েছে মন্থর, দেহের গতি হয়েছে শিথিল। তারপরে মালঞ্চের নাট্যকরণে কোমর বাঁধতে হোলো। কারণ কোমরের প্রতিবেশী জঠরের তাগিদ ছিল।"

যে সুধীরচন্দ্র করের হস্তাক্ষরে মালঞ্চের নাট্যরূপটি পাওয়া গিয়েছে, সেই কর মহাশয় ১৯৫১ সালে (১৩৫৮) তাঁর 'কবি-কথা' বইতে লেখেন—"মালঞ্চ উপন্যাসখানিকে নাট্যাকারে পরিবর্তিত করে শান্তিনিকেতনে একবার অভিনয় করবার কথা হয়। এমনিতেই সমস্ত বই কথাবার্তায় ভরানো। অধ্যায়গুলোকে দৃশ্য করে বর্ণনার অংশগুলোকে প্রযোজনার নির্দেশের মধ্যে ভরে দেওয়া গেল। কথাবার্তার অংশ প্রায় যথাযথই রইল ; এই করে তিন-চারখানা এক্সারসাইজ বুক-এ 'মালঞ্চে'র নাট্যরূপ দাঁড় করানো হল।"

সুধীরচন্দ্র করের এই মন্তব্য থেকে মনে হয়—যাঁর হস্তাক্ষরে মালঞ্চের নাট্য-রূপান্তরের একমাত্র কপিটি পাওয়া গিয়েছে, মূলত সেই রূপান্তর তাঁরই হাতের কাজ। 'দাঁড় করানো হল' বা 'ভরে দেওয়া গেল' কথাগুলির মধ্যে সেইরূপ ইঙ্গিতই স্পষ্ট।

সুধীরচন্দ্রের উদ্‌যোগে 'মালঞ্চের নাট্যরূপ দাঁড় করানো হল' ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নাটক কবির জীবদ্দশায় কখনো মঞ্চস্থ হয়নি। এইখানেই একটা বড়ো জিজ্ঞাসা থেকে যায়—কেন হয়নি? কেন ১৩৪০, অর্থাৎ ১৯৩৪ থেকে তাঁর তিরোধানের মধ্যে একবারও এর অভিনয় হল না? অথচ এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনায় বা তৎকর্তৃক অভিনীত হয়েছে তাঁর রচিত বিভিন্ন নাটক কম করেও চল্লিশবার।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের তথ্যপঞ্জির সহায়তায় রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়ের যে সংবাদ পাওয়া যায় তা থেকে সুস্পষ্টভাবেই এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে শেষ পর্যন্ত মালঞ্চ উপন্যাসের নাট্যরূপান্তরটি রবীন্দ্রনাথ কখনই আর মঞ্চস্থ করতে সম্মত হননি বা নিজে কখনো উৎসাহ বোধ করেন নি ; যদিও সুধীরচন্দ্র কর কৃত নাট্যরূপান্তরের পর সেই কপিতে কয়েকটি স্থলে রবীন্দ্রনাথ কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে দিয়েছিলেন স্বহস্তে।

'উপন্যাসের অধ্যায়ে-অধ্যায়ে দৃশ্যভাগ করে বর্ণনাস্থলগুলি ও প্রবেশ-প্রস্থানাদির মঞ্চোপযোগী নির্দেশগুলি বন্ধনীভুক্ত রেখে পাত্রপাত্রীর উক্তিসমূহ পর-পর বসিয়ে' নিলেই যে একটা গোটা উপন্যাস একটা সম্পূর্ণ নাটকে রূপান্তরিত হয়ে যায় না—এ-কথা রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত সুধীরচন্দ্র করের কপি দেখে বুঝেছিলেন। এবং বুঝেছিলেন বলেই মালঞ্চ নামে কোনো নাট্যগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করার কথা কখনো চিন্তা করেননি এবং কখনো তাকে মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থাও তিনি করেননি।

এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত উক্ত পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত সুধীরচন্দ্রের পত্রে। সুধীরচন্দ্র এই পত্রে জানিয়েছেন

—"গুরুদেব ১৩৪০ সনের গোড়ার দিকে দুখানা খাতায় 'মালঞ্চ'-উপন্যাসের মূল-খসড়া লিখে শেষ করেন। তখন আসে কপির পালা। সে-কপি আমি ৭টি খাতায় তৈরি করি। ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে অভিনয়ের কথা হয়। তিনি বলেন, উপন্যাসের অধ্যায়ে-অধ্যায়ে দৃশ্যভাগ করে বর্ণনাস্থলগুলি ও প্রবেশ-প্রস্থানাদির মঞ্চোপযোগী নির্দেশগুলি বন্ধনীভুক্ত রেখে পাত্রপাত্রীর উক্তিসমূহ পর পর বসিয়ে নিয়ে নাট্যরূপের একটা খসড়া করে দিতে। অতঃপর সেভাবেই কিছু কিছু করে পরিষ্কাররূপে লিখে নিয়ে তাঁকে দেখাতে থাকি এবং সেই অংশগুলি দেখে যেতে-যেতে গুরুদেবও আবশ্যকমতো স্থলে-স্থলে তাতে সংশোধন ও সংযোজন করে চলেন। দৃশ্য-বিভাগেরও তিনি দু-এক স্থলে পরিবর্তন করেন। যখন আমার যা প্রশ্ন জাগে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ-আলোচনায় তা মিটিয়ে নিই—এভাবেই লেখাটি সমাধা হয়।" এই পত্রের তারিখ ১৪ নভেম্বর ১৯৬৫।

মালঞ্চ উপন্যাসের 'নাট্যরূপের একটা খসড়া' তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত নাটকটি আর মঞ্চস্থ হয়নি।

কোন্ ঔপন্যাসিক চাইবেন তাঁর উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্র তাঁর নিজের লেখা নাটকে ক্ষতিগ্রস্ত হোক ; কিংবা সৃজনকর্মে উপন্যাসের তুলনায় নাটকটি দুর্বলতার লক্ষণাক্রান্ত হোক!

মালঞ্চ উপন্যাসের কাহিনী মোট দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায় ৫—১১=৭ পৃষ্ঠা ; দ্বিতীয় অধ্যায় ১২—২৩=১২ পৃষ্ঠা ; তৃতীয় অধ্যায় ২৪—২৯=৬ পৃষ্ঠা ; চতুর্থ অধ্যায় ৩০—৪৮=১৯ পৃষ্ঠা ; পঞ্চম অধ্যায় ৪৯—৬১=১৩ পৃষ্ঠা ; ষষ্ঠ অধ্যায় ৬২—৭৬=১৫ পৃষ্ঠা ; সপ্তম অধ্যায় ৭৭—৭৯=৩ পৃষ্ঠা ; অষ্টম অধ্যায় ৮০—৮২=৩ পৃষ্ঠা ; নবম অধ্যায় ৮৩—৮৫=৩ পৃষ্ঠা এবং দশম বা শেষ অধ্যায় ৮৬—৯৬=১১ পৃষ্ঠা। উপন্যাসের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২।

যদিও এ-কথা ঠিক যে মালঞ্চ উপন্যাসটি মুখ্যত সংলাপনির্ভর ; কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়টি হল—এই উপন্যাসের প্রথম যে অধ্যায়টি—৯৫ বাক্যের ১৫ অনুচ্ছেদের সেই সূচনা অধ্যায়টি সম্পূর্ণ সংলাপবর্জিত, একান্তভাবেই লেখকের কথা। বস্তুতপক্ষে সংলাপধর্মী এই ছোট উপন্যাসে কাহিনীর মূল ভিতটি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন প্রথম অধ্যায়ে। পাঠক হিসাবে কেউ ভাবতেও পারেন না প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ বর্জন করে মালঞ্চ উপন্যাস আস্বাদনের কথা। প্রথম অধ্যায়টি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে যেমন মালঞ্চ উপন্যাসের কথা ভাবা যায় না ; তেমনই ওই প্রথম অধ্যায়টি বইয়ের বাঁধাই থেকে খুলে ফেললেই কি একটা উপন্যাস একটা নাট্যগ্রন্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়? এখানে বলে নেওয়া অবশ্য উচিত উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের ছয়টি বাক্য নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের মঞ্চ-নির্দেশনা রূপে গৃহীত।

উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঠকের কাছে কোন্ কথাগুলি কাহিনীর সূচনাতেই শুনিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন নীরজা ও আদিত্যের দাম্পত্যজীবনের উজ্জ্বল মধুর অন্তরঙ্গ এবং অনাবিল আনন্দ ও সুখৈশ্বর্যের অতীত

দিনগুলির কথা শুনিয়ে রাখতে।

বলেছেন, "বিবাহের পর দশটা বছর একটানা চলে গেল অবিমিশ্র সুখে। মনে মনে ঈর্ষা করেছে সখীরা ; মনে করেছে, ওর যা বাজারদর তার চেয়ে ও অনেক বেশি পেয়েছে। পুরুষ বন্ধুরা আদিত্যকে বলেছে 'লাকি ডগ্'।"

বলেছেন, "নীরজার ভালবাসায় ছিল প্রচণ্ড জেদ। সেই ভালবাসার বিরুদ্ধে বিধাতারও হস্তক্ষেপ তার কল্পনার অতীত।"

আর জানিয়েছেন—

"নীরজার সন্তান হবার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের আশ্রিত গণেশের ছেলেটাকে নিয়ে যখন নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন চলেছে, আর ছেলেটা যখন তার অশান্ত অভিঘাত আর সইতে পারছে না, এমন সময় ঘটল সন্তান-সম্ভাবনা। ভিতরে ভিতরে মাতৃহৃদয় উঠল ভরে, ভাবীকালের দিগন্ত উঠল নবজীবনের প্রভাত-আভায় রক্তিম হয়ে, গাছের তলায় বসে বসে আগন্তুকের জন্যে নানা অলংকরণে নীরজা লাগল সেলাইয়ের কাজে।

অবশেষে এল প্রসবের সময়। ধাত্রী বুঝতে পারলে আসন্ন সংকট। আদিত্য এত বেশি অস্থির হয়ে পড়ল যে ডাক্তার ভর্ৎসনা করে তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখলে। অস্ত্রাঘাত করতে হল, শিশুকে মেরে জননীকে বাঁচালে। তারপর থেকে নীরজা আর উঠতে পারলে না। বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো তার স্বল্পরক্ত দেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে। প্রাণশক্তির অজস্রতা একেবারেই হল নিঃস্ব।"

ঔপন্যাসিক আরও কয়েকটি কথা বলেছেন নীরজা প্রসঙ্গে—।

বলেছেন—

"সকলের চেয়ে তাকে বাজল যখন দেখলে বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্যে আদিত্যের দূরসম্পর্কীয় বোন সরলাকে আনাতে হয়েছে। খোলা জানলা থেকে যখনি সে দেখে অভ্র ও রেশমের কাজকরা একটা টোকা মাথায় সরলা বাগানের মালীদের খাটিয়ে বেড়াচ্ছে তখন নিজের অকর্মণ্য হাত-পাগুলোকে সহ্য করতে পারত না। অথচ সুস্থ অবস্থায় এই সরলাকেই প্রত্যেক ঋতুতে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে নতুন চারা রোপণের উৎসবে। ভোরবেলা থেকে কাজ চলত। তার পরে ঝিলে সাঁতার কেটে স্নান, তার পরে গাছের তলায় কলাপাতায় খাওয়া, একটা গ্রামোফোনে বাজত দিশি-বিদেশি সংগীত। মালীদের জুটত দই চিঁড়ে সন্দেশ। তেঁতুলতলা থেকে তাদের কলরব শোনা যেত। ক্রমে বেলা আসত নেমে, ঝিলের জল উঠত অপরাহ্নের বাতাসে শিউরিয়ে, পাখি ডাকত বকুলের ডালে, আনন্দময় ক্লান্তিতে হত দিনের অবসান।"

প্রথম অধ্যায়ের চতুর্দশ অনুচ্ছেদে নীরজা সম্পর্কে উপন্যাসিকের শেষ বক্তব্যটি হল—

"যেমন আজকালকার দুর্বল শরীরটা ওর অপরিচিত তেমনি এখনকার তীব্র নীরস স্বভাবটাও ওর চেনা স্বভাব নয়। সে স্বভাবের কোনো দাক্ষিণ্য নেই। এক-একবার এই

দারিদ্র্য ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, লজ্জা জাগে মনে, তবু কোনমতে সামলাতে পারে না। ভয় হয়, আদিত্যের কাছে এই হীনতা ধরা পড়েছে বুঝি ; কোনদিন হয়তো সে প্রত্যক্ষ দেখবে নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো, ভদ্র প্রয়োজনের অযোগ্য।"

উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের এইসব সংবাদ ও মন্তব্য আখ্যায়িকার একেবারে গোড়া থেকেই পাঠকের মনকে সন্তানহারা রোগশয্যাশায়িনী শীর্ণ বেদনাকাতর বিষণ্ণ নীরজার প্রতি গভীর মমতায় ও সহানুভূতিতে ভরিয়ে তোলে। পাঠকের মনকে এই অনিবার্য সহানুভূতিতে সঞ্চারিত ও প্রভাবিত করেই আখ্যায়িকার সূত্রপাত। প্রাথমিক এইসব সংবাদসূত্রগুলির অনেকগুলি কথাই মালঞ্চ নাটকে অনুপস্থিত।

মালঞ্চ নাটক তিন অঙ্কে বিন্যস্ত। প্রথম অঙ্কে দুটি দৃশ্য। অঙ্ক ১ দৃশ্য ১ পৃ ৫—১৭ ; অঙ্ক ১ দৃশ্য ২ পৃ ১৮—৪৮। দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য ও একটি দৃশ্যান্তর। অঙ্ক ২ দৃশ্য ১ পৃ ৪৯—৬৪ ; অঙ্ক ২ দৃশ্য ২ পৃ ৬৪—৮১ ; দৃশ্যান্তর পৃ ৮১—৮৮। তৃতীয় অঙ্কে একটিই দৃশ্য পৃ ৮৯—১০৫।

মুখ্যত উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায় নাটকে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। উপন্যাসের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায় নাটকে প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য। উপন্যাসের পঞ্চম অধ্যায় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। উপন্যাসের ষষ্ঠ অধ্যায় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য। উপন্যাসের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় নাটকে 'দৃশ্যান্তর' বা বলা যায় তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য। উপন্যাসের শেষ দুই অধ্যায় নয় ও দশ অধ্যায় নাটকে তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য। পূর্বেই বলা হয়েছে তৃতীয় অঙ্কে একটিই দৃশ্য অর্থাৎ এই দৃশ্যের শেষেই নাটকের সমাপ্তি।

মালঞ্চ নাটকের পাঠক একবারের জন্যও জানতে পারে না আদিত্যের স্ত্রী নীরজা কেন অসুস্থ। কোন্ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে রোগশয্যায় শায়িত? নাটকে কোথাও তার উল্লেখমাত্র নেই। সে যক্ষায় টাইফয়েডে ম্যালেরিয়ায় অসুস্থ না আর কিছুতে, নাটকে কোথাও তার ইঙ্গিত নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে পাঠকের পক্ষে একান্তই কি জানার প্রয়োজন কীসের কারণে নীরজা রোগশয্যায় শায়িত? রোগিণীর অসুখের কোনো একটা নাম জেনে পাঠকের উপকারটা কী? হ্যাঁ, সাধারণভাবে পাঠকের কৌতূহল, একান্তই অনাবশ্যক উপন্যাসের কোনো রোগাক্রান্ত চরিত্রের প্রকৃত অসুখটা কী? সে উৎসাহ চিকিৎসকের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে কিন্তু সাহিত্যের পাঠকের পক্ষে নয়। কিন্তু নীরজা যে কারণে অসুস্থ তা পাঠকের জানা প্রয়োজন ছিল। কারণ নীরজা তো কোনো সাধারণ টাইফয়েড ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত অসুস্থ রোগী নয় ; তার রোগশয্যা যে সম্পূর্ণ ভিন্নতর কারণে। আখ্যায়িকায় তার চরিত্রটিকে যথোপযুক্তভাবে বুঝতে গেলে তার বেদনা যন্ত্রণা হতাশা বিষণ্ণতা ও দুঃখ যথাযথভাবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে গেলে তার অসুস্থতার কারণ জানা পাঠকের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এ-কথা রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার সূচনাতেই অনুভব করেছিলেন এবং তাই উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই সেই সংবাদ দুটি অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে

বিবৃত করে গিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে : ক) দশ বছরের মত দাম্পত্যজীবনে তাদের সন্তান হয়নি ; খ) তার যে আর কখনো সন্তান হবে—সে আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল ; গ) শেষ পর্যন্ত সে সন্তানসম্ভবা হয়—ভিতরে ভিতরে মাতৃহৃদয় ওঠে ভরে ; ঘ) প্রসবকালে আকস্মিক বিপদ ঘনিয়ে এলে অস্ত্রাঘাত করে সন্তানকে মেরে মাকে বাঁচানো হয়।

নীরজা সম্পর্কে এই সমস্ত অত্যাবশ্যক জরুরি সংবাদ মালঞ্চ নাটকের পাঠকের কাছে সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। এই সংবাদ শুধু নীরজাকে নয় নীরজার স্বামী আদিত্যকে বোঝার পক্ষেও প্রয়োজনীয়।

রোগশয্যায় নীরজার ব্যথা সব চেয়ে বেশি করে বেজেছে সেইখানে যখন সে দেখে বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্য আদিত্যর দূরসম্পর্কীয় বোন সরলাকে আনাতে হয়েছে। যে নীরজার কাছে গত দশ বছর স্বামী আর বাগানের ভালবাসা একাকার হয়ে গেছে, তার অসুস্থতার অবকাশে সেই বাগান সরলার কর্মোদ্যোগে চলে যাচ্ছে—নীরজা তা সহ্য করতে পারে না। উপন্যাসের গোড়ায় ওদের প্রিয় 'ডলি' কুকুরটার মৃত্যু নীরজাকে অসম্ভবভাবে কাতর ও বিচলিত করেছিল। তারপরে হারালো মাতৃহৃদয় থেকে বহু বর্ষের প্রতীক্ষায় সমাসন্ন শিশুসন্তানকে।

তারপরে বুঝি হারাতে বসেছে এবার তার এতদিনের নিজের হাতে রচনা করা মালঞ্চকে। সরলার প্রতি তার প্রাথমিক অভিমানের কারণ সেইখানেই ; বুঝি তার মালঞ্চ নীরজার হাত থেকে কাড়িয়ে নিতে এসেছে সরলা। তারপর যখন নীরজা ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে দেখলে বাগানের অধিকার ও কর্তৃত্ব তার অনুপস্থিতিতে একটু একটু করে চলে যাচ্ছে সরলার হাতের মধ্যে তখন নীরজা তার মালঞ্চকে ছেড়ে নূতনতর বিপদের সম্ভাবনার আশঙ্কায় সরলার হাত থেকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইলো তার স্বামী পুষ্প-ব্যবসায়ী আদিত্যকে।

যার স্বভাবে এতদিন ছিল শুধুই ভালবাসা আর দাক্ষিণ্য তার স্বভাবে আজ এই বিশ্রী সংকীর্ণ কৃপণতা কেন? মালঞ্চ নাটকে সেই কৃপণস্বভাবা নীরজাকেই মূলত পাঠক লক্ষ্য করে ; কিন্তু উপন্যাসে নীরজার স্বভাবের দাক্ষিণ্যের দিকটি একান্ত উজাড় করে দেখানো হয়েছে।

নাটকে হলা মালীর প্রতি নীরজার যে দাক্ষিণ্য তার তাৎপর্য ভিন্ন।

নতুন মনিব সরলার প্রতি হলার মনকে বিরূপ করে তোলার জন্যই যেন হলাকে সাদরে এই উৎকোচ প্রদান। এ যে প্রকৃত সরল প্রত্যাশাবিহীন অকপট দাক্ষিণ্য নয় তা পাঠকের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। এই বিক্ষত সংকীর্ণ চরিত্র তো নীরজার প্রকৃত স্বভাব নয়, আসল চরিত্র নয়। নাটকে নয়, উপন্যাসের পাঠক নীরজার চরিত্রের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে পরিচিত। তাই নীরজার স্বভাবে রূপান্তরও উপন্যাসের পাঠক লক্ষ্য করে করুণার সঙ্গে—নীরজা নিজেও তা লক্ষ্য করে তার নিজের দিকে তাকিয়ে।

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই দেখিয়েছেন নীরজার ভালবাসা কত প্রসারিত, তার দাক্ষিণ্য ও স্বভাব কত উদার ও বিস্তৃত। নীরজার ভালবাসা শুধু যে তার স্বামী আদিত্য, বা

ফুলের বাগান, বা 'ডলি' কুকুর, বা গণেশের ছোট ছেলেটাই পেয়েছে—তা তো নয় ; বাগানের শালিখ কাঠাবিড়ালির দলও নীরজার প্রীতি-প্রসাদ থেকে কখনো বঞ্চিত হয়নি। তার প্রসন্ন প্রীতি ও মধুর ঔদার্য থেকে বঞ্চিত হয়নি তাদের বন্ধুবান্ধবেরাও। যথেচ্ছ উপহার নিয়ে গেছে টবসুদ্ধ বেলফুলের গাছ। বন্ধুদের বিদায়কালে নীরজা ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ ম্যাগনোলিয়া কারনেশন—তার সঙ্গে পেঁপে, কাগজি লেবু, কয়েৎবেল—ওদের বাগানের ডাকসাইটে কয়েৎবেল। আর উপন্যাসের সূচনায় আদিত্যের দূরসম্পর্কীয় বোন সরলার প্রতি নীরজার অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসার নির্মল চিত্রটি বিস্মৃত হবার নয়।

নীরজার স্বভাব ও চরিত্রের বড় দিকটা সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত থেকে যায় মালঞ্চ নাটকের মধ্যে—যা উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে ঔপন্যাসিক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

নাটকে নীরজার চরিত্রের এই দিকটা শুধু যে পাঠকের কাছেই অজ্ঞাত থেকে যায় যার ফলে মূল চরিত্রটাই খণ্ডিত হয়ে যায় তাই নয় ; সরলার কাছেও নীরজা অনেকটা অপরিচিত রয়ে যায়। একজন নারীর প্রতি অপর এক নারীর স্বাভাবিক প্রত্যাশিত সহানুভূতি ও করুণা থেকে নীরজা বঞ্চিত হয়। এর কারণে নাট্যগ্রন্থে সরলাও কোনোভাবে জানার সুযোগ পায়নি কী কারণে নীরজা আজ রোগশয্যায় শায়িত এবং মৃত্যুপথযাত্রী। কাহিনীর একই জায়গা থেকে নাটক ও উপন্যাসের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি :

মালঞ্চ নাটক

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

ফুলটা অবজ্ঞার সঙ্গে ঠেলে দিয়ে

জানো মার্কেটে এ ফুলের দাম কত? পাঠিয়ে দাও সেখানে, মিছে নষ্ট করবার দরকার কী। জানো এ ফুলের নাম?

সরলা

এমারিলিস।

নীরজা

ভারি তো জানো তুমি। ওর নাম গ্র্যান্ডিফ্লোরা।

সরলা

তা হবে।

নীরজা

তা হবে মানে কী? নিশ্চয়ই তাই। আমি জানি নে?

ধীরে ধীরে সরলা প্রস্থানোদ্যত—

শুনে যাও। কী করছিলে সমস্ত সকাল, কোথায় ছিলে?

সরলা

অর্কিডের ঘরে।

নীরজা

অর্কিডের ঘরে তোমার ঘন ঘন যাবার এত কী দরকার?

সরলা

পুরনো অর্কিড চিরে ভাগ করে নতুন অর্কিড করবার জন্য আদিৎদা আমাকে বলে গিয়েছিলেন।

নীরজা

আনাড়ির মতো সব নষ্ট করবে তুমি। আমি নিজের হাতে হলা মালীকে তৈরি করে শিখিয়েছি, তাকে হুকুম করলে সে কি পারত না? দাও বন্ধ করে দাও ঐ জানলা।

এবার এই অংশে উপন্যাসের পাঠে কী ছিল একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে :

মালঞ্চ উপন্যাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

নীরজা ফুলটা অবজ্ঞার সঙ্গে ঠেলে দিয়ে বললে, "জান মার্কেটে এ ফুলের দাম কত? পাঠিয়ে দাও সেখানে, মিছে নষ্ট করবার দরকার কী?'

বলতে বলতে গলা ভার হয়ে এল।

সরলা বুঝলে ব্যাপারখানা। বুঝলে জবাব দিতে গেলে আক্ষেপের বেগ বাড়বে বৈ কমবে না। চুপ করে রইল দাঁড়িয়ে। একটু পরে খামখা নীরজা প্রশ্ন করলে, "জান এ ফুলের নাম?"

বললেই হত 'জানি নে', কিন্তু বোধ করি অভিমানে ঘা লাগল ; বললে "এমারিলিস।"

নীরজা অন্যায় উষ্মার সঙ্গে ধমক দিলে, "ভারি তো জান তুমি! ওর নাম গ্রাণ্ডিফ্লোরা।"

সরলা মৃদু স্বরে বললে, "তা হবে।"

"তা হবে মানে কী? নিশ্চয়ই তাই। বলতে চাও আমি জানি নে?"

সরলা জানত নীরজা জেনেশুনেই ভুল নামটা দিয়ে প্রতিবাদ করলে, অন্যকে জ্বালিয়ে নিজের জ্বালা উপশম করবার জন্যে। নীরবে হার মেনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল; নীরজা ফিরে ডাকল, "শুনে যাও। কী করছিলে সমস্ত সকাল, কোথায় ছিলে?"

"অর্‌কিডের ঘরে।"

নীরজা উত্তেজিত হয়ে বললে, "অর্‌কিডের ঘরে তোমার ঘন ঘন যাবার এত কী দরকার?"

"পুরনো অর্‌কিড চিরে ভাগ করে নতুন অর্‌কিড করবার জন্যে আদিৎদা আমাকে বলে গিয়েছিলেন।"

নীরজা বলে উঠল ধমক-দেওয়ার সুরে, "আনাড়ির মতো সব নষ্ট করবে তুমি।

আমি নিজের হাতে হলা মালীকে তৈরি করে শিখিয়েছি, তাকে হুকুম করলে সে কি পারত না?”

এর উপর জবাব চলে না। এর অকপট উত্তরটা ছিল এই যে, নীরজার হাতে হলা মালীর কাজ চলত ভালোই, কিন্তু সরলার হাতে একেবারেই চলে না। এমন-কি, ওকে সে অপমান করে ঔদাসীন্য দেখিয়ে।

মালী এটা বুঝে নিয়েছিল যে, এ আমলে ঠিকমত কাজ না করলেই ও আমলের মনিব হবেন খুশি। এ যেন কলেজ বয়কট করে পাশ না করার দামটাই ডিগ্রি পাওয়ার চেয়ে বড় হয়েছে।

সরলা রাগ করতে পারত, কিন্তু রাগ করলে না। সে বোঝে বউদিদির বুকের ভিতরটা টন্‌টন্‌ করছে। নিঃসন্তান মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়েছে যে বাগান, দশ বছর পরে আজ এত কাছে আছে, তবু এই বাগানের থেকে নির্বাসন! চোখের সামনেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ!

নীরজা বললে, “দাও, বন্ধ করে দাও ঐ জানলা।”

এই দুই অংশের মধ্যে উপন্যাসে যে সম্পূর্ণ ছবিটা আছে নাটকে তা নেই। তাই নাটকের পাঠক আদৌ জানতে পারে না সরলার হাত দিয়ে আদিত্য নীরজার কাছে যে ফুলটি পাঠিয়েছিল তার প্রকৃত নাম সত্যই এমারিলিস না গ্রাণ্ডিফ্লোরা। নাটক পড়ে মনে হতে পারে সরলাই বুঝি ভুল বলেছে—ফুলের সঠিক নামটি তার হয়তো ঠিক জানা ছিল না। তাছাড়া নীরজা যে-জোরের সঙ্গে বলেছে, এবং তার নিজের বাগান সম্পর্কে যেহেতু তার দশ বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, তাতে তার কথাটাই সঠিক বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ফুলের নাম নিয়ে সরলার সঙ্গে নীরজার কথোপকথনের মধ্যে নীরজার মনের মধ্যে কী মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে—এবং সরলার মনের মধ্যেও ; তার কোন রহস্যই পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয় না। কিন্তু নীরজার মনের গভীরে কী যন্ত্রণা কাজ করছে উপন্যাসের পাঠকের কাছে তা অস্পষ্ট নয়। এবং উপন্যাসে সরলার কাছেও ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট—কেন নীরজা ইচ্ছাকৃতভাবে এমারিলিস ফুলটিকে এমারিলিস না বলে জোর দিয়ে গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা বলছে। সেটা যদি সরলা না বোঝে এবং পাঠকও যদি এই সংলাপের অন্তরালে নীরজার নিহিত অন্তর্জ্বালাটুকু অনুধাবন না করতে পারে তো ফুল নিয়ে পরস্পরের এই সংলাপ-অংশটুকু একেবারেই তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। উপন্যাসের ব্যাখ্যাংশগুলি বর্জন করে দেওয়ার ফলে মালঞ্চ নাটকে সেটাই ঘটেছে।

মালঞ্চ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে নীরজাকে উপস্থাপিত করেছেন মালঞ্চ নাটকে সে-নীরজাকে সবটা খুঁজে পাওয়া যায় না। রোগশয্যায় কাতর নীরজার দ্বন্দ্ব, নিজের বর্তমান এই স্বভাবের দিকে তাকিয়ে তার অন্তরের অসহ্য বেদনানুভূতি ও হাহাকার উপন্যাসে তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সরলার প্রতি তার নির্মম কঠিন বিরূপতা আবার নিজের এই অস্বাভাবিক আচরণের জন্য নিজের কাছেই ক্ষতবিক্ষত হওয়া—উপন্যাসের পাঠকের কাছে নীরজাকে জীবন্ত বাস্তব গভীর সহানুভূতিযোগ্য এক আশ্চর্য করুণ রমণী

চরিত্র করে তুলেছে। কিন্তু মালঞ্চ নাটকে সেই চরিত্র অনেকটাই অস্পষ্ট, ফলে পাঠকের সহানুভূতি ও আকর্ষণ থেকেও সে চরিত্র অনেকটাই বঞ্চিত হয় বাধ্য হয়েই।

নাটক ও উপন্যাস থেকে এ প্রসঙ্গে একটি অংশ তুলে ধরছি।

প্রথমে নাটক থেকে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের একেবারে শেষাংশ :

ঘটি টেবিলে রেখে অন্য ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে সাজিয়ে দিলে [(হলা মালী)]। যাবার মুখো হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে [(নীরজাকে বললে)]—

আমার ভাগনীর বিয়েতে সেই বাজুবন্ধের কথাটা ভুলো না বউদিদি। পিতলের জিনিস যদি দিই তাতে তোমারই নিন্দে হবে।

নীরজা

আচ্ছা আচ্ছা, "স্যাক্‌রাকে ফরমাশ দেব, তুই এখন যা।" [হলার প্রস্থান]।

নাটকে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এখানেই শেষ।

এবার উপন্যাস থেকে এই অংশটি উদ্ধৃত করছি :

ঘটি টিপাইয়ের উপর রেখে অন্য ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে সাজাতে লাগল [হলা মালী]। অবশেষে যাবার মুখো হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে,

"তোমাকে জানিয়েছি, আমার ভাগনীর বিয়ে। বাজুবন্ধর কথা ভুলো না বউদিদি। পিতলের গয়না যদি দিই তোমারই নিন্দে হবে। এতবড়ো ঘরের মালী, তারই ঘরে বিয়ে, দেশসুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে।"

নীরজা বললে, "আচ্ছা, তোর ভয় নেই, তুই এখন যা।"

হলা চলে গেল। নীরজা হঠাৎ পাশ ফিরে বালিশে মাথা রেখে গুমরে উঠে বলে উঠল, "রোশ্‌নি, রোশ্‌নি, আমি ছোটো হয়ে গেছি, ঐ হলা মালীর মতোই হয়েছে আমার মন।"

আয়া বললে, "ও কী বলছ খোঁখী, ছি ছি !"

নীরজা আপনিই বলতে লাগল, "আমার পোড়া কপাল আমাকে বাইরে থেকে নামিয়ে দিয়েছে, আবার ভিতর থেকে নামিয়ে দিলে কেন? আমি কি জানি নে আমাকে হলা আজ কী চোখে দেখছে! আমার কাছে লাগালাগি করে হাসতে হাসতে বকশিশ নিয়ে চলে গেল। ওকে ডেকে দে। খুব করে ওকে ধম্‌কে দেব, ওর শয়তানি ঘোচাতে হবে।"

আয়া যখন হলাকে ডাকবার জন্যে উঠল নীরজা বললে, "থাক্ থাক্, আজ থাক্।"

এখানেই উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। নীরজার নিজ আচরণের জন্য এই আত্মধিক্কার, আত্মদর্শন, এই আত্মবিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ। নীরজা নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ

বুঝেও কিরূপ অনিবার্যভাবে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, সচেতন হয়েও আত্মগ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না, এবং তার জন্যেও আবার মর্মান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করছে—তা উপন্যাসে বিধৃত। নীরজার চরিত্রের এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করবার জন্যই উপন্যাসে হলা মালীর প্রসঙ্গের অবতারণা। নাটকে নীরজার এই আত্মসমালোচনার অনুপস্থিতি হলা চরিত্রের ক্ষণিক আবির্ভাব ও বিদায়কেও অনেকটাই তাৎপর্যহীন ও নিরর্থক করে তুলেছে।

এই নাটকে কিছু গঠনগত দুর্বলতাও আছে। একটা উপন্যাসকে কিছু ছেঁটে ও কিছু জুড়ে দিলেই যে একটা সার্থক নাটকে রূপান্তরিত করা যায় না—রবীন্দ্রনাথ মালঞ্চ প্রসঙ্গে নিশ্চয় তা বুঝেছিলেন বলে মন হয়। উপন্যাসের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখি নীরজাকে লেখা আদিত্যের দীর্ঘ চিঠিখানা রমেনের হাতে তুলে দেয় নীরজা। নীরজা 'কোন কথা না বলে একখানা চিঠি দিলে রমেনের হাতে। চিঠিখানা আদিত্যের লেখা। তাতে আছে—' এইটুকু বলে ঔপন্যাসিক সমগ্র চিঠিটি উদ্ধৃত করেছেন। দু পাতা জুড়ে এই দীর্ঘ চিঠি উদ্ধৃতির শেষে বলা হয়েছে—রমেন চিঠিখানা পড়লে দুইবার। পড়ে চুপ করে রইল। নীরজা ব্যাকুলস্বরে বললে, "কিছু একটা বলো ঠাকুরপো।" রমেন তবু কিছু উত্তর দিলে না।

নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে এই স্থানে আছে—নীরজা 'কোনো কথা না বলে একখানা চিঠি দিলে রমেনের হাতে। রমেন পত্রখানি পড়তে লাগল—। এর পর স্ত্রীকে লেখা আদিত্যের দীর্ঘ চিঠিটি উদ্ধৃত। চিঠির শেষে বলা হয়েছে 'চিঠি পড়া শেষ হলে রমেন চুপ করে রইল। নীরজা (ব্যাকুলভাবে) : কিছু একটা বলো ঠাকুরপো। রমেন নিরুত্তর। চিঠিটার শেষ দিকে ছিল আদিত্যের সেই নির্মম বাক্যগুলি : "তোমার সঙ্গে কখনো যাতে ওর দেখা না হয় সে চেষ্টা রইল মনে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হবার নয় সে কথা আজ যেমন বুঝেছি এমন এর আগে কখনো বুঝি নি। সব কথা বলতে পারলুম না, আমার দুঃখ আজ কথার অতীত হয়ে গেছে। যদি অনুমানে বুঝতে পার তো পারলে, নইলে জীবনে এই প্রথম আমার বেদনা, যা রইল তোমার কাছে অব্যক্ত।"

স্ত্রীকে লেখা স্বামীর এমনতর একটা দীর্ঘ চিঠি কি মঞ্চে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে অপরের পক্ষে পড়া সম্ভব মৃত্যুশয্যাশায়িনী নীরজারই সম্মুখে? অথচ এই চিঠি জোরে উচ্চকণ্ঠে না পড়লে রঙ্গমঞ্চের দর্শক এই চিঠির বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায় না। অথচ নীরজার সামনে দাঁড়িয়ে আদিত্যের এই নির্মম চিঠিখানি রমেনের পক্ষে জোরে জোরে পাঠ করা যে একান্তই বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক তা কাউকেই বলে দিতে হয় না। উপন্যাসে নীরজার হাত থেকে চিঠিখানি পেয়ে রমেন পর-পর দুবার পড়ে এবং পড়েও অনেকক্ষণ চুপ করেই থাকে। রমেনের এই দীর্ঘ নীরবতার দিকে তাকিয়ে ব্যাকুলস্বরে নীরজা বলে—কিছু একটা বলো ঠাকুরপো। কিন্তু তাতেও রমেন সম্পূর্ণ নির্বাক—কোনো উত্তর দিতে পারে না—স্তব্ধ হয়েই থাকে।

কিন্তু নাটকে এই চিঠি রমেনের পক্ষে উপন্যাসের মত মনে-মনে পড়া তো সম্ভব

নয়। আর নাটকে এই দীর্ঘ পত্র যদি রমেনকে মনে মনে পড়তে হয় তো রঙ্গমঞ্চকে মনে হবে যেন মিনিট দুই-আড়াই নীরবতা পালন চলেছে! আর আখ্যানের প্রয়োজনে দর্শকের পক্ষেও জানা একান্ত আবশ্যক পত্রে আদিত্য নীরজাকে এই সংকট মুহূর্তে কী লিখেছে। সুতরাং দর্শকদের জ্ঞাতার্থে নীরজার সামনেই রমেনকে এই চিঠি সজোরে পড়তে হয়। কিন্তু এটা যে একেবারেই শিল্পসম্মত ব্যাপার হল না—তা সুধীরচন্দ্র কর মহাশয় না বুঝলেও রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় অনুভব করেছিলেন।

মালঞ্চ উপন্যাসে শুধু নীরজা আদিত্য সরলা রোশ্‌নি হলা মালী ও ভৃত্যরা নয়—ওদের ফুলের সেই বাগানটির স্বতন্ত্র একটি নিজস্ব ভূমিকা আছে। আর নাটক হল দৃশ্যকাব্য। সেখানে ওই বাগানটিকেই আড়ালে রেখে মালঞ্চ নাটকখানি কতখানি মঞ্চ-সফল হতে পারে? বারে বারেই এসেছে কত ফুল কত ফল কত গাছগাছালির প্রসঙ্গ। উপন্যাসের শুরুতেই নীরজার ঘরের পুবের জানালা দিয়ে দেখা যায় নিচের বাগানে অরকিডের ঘর, ছিটে বেড়ায় তৈরি, বেড়ার গায়ে গায়ে অপরাজিতার লতা। অদূরে ঝিলের ধারে পাম্প চলছে ; জল কুল্‌ কুল্‌ করে বয়ে যায় নালায় নালায়, ফুল গাছের কেয়ারির ধারে ধারে। গন্ধনিবিড় আমবাগানে কোকিল ডাকছে মরিয়া হয়ে। আর বাগানের পশ্চিম ধারে প্রাচীন মহানিমগাছ। তারই জুড়ি আরো একটা নিমগাছ ছিল ; সেটা কোনো সময় জীর্ণ হয়ে পড়ে গেছে ; তারই গুঁড়িটাকে সমান করে কেটে বানানো হয়েছে একটা ছোটো টেবিল। ভোরবেলায় সেখানে বসেই চলত আদিত্য নীরজার সকালের চা খাওয়া—গাছের ফাঁকে ফাঁকে সবুজডালে-ছাঁকা রৌদ্র এসে পড়ত তাদের পায়ের কাছে ; শালিখ-কাঠবিড়ালি হাজির হত প্রসাদপ্রার্থী। নীরজা আদিত্যের বাগানে কী কম ফুলের মেলা? ওদের বাগানের ডালিয়ার আয়তন দেখে বন্ধুদের হিংসে হয়। এমন গাঁদা হত যে কোনো কোনো আনাড়ি জিজ্ঞাসা করত ওগুলো কি, সূর্যমুখী? একদিকে ফুলের বাগান, একদিকে ফলের বাগান, একদিকে সব্‌জির বাগান। ফলের গাছের মধ্যে কী নেই? নারকেল, পেঁপে , কাগজি লেবু, বাতাবী, কলম্বা। নারকেলের সঙ্গে আছে সুপুরি গাছের সারি। আর আছে ওদের বাগানের ডাকসাইটে কয়েৎবেল। আর ফুল-বাগানে হাজার ফুলের মধ্যে আছে গোলাপ গন্ধরাজ বেল রঙিন লিলি এমারিলিস ল্যাবার্নাম নাগকেশর ন্যাস্‌টাশিয়াম পেট্যুনিয়া ; তাছাড়া আছে ঋতুতে ঋতুতে ফুল, আছে বটলপাম কাঁটাগাছ ঝাউগাছের সারি এবং আরো কত কী! তাছাড়া বাগানের মধ্যে আছে সবুজ লন, আছে ঘাট বাঁধানো দিঘি। দিঘির ওপারে চালতা গাছ এপারে বাসন্তী গাছ। চাঁদ উঠলে চালতা গাছের পাতার ছায়া পড়ে ঝিলের জলে। এই সবকিছুকে বাদ দিয়ে রঙ্গমঞ্চে নাটক-মালঞ্চ যে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না তাও নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত অনুমান করেছিলেন বলেই মনে হয়।

আমাদের আলোচনার শেষে আমরা এই প্রশ্নটি উত্থাপন করতে চাই—যে নাটক রবীন্দ্রনাথ রচিত নয়, শান্তিনিকেতনে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস অবলম্বনে যার নাট্যরূপান্তর সুধীরচন্দ্র কর-কৃত এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সুধীরচন্দ্র করের

কপিতে অল্পবিস্তর সংশোধিত, যে নাটক রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কখনো অভিনীত হয়নি, যে নাটক রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কোনো সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় নি, এবং যে নাটক রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি কিংবা যে পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথের নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত নয় এবং অন্যের হস্তাক্ষরের যে-পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথের নিজ রচনা বলে কোনো অনুমোদন নেই—সেইরূপ একটি পাণ্ডুলিপিকে ভিত্তি করে মালঞ্চ নাটকটিকে রবীন্দ্র-রচনা বলে নির্দেশ করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে গভীর সংশয় থেকে যায়। অথচ এই নাটক বিশ্বভারতী প্রকাশনা থেকে রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটক বলেই প্রকাশিত। সম্প্রতি রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টাবিংশ খণ্ডে রবীন্দ্র-রচনা রূপে এই নাটক সংকলিত হয়ে যাওয়ায় প্রশ্নটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেল। এই নাটকের যা কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি দুর্বলতা অসঙ্গতি তার দায়ভার তো এখন রবীন্দ্রনাথকেই বহন করতে হবে।

আজ তিনটি দশক পেরিয়ে এসে এখন মনে হচ্ছে কেন সেদিন কৌতূহলবশে মালঞ্চ নাটকের অস্তিত্বের সন্ধানে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক সমীপেষু বিভাগে 'মালঞ্চ উপন্যাসের নাট্যরূপ' শিরোনামে পত্র প্রেরণ করেছিলাম। জীবনে অনেক ভুল করেছি, এটাও তার একটা।

রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন

উভয়ে, রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সেন পরস্পরের কাছে এসেছিলেন ১৯০৮ সালে। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন ১৯০৮ সালের জুন-জুলাই মাসে। এই ১৯০৮ থেকেই রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে প্রধান সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত মনস্বী আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০)।[১] ক্ষিতিমোহন রীবন্দ্রনাথের চেয়ে ছিলেন কুড়ি বছরের ছোট ; রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের কুড়ি বছর পর ক্ষিতিমোহন প্রয়াত হন। ২২ শ্রাবণের আগে শেষ যেদিন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নেন সেদিনও ক্ষিতিমোহন-রবীন্দ্রনাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

'১৯৪১ সাল। তিনি খুবই পীড়িত। কলকাতায় যাবেন অস্ত্রোপচারের জন্যে। অস্ত্র করা হবে। এই যাত্রাই তাঁর আশ্রম থেকে শেষ যাত্রা। তাঁকে উপরতলায় স্ট্রেচারে শোয়ানো হয়েছে। কী একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমাকে সবাই উপরতলায় তাঁর কাছে পাঠালেন। কথা হয়ে গেল। বিদায় চাইলাম। কিন্তু তিনি দাঁড়াতে বললেন। আমার সর্বাঙ্গে তিনি হাত বোলাবার মতো আর্শীবাদ-দৃষ্টি বুলিয়ে গেলেন। কী যেন তিনি বলতেও যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই তাঁকে বহন করে নিয়ে সকলে চললেন। কী যেন তাঁর বলবার ছিল বলতে পারলেন না।...তাঁর সেই শেষ বেদনাভরা বিদায়দৃষ্টি চিরদিনই মনে থাকবে।'[২]

রবীন্দ্রনাথ-ক্ষিতিমোহন অন্যোন্য সান্নিধ্য-সম্পর্ক-সৌহার্দ্যের ইতিবৃত্ত তেত্রিশ বৎসরের, বঙ্গাব্দের হিসাবে ১৩১৪ থেকে ১৩৪৮। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে উভয়ের মিলন এক তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।[৩]

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ক্ষিতিমোহনের এবং ক্ষিতিমোহনের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্তি অনেক। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন বলেই ক্ষিতিমোহন সেন ক্ষিতিমোহন সেন হতে পেরেছিলেন—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় ; এবং এ কথা বারবার উচ্চারণ করায় ক্ষিতিমোহনের কোনদিনই কোনও কুণ্ঠা ছিল না। আর শান্তিনিকেতনের মাটিতে ক্ষিতিমোহনকে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম-প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বভারতী গড়ার স্বপ্নকে সফল করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর চিন্তার জগতটিকে আরও অনেক প্রসারিত ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পেরেছিলেন।

আশৈশব কাশীতে শিক্ষালাভ করে কাশীর কুইন্‌স কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম. এ. পাশ করেন ও শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন ক্ষিতিমোহন। কাশীতে তরুণ বয়সেই তিনি মধ্যযুগের ভারতীয় সাধু-সন্তদের রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেরও তিনি

অনুরাগী পাঠক ছিলেন। কাশীতে তাঁর পড়াশুনা আর তাঁর পৈতৃক নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং গ্রাম।

কলকাতা থেকে দূরবর্তী এই সংস্কৃত সাহিত্যের ছাত্র ও সন্ত-সাধকদের রচনার অনুরাগী ভারত-পথিক তরুণ ক্ষিতিমোহনের হাতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যে বইটি এসে পৌঁছায়, সেটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থাবলী, 'কাব্যগ্রন্থাবলী'—সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত। বিরাট আয়তনের বই বলে আকার-সাদৃশ্যে এই 'কাব্য-গ্রন্থাবলী' 'টালি এডিশন' নামে পরিচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থাবলীতে প্রথম থেকে 'চিত্রা', 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত সংকলিত হয়েছে; তা ছাড়া গান ব্রহ্মসংগীত ও অনুবাদও আছে।

'তখন রবীন্দ্রকাব্যের একটি টালি-সংস্করণ ছিল। ১৮৯৭ হতে বছর সাতেক ঐরূপ একখানি রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থাবলী আমার চিরসঙ্গী ছিল। তার কবিতাগুলির পাশে পাশে সব পুরাতন ভক্তবাণীর উল্লেখ করে রাখতাম। রবীন্দ্রকাব্য যে কত ভাল লাগত কী বলব? সন্তবাণী তো শত শত বছরের পুরোনো আর রবীন্দ্রনাথ জীবন্ত। এতদিন খেতাম আমসী এখন পেলাম টাটকা ল্যাংরা আম। ধন্য হয়ে গেলাম।' [৪]

রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী পাঠকের স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথকে দেখার জন্য দর্শন-অভিলাষ জন্মায়। ১৯০৪ সালে কলকাতায় কার্জন থিয়েটার হলে 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পাঠক রবীন্দ্রনাথকে ক্ষিতিমোহন প্রথম দেখেন দূর থেকে দর্শক-শ্রোতারূপে। কবির সৌম্যমূর্তি পরিশীলিত অভিজাত ব্যক্তিত্বস্বাতন্ত্র্য ও অসামান্য বাচনভঙ্গি মুগ্ধবিস্মিত করল ক্ষিতিমোহনকে।

আশ্রমের জন্য আদর্শ শিক্ষক প্রয়োজন। এই শাস্ত্রজ্ঞ সাহিত্যানুরাগী তরুণ সংস্কৃত পণ্ডিতের কথা রবীন্দ্রনাথ নানা সূত্রে কারও কারও মুখে শুনে তাঁকে এই আশ্রমে নিয়ে আসার জন্য তীব্র আকর্ষণ ও আগ্রহ অনুভব করলেন।

'১৯০৭ সাল, ডিসেম্বর মাস। আমি হিমালয়ে আছি। পোস্টাফিসে গিয়ে একখানি চিঠি পেলাম। অপূর্ব হস্তাক্ষর। খুলে দেখলাম লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের কাজে ডাকছেন।' [৫]

ক্ষিতিমোহন তখন ছিলেন চম্বারাজ্যে শিক্ষাবিভাগে কর্মরত।

কিছু দ্বিধার পর ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সম্মতি জানালেন।

অজিতকুমার চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ ওই সময় (২৪ মার্চ ১৯০৮) এক পত্রে লিখছেন :

'যে সকল লোক যথার্থই পথের পথিক, যাঁরা ঘুরেছেন, দেখেছেন, মিশেছেন, কাজ করে বেড়িয়েছেন, যাঁরা মানুষকে যথার্থই সঙ্গ দিতে পারেন এবং যাঁরা অন্তরের সঙ্গে মানুষের সঙ্গ চান—যাঁরা সমস্ত দীনতার ভিতর থেকেও মানুষকে ভালবাসতে পারেন, কোনো মূঢ়তা ও কুশ্রীতা যাঁদের মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাহত করে না সেই লোকই আমাদের মনে মানবতীর্থে যাত্রা করে বেরবার ঠিক উদ্যমটি ধরিয়ে দিতে পারেন। ক্ষিতিমোহন বাবুর সম্বন্ধে আমি হয়ত idealize করচি—সকলেরই সম্বন্ধে আমি ন্যূনাধিক

পরিমাণে তাই করে থাকি এবং প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে সত্য উপলব্ধি করবার সেই একটা উপায়। ক্ষিতিমোহন বাবুর সম্বন্ধে আর একটি কথা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তিনি যদিচ প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ, তথাপি আচরণে তিনি অত্যন্ত উদার। তিনি বলেন এই ঔদার্য্য তিনি শাস্ত্র হতেই লাভ করেছেন। হিন্দুধর্মকে যাঁরা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ করে অপমানিত করেন তাঁদের মধ্যে এঁদের দৃষ্টান্ত হয়ত কাজ করবে। অন্তত ছাত্রদের মনকে সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করবার পক্ষে ইনি অনেকটা সাহায্য করতে পারবেন।' [৬]

শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়টির মধ্যে ক্ষিতিমোহন 'প্রাণসঞ্চার করিয়া ইহাকে ভিতরের দিক হইতে উন্মেষিত করিয়া তুলিবেন' [৭]—১৩১৫-র বৈশাখে (২৪ এপ্রিল ১৯০৮) রবীন্দ্রনাথ মনের মধ্যে এই আশা পোষণ করছেন।

অপরিচিত ক্ষিতিমোহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মনের মধ্যে যে ছবি ও প্রত্যাশা গড়ে তুলেছিলেন, আশ্রমের কাজে সেই পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ সুরসিক ভাবুক কর্মযোগী মানুষটিকে কাছে পেয়ে তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ আকর্ষণ ও নির্ভরতা এবং প্রত্যাশা আরও বেড়ে যায়। ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার অল্প কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথকে জমিদারির কাজে শিলাইদহ পতিসরে চলে যেতে হয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছেও আশ্রম শান্তিনিকেতন ও তরুণ বন্ধু ক্ষিতিমোহন তাঁকে টানতে থাকে। শিলাইদহ থেকে ২০ জুলাই ক্ষিতিমোহনকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লেখেন :

'এখানকার কাজের তাগিদে চলিয়া আসিতে হইল। কিন্তু আপনাদের ছাড়িয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল না। এখানকার কাজে আমি একলা—সেখানে আপনাদের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিবার আনন্দ আমাকে নড়িতে দিতেছিল না। বিশেষত আপনার সঙ্গে পরিচয় ঘনাইয়া তুলিবার ইচ্ছাও মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমার সেখানকার মৌচাকে মধু বেশ ভরিয়া উঠিবার মুখে আমাকে চাক ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইল—মনটা এখনো সেইদিক চাহিয়াই ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। আপনি মনে করিতেছেন আপনি কেবল আপনার ছাত্রদের লইয়াই কাজ করিবেন—সেটা আপনার ভুল। আমরাও আছি। রসের অভাব হয়, পাথেয় কম পড়িয়া যায়—পরস্পরের কাছে ধার না লইলে মাঝে মাঝে পথের ধারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। ছাত্রদিগকে পাইয়া আমাদিগকে অবহেলা কবিরেন না।' [৮]

শিলাইদহ থেকে ক্ষিতিমোহনকে এই চিঠি লেখার আগের দিন (১৯ জুলাই ১৯০৮) অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ক্ষিতিমোহন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

'তাঁকে পেয়ে বিদ্যালয়ে আমাদের সাধনা সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে বলে মনে খুব আশা হয়েছে।' [৯]

শান্তিনিকেতনে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ 'পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়কে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক সশ্রদ্ধ অর্ঘ্যদান উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধানিবেদন'-এ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন :

'শুধু অধ্যাপনা বা গবেষণার মধ্যেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করে রাখেন নি।

আশ্রমের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির কাজেও তিনি ছিলেন গুরুদেবের অন্যতম প্রধান সহায়ক। উৎসব অনুষ্ঠানগুলি শান্তিনিকেতন আশ্রম জীবনের অবিচ্ছেদ্য এবং অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এগুলির পরিকল্পনায় গুরুদেব আচার্য ক্ষিতিমোহনের সাহায্য অপরিহার্য বলে মনে করতেন। আমাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি-সম্মত উপায়ে কী করে এ যুগের উৎসবগুলিকে নবীন এবং সজীব করে তোলা যায় শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠানগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এগুলির পদ্ধতি-রচনায় গুরুদেব সর্বদাই আচার্য ক্ষিতিমোহনের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।' [১০]

প্রমদারঞ্জন ঘোষ শান্তিনিকেতনে ক্ষিতিমোহনের এই দিকটির বিশেষ উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও উৎসাহ তাঁকে বিশেষভাবে উদ্বোধিত করেছিল। প্রমদারঞ্জনের কথায় :

'দেশীয় প্রথায়—বৈদিক মন্ত্র, আলপনা ও মাঙ্গল্য দ্রব্যের ব্যবহারের মাধ্যমে—উৎসবাদির অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ এ প্রথার সৌন্দর্য উপলব্ধি করে শান্তিনিকেতনে এ প্রথারই প্রচলন করেন ; ···আজ দেশের প্রায় সর্বত্রই সভা সমিতিতে এই প্রথা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেশ এজন্য প্রধানত ক্ষিতিবাবুর নিকট ঋণী, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।' [১১]

শান্তিনিকেতনে ঋতু-উৎসব প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ক্ষিতিমোহন সেনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ও কল্পনাকে প্রাচীন সাহিত্য শাস্ত্র ও ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে রূপ দিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন।

ক্ষিতিমোহনের নিজের কথায় :

'আমি এখানে আসবার পরই (১৯০৮) গুরুদেব জানালেন প্রতি ঋতুতে তাঁর ঋতু-উৎসব করবার ইচ্ছে। আমি বললাম, ভারতীয় নানা তীর্থে নানা মন্দিরে ঋতুতে ঋতুতে নবনব উৎসব চলে। নানা প্রাচীন শাস্ত্রে এবং সাহিত্যে ঋতু-উৎসবের অনেক উপকরণ দেখা যায়। গুরুদেব আজ্ঞা দিলেন সেইসব উপকরণ নিয়ে ঋতু-উৎসব প্রবর্তন করতে। তখন থেকেই ঋতু-উৎসব প্রবর্তিত হল।

প্রথমেই এল বর্ষা। হঠাৎ বিশেষ কাজে গুরুদেব গেলেন শিলাইদহ। অথচ এদিকে বৈদিক মন্ত্র প্রভৃতি নিয়ে উৎসবের আয়োজন করে বসে আছি। বর্ষা যায়, কী করব? গুরুদেব তার করলেন "উৎসব করে ফেলুন"।

বিনা খরচে লতাপাতা দিয়ে নীল রঙে কাপড় রঙিয়ে ব্রহ্মচারীদের নিয়ে উৎসব সুসম্পন্ন হল।

উৎসবের সাফল্য সম্বন্ধে দিনুবাবুর [দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর] লেখা উচ্ছ্বসিত বিবরণ পেয়ে গুরুদেব মহা খুশি। সেখানে বসেই শারদোৎসবের জন্য অনেকগুলি গান রচনা করলেন। আশ্রমে এসে সেগুলি শোনাতে আমরাও খুব আনন্দিত হলাম। কিন্তু ছেলের দল বেঁকে বসল। তারা বলল, "বিচ্ছিন্ন গানে হবে না, অভিনয় চাই"। গুরুদেব বললেন, "সময় কই"? তারা বলল, "সে সব বুঝি না, অভিনয় চাই"।

হঠাৎ একদিন গুরুদেব অন্তর্হিত হলেন, 'দেহলী'র উপর তলায় উদয়-অস্ত লিখে শারদোৎসব নাটকটি খাড়া করলেন। তাতে আমার অভিনয়ের জন্য যে ঠাকুরদাদার পার্ট লিখেছেন তাতে বহু গান। তাঁর বিশ্বাস ছিল আমি ভালো গাইতে পারি, তারপর অগত্যা আমাকে দিলেন রাজ-সন্ন্যাসীর পার্ট, তাতেও যে দু-একটা গান আছে তা তিনি পিছনে বসে গাইলেন সামনে আমি মুখ নাড়লাম। সিনেমাতে play back music-এর প্রথা তার অনেকদিন পরে প্রবর্তিত হয়েছে।

'আমার' গান শুনে সেদিন লোকের কী আনন্দ। একেবারে রবিবাবুর সমতুল! এই খ্যাতির বিড়ম্বনা সামলাতে আমার অনেক বছর কেটে গেছে।' [১২]

গানে হয়তো রবীন্দ্রনাথকে প্লে-ব্যাক করতে হয়েছিল, কিন্তু জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে উভয়েই সমকক্ষ, উভয়ের প্রতি উভয়ের গভীর প্রত্যয় ও বিশ্বাস।

আশ্রমে আসার পরেই ক্ষিতিমোহনের প্রথম বই বেরোয়। চার খণ্ডে প্রকাশিত কবীরের বাণী ও তার ক্ষিতিমোহন সেন-কৃত অনুবাদ। প্রথম খণ্ড অক্টোবর ১৯১০, দ্বিতীয় খণ্ড জানুয়ারি ১৯১১, তৃতীয় খণ্ড মে ১৯১১ এবং চতুর্থ খণ্ড আগস্ট ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ক্ষিতিমোহনের এই গ্রন্থ রচনার পিছনে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ উৎসাহ প্রেরণা ও প্রত্যক্ষ সহায়তা ও সহযোগিতা সব কিছুই ছিল অত্যন্ত গভীর ও আন্তরিকভাবে। দেখা যাচ্ছে আশ্রমে শিক্ষকরূপে কাজে যোগ দেবার দু বছরের মধ্যেই ক্ষিতিমোহনের গ্রন্থ মুদ্রাক্ষরে প্রকশিত হল।

'আশ্রমে যোগ দিয়ে দেখি, এক-একদিন সন্ধ্যাকালে আলোচনা সভা বসে। তাতে যোগ দিয়ে অসাবধানে কবীর দাদূ বাউল প্রভৃতির বাণী দুই-একটা বলে ফেলেছি। আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে এইগুলি প্রচার না করারই নিয়ম। নিরক্ষর ভক্তদের এইসব বাণী গুরুদেব প্রচার করবার জন্য ব্যাকুল হলেন।

প্রথমে তিনি আমাকে ধরলেন কবীরের বাণী প্রকাশ করতে। তখন শিক্ষিত সমাজে কবীর অনাদৃত। কবীরের দুই-একখানা মুদ্রিত বাণী যা পাওয়া যেত তা তাঁকে দেখালাম, কিন্তু তিনি আমার সংগৃহীত ভক্তদের মুখে শ্রুত কবীর বাণী পছন্দ করলেন। কাজেই লোকমুখে শ্রুত ক্রমে চার কিস্তি কবীর বাণী প্রকাশিত হল।' [১৩]

এই যে লোকমুখ নিঃসৃত মরমিয়া সাধকদের বাণী সংগ্রহ, নিজে শাস্ত্রীয় পণ্ডিত হয়েও শাস্ত্রবহির্ভূত লোকধর্মের প্রতি অন্তরের অনুরাগ—এ তো ক্ষিতিমোহনের ক্ষণকালের কৌতূহলবশে নয় ; পিতামহের এক বন্ধু ক্ষিতিমোহনকে বালককাল থেকেই এ বিষয়ে আগ্রহী ও মনস্ক করে তুলেছিলেন। ক্ষিতিমোহন যে সমগ্র জীবন সন্তসাধকদের সন্ধানে ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন তার সূচনা হয়েছিল তাঁর একেবারে বালককাল থেকেই—পিতামহের সাধকবন্ধুর সঙ্গে রাজস্থানের মঠে-মঠে আখড়ায়-আখড়ায় ঘুরে বেড়ানোর মধ্য দিয়ে। সেই বাল্যকাল থেকেই সেইসব সাধকদের সাধনা ও বাণীর উদার গম্ভীর শাশ্বত ভাব তাঁর মনকে আকৃষ্ট করেছিল ; এবং বোধ করি বাণী সংগ্রহের কাজে তখন থেকেই তাঁর ঔৎসুক্য-আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল।

বাণী সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম কাজ কবীর। শান্তিনিকেতনে আসার অনেক আগে থেকেই এই কাজ তিনি শুরু করেছিলেন ; এবং শান্তিনিকেতনে আসার পর গুরুদেবের তৎপর-প্রেরণা ও আগ্রহের ফলে তাঁর সাধনা-গবেষণার কাজ তিনি অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন।

ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক শান্তিনিকেতন থেকে সন্ত-সাধকদের প্রথম বাণী ও বচন-সংগ্রহ—কবীর। এই সংগ্রহে কবীরের দোঁহাগুলির বাংলা অনুবাদও করেন ক্ষিতিমোহন কবিগুরুর অনুপ্রেরণায়।

ক্ষিতিমোহনের কাছ থেকে কবীরের এই দোঁহাগুলি শুনে রবীন্দ্রনাথ যে এই মরমিয়া সাধক-কবির প্রতি আকৃষ্ট হবেন তা স্বাভাবিক।

'কবীর দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সকল সীমাকে পূর্ণ করিয়াই সকল সীমার অতীত। তাঁহার ব্রহ্ম কাল্পনিক Abstract ব্রহ্ম নহেন, তিনি একেবারে সত্য (Real) ; সমস্ত জগৎ তাঁহার রূপ। সব বৈচিত্র্য সেই অরূপেরই লীলা। কল্পনার দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে হইবে না ; ব্রহ্ম সর্বত্র সমাহিত, সেই সহজের মধ্যে নিমজ্জিত হইতে হইবে। কোথায়ও যাওয়া আসার প্রয়োজন নাই, ঠিক যেমনটি তেমনটি প্রবেশ করাই সাধনা।' [১৪]

এই অংশ 'কবীর' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের নিবেদন থেকে উদ্ধৃত। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এই নিবেদন রচনার তারিখ '১লা আশ্বিন, ১৩১৭'। নিবেদনে রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুকূলতার কথা ক্ষিতিমোহন অকুণ্ঠচিত্তে উল্লেখ করেন :

'যাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে আমার এই গ্রন্থ প্রকাশ করাই হইত না, সেই পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।'

মধ্যযুগীয় সন্তবাণীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল ও শ্রদ্ধানুরাগ পূর্বেই কিছু পরিমাণে ছিল এবং ক্ষিতিমোহনের সান্নিধ্যের প্রভাবে তা অনেক বৃদ্ধি পায়। হিন্দিভাষায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা না থাকা সত্ত্বেও হিন্দি সন্তসাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করার তিনি সুযোগ পান সুহৃদ্বর ক্ষিতিমোহনের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-কথার উল্লেখ করে গিয়েছেন।

'দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দীভাষায় আমার অধিকার নাই, কিন্তু বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের সাহায্যে উক্ত ভাষায় লিখিত সন্তদের সাহিত্যের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিয়াছে। এই উপলক্ষে এমন সকল রচনার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়াছে অপর কোনো সাহিত্যে যাহার কোনো তুলনা নাই।...মধ্যযুগের সাধক কবিরা হিন্দী ভাষায় যে ভাবরসের ঐশ্বর্য বিস্তার করিয়াছেন তাহার মধ্যে অসামান্য বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদের রচনায় উচ্চ-অঙ্গের সাধক এবং উচ্চ-অঙ্গের কবি একত্রে মিলিত হইয়াছে। এমন মিলন সর্বত্রই দুর্লভ।' [১৫]

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে এই হিন্দি সন্ত-সাহিত্যের প্রভাব গভীরভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। [১৬] 'গীতাঞ্জলি'র মূল পাণ্ডুলিপিতে কবীর, তুলসীদাস প্রমুখ সন্তকবিদের

আঠারোটি দোঁহা লিখিত আছে। 'কবীর' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে চিঠিতে (১১ অক্টোবর ১৯০৯) লিখছেন : 'কবীরের প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া আছি—বিলম্ব ঘটাইবেন না' [১৭] কিংবা ১৮মে ১৯১০ তারিখে লিখছেন : 'কবীরকে আমার নমস্কার জানাবেন'। [১৮]

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর তরুণ এই 'বন্ধুবর'টিকে প্রত্যক্ষভাবে কত দিক থেকে কত সহায়তা ও সহযোগিতা করেছেন তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। নাটকে অভিনেতা ক্ষিতিমোহন লিপ দিয়েছেন, প্লে-ব্যাকের গান গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—এ কথা পূর্বেই বলেছি। গুরুদেবের নাটক করছেন ক্ষিতিমোহন—মঞ্চের আড়ালে প্রম্পটার কে?—রবীন্দ্রনাথ। কবীরের বইয়ের প্রুফ দেখছেন কে?—রবীন্দ্রনাথ। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহনের দপ্তরের কাজে একজন কেরানির বিশেষ প্রয়োজন ; টাকার অভাব কেরানি এখুনি কেমন করে পাওয়া যাবে? রবীন্দ্রনাথ নাছোড়বান্দা। আশ্রমে তিনিই দুপুর বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত দপ্তরে এসে বসে 'কেরানির কাজ' করবেন এবং কয়েকদিন তা করলেনও। তাঁকে প্রতিহত করা গেল না।

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই নিজের বইয়ের প্রুফ দেখতেন। রবীন্দ্রনাথের আর এক শিষ্য প্রমথনাথ বিশী একবার সুন্দর একটি কথা বলেছিলেন : যে কোনও কাজ করে না তারই হয় সময়ের অভাব ; আর সারাদিন যে কর্মব্যস্ত তার কখনও সময়ের অভাব হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথকে দেখি হাজার কাজের মধ্যে কবীরের প্রুফ দেখায় তিনি একান্ত আত্মমগ্ন। প্রুফ দেখার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদগুলি পরিমার্জনেও তিনি হাত দেন। ক্ষিতিমোহনের প্রথম বই যাতে সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে প্রকাশ পায় সেজন্য রবীন্দ্রনাথের কী গভীর ঐকান্তিক আগ্রহ ও সক্রিয় তৎপরতা।

বই প্রকাশের দু-মাস পূর্বে ১৯১০-এর ২৪ আগস্ট তারিখে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে লিখছেন :

"শিলাইদহ থাকতে অনেকটা প্রুফ আমার হাতে পড়েছিল—ক্রমে আমার সাহস বেড়ে যাচ্চে এবার হস্তক্ষেপের মাত্রা যেন একটু বেশি হয়েছিল। কিন্তু আপনাকে ত বলেইছি—মূলকে অতি সামান্য পরিমাণেও ছাড়িয়ে যেতে আমার ইচ্ছা হয় না, তাতে যদি ভাব অস্পষ্ট হয় সেও ভাল। ভাবে কিছু পরিমাণ অস্পষ্টতাই দরকার—অতি স্পষ্ট হলে তার অর্থ ছোট হয়ে যায়—কবিতা তত্ত্ববিদ্যার ব্যাখ্যা নয় এই জন্যে তার কাছে স্পষ্ট কথার দাবি খাটবে না।

কবিতায় কোনো abstract কথা মানায় না—এই জন্যে কবীরের সাহেব কথাটিকে আমি বাংলায় স্বামী প্রভৃতি কোনো নিকট সম্বন্ধসূচক শব্দের দ্বারাই তর্জমা করা ভাল মনে করি—ঐ একটি কথাই নানা জায়গায় নানাভাবে প্রকাশ পাবে—যেমন আমাদের মানুষ বন্ধু বিচিত্র অবস্থা ও উপলক্ষ্যে আমাদের কাছে নব নব ভাবে ব্যক্ত হন অথচ প্রত্যেকবারেই সেজন্য তাঁকে নবরূপ গ্রহণ করতে হয় না এও সেই রকম।

"আপা" শব্দ ত অভিমান অর্থে ব্যবহৃত হতেই পারে। কিন্তু অভিমান কথাটা

abstract। "আপনা" কথাটাও অভিমান বোঝায় অথচ তার চেয়ে অনেক সহজে অনেক বেশি বোঝায়।

"শব্দ" কথাকে সঙ্গীত বললে খাটো করা হয়—এবং দেখছি কবীর যে বিশেষ কবিতায় "শব্দ" নিয়ে মেতেছেন সেখানে "সঙ্গীত" কথাটা সব জায়গায় ভাল করে খাটে না—"শব্দ" কথার মধ্যে একটি আদিম ধ্বনির ভাব আছে—সে যেন সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র, ভূমিষ্ঠ শিশুর প্রথম কান্না, তা ওঙ্কারের মত—অর্থাৎ তা অত্যন্ত সহজ এবং ব্যাপক—তা গানের চেয়ে সরল এবং গভীর। যাই হোক, কবীর যখন শব্দ কথাটা ব্যবহার করেছেন, তখন তিনি ওটাকে যে অর্থেই ব্যবহার করুন না কেন মূল শব্দটা রেখে দেওয়াই ভাল। বরঞ্চ এ সম্বন্ধে ভূমিকায় আলোচনা করা চলে।

এই সময়ে আপনার কাছে থাকিতে পারিতাম ; তবে দুইজনে পরামর্শ করিয়া প্রুফ দেখিতাম। শিলাইদহ হইতে চলিয়া আসিয়াছি বলিয়া শেষ অনেকখানি অংশের প্রথম প্রুফ দেখা আমার ঘটে নাই। প্রথম প্রুফ এইজন্য দেখিতে চাহিয়াছিলাম যে, আমার সংস্করণ যেখানে অসঙ্গত বোধ করবেন সেখানে আপনি সংশোধন করে নিতে পারবেন।' [১৯]

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র উপর কবীরের প্রভাবের কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে। বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে—ক্ষিতিমোহন সেন-কৃত কবীরের অনুবাদকর্ম ও তার সংশোধন ইত্যাদি কাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন ; এবং আরও লক্ষ্য করার বিষয় 'গীতাঞ্জলি'র অধিকাংশ রচনা কবীরের প্রথম খণ্ডটির প্রস্তুতিপর্বের সমসাময়িক।

কবীরের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ যে 'গীতঞ্জলি'-পর্বে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত নন সম্ভবত এমন একটি কথা কবির অনুকূলে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই সম্ভবত ক্ষিতিমোহন সেন বলেছিলেন :

'গীতাঞ্জলির মধ্যে মধ্যযুগের বাণীর কিছু ভাবসাম্য দেখিয়া আমিই কবীরের বাণীর বিষয় তাঁহাকে প্রথম জানাই। তাতেই আমি কবির কাছে ধরা পড়ি। তাহা ঘটে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। তাহার কিছুকাল পরে আমার কবীরের প্রথম খণ্ড বাহির হয়। কবীর বাণী দেখিয়া তিনি গীতাঞ্জলি লেখেন নাই। গীতাঞ্জলি দেখিয়া তাঁহাকে আমি কবীর বাণী দেখাই।' [২০]

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে ১৩৫৩ বৈশাখে ক্ষিতিমোহন এ-কথা বললেও ছয় বছর পরে ১৩৫৯ পৌষে তিনিই আবার এ প্রসঙ্গে বললেন কিছুটা অন্য কথা। যার মধ্যে দিয়ে কবি ও কবীরের রচনার ভাবনৈকট্য প্রতিষ্ঠার রয়েছে প্রয়াস।

'১৯১৩ সালে গুরুদেব নোবেল পুরস্কার পেলেন। তখন কথা উঠল গীতাঞ্জলি অভারতীয়। ওর সব চিন্তা ইউরোপের কাছেই ধার করা। আমাদের দেশের সমালোচকরা অনেকে প্রথামতো রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ভালো বলে স্বীকারই করেন নি। কেউ বলেছেন, "ওসব ন্যাকামি"। তবু যখন তাঁর কাব্যের পসার ঘটেছে তখন বলেছেন, "ওসব বিলিতী জিনিস"। একদল খৃষ্টীয় মিশনারী এই কথার জোরে গীতাঞ্জলির মূলে খৃষ্টীয় সাহিত্য

বলেই দাবি করলেন। বাধ্য হয়ে গুরুদেব পাঁচশ বছর পূর্বেকার কবীর-বাণী ইংরিজীতে প্রকাশ করলেন। দেশবিদেশে তার প্রভূত সমাদর হল।

এতদিন হিন্দী সাহিত্যে কবীরের কোনো স্থান ছিল না এবার তিনি পঙ্‌ক্তিতে উঠলেন। তিনি হিন্দী নবরত্নের বাইরে ছিলেন এবার ভিতরেই তাঁর স্থান হলো। এখনও এদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই কবীর সম্বন্ধে গবেষণা চলেছে। এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যেন আমরা কখনো না ভুলি।' [২১]

১৯১৪ সালে লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউস থেকে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় One Hundred Poems of Kabir প্রকাশিত হয়। ক্ষিতিমোহন-কৃত বাংলা অনুবাদ অবলম্বনেই এর ইংরেজি তর্জমা হয়। তর্জমার কাজে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে যাঁর সাহায্য পান তিনি অজিতকুমার চক্রবর্তী। এক পত্রে গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে অজিতকুমারকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন এই ইংরেজি বইটির জন্য প্রকাশকের কাছ থেকে 'এখানকার ব্যবসায়ের নিয়মে একটা মোটা প্রাপ্য' ক্ষিতিমোহনেরই। 'কবীর তিনি যে কেবল সংগ্রহ করেছেন তা নয় তাঁর অনুবাদ অবলম্বন করেই এই অনুবাদগুলি রচিত—যথার্থ পরিশ্রম সে তাঁরই।' [২২]

রবীন্দ্রনাথের কাছে কবীরের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন। 'গীতাঞ্জলি'র কবি রবীন্দ্রনাথ সেই ক্ষিতিমোহনকে অবলম্বন করেই One Hundred Poems of Kabir পুস্তকের মাধ্যমে সমগ্র জগৎসভায় মধ্যযুগের ভারতীয় সন্তকবিকে এনে উপস্থিত করেন।

ক্ষিতিমোহনের সাধনা ও গবেষণাকে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। সন্তবাণী প্রচারে ক্ষিতিমোহনের অসামান্য অবদান কখনও বিস্মৃত হবার নয়।

শুধু যে মধ্যযুগের সাধুসন্তদের প্রতিই ক্ষিতিমোহনের একমাত্র আকর্ষণ ছিল, তাই নয় ; বাংলার বাউলদের সম্পর্কে ও বাউলদের গান সংগ্রহে তাঁর আর এক উৎসাহ ছিল। সেও তাঁর আর এক সাধনা ; আর তাঁর এই সাধনা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও সৃষ্টির জগতকে আর এক দিক থেকে উদ্ভাসিত করেছে।

বাউল সম্প্রদায় ও বাউল গান সম্পর্কে ক্ষিতিমোহনের আগ্রহ তাঁর সন্তচর্চার কাল থেকেই, আকস্মিক কিছু নয়। বাউল গান তাঁকে মুগ্ধ করে ও সেই গান সংগ্রহের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। এই কাজে ঢাকা, শ্রীহট্ট, উত্তরবঙ্গ, ত্রিপুরা, কেঁদুলী সর্বত্র তাঁর ছিল বিচরণ। বাউল গান তিনি যে গ্রামে গ্রামে পথে ঘাটে মেলায় ঘুরে সংগ্রহ করেছেন তার পিছনে ছিল তাঁর অধ্যাত্ম পিপাসা। প্রকাশ বা প্রচারের তাগিদে এ সব তিনি সংগ্রহ করেননি। এ সব গান প্রকাশে গুরুস্থানীয় বাউলদের অনেকের আপত্তিও ছিল। তাঁরা ছিলেন প্রচারকুণ্ঠ সাধক। যাই হোক শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও আগ্রহে কিছু কিছু গান ১৩২২ বঙ্গাব্দের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় 'হারামণি' শিরোনামে। শিষ্ট সমাজ থেকে দূরবর্তী নিরক্ষর এই মানুষগুলোর বাণী রবীন্দ্রনাথের নিকটে ম্রিয়মাণ জগতে জীবন্ত আলোক-শিখার মতো। ক্ষিতিমোহনকেও এই গানের ভাবগভীর বাণী ও তত্ত্ব গভীরভাবে

আকৃষ্ট করে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথ পূর্বে বাউলের সুরে অনেকগুলি গানই রচনা করেছিলেন, কিন্তু ক্ষিতিমোহনের সমৃদ্ধ সান্নিধ্য বাউল গানকে তাঁর কাছে ভিন্ন মাত্রা ও তাৎপর্য নিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় ও ভাষণে সেই উপলব্ধি ব্যাখ্যাত হয় বারেবার। তাঁর Religion of Man গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মানবধর্মই যে শাশ্বত এবং চিরন্তন—এই অভিমত প্রতিষ্ঠা করতে ক্ষিতিমোহনের লেখা একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধই (The Baul Singers of Bonga) তাঁর বইয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন।

অথচ ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রমৃত্যু-পরবর্তী কালে যখন তাঁর নিজের কথা বলেছেন—তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় ও গভীরতম বিনয়ে নিজেকে কতই না ক্ষুদ্র ও সামান্য করে দেখিয়েছেন!

ক্ষিতিমোহনের আত্মকথনে রবীন্দ্রনাথ :

'১৯২৫ সালে কলিকাতার দর্শন-মহাসভার সভাপতিরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে তাঁর যে অভিভাষণ আর ১৯৩০ সালে পৃথিবীর মহাবিদ্যায়তন অকস্‌ফোর্ডে তাঁর যে হিবার্ট লেকচার, এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অপরিসীম সাহসে নিরক্ষর বাউলদের বাণীকে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

এইসব দুঃসাধ্য কাজ তিনিই সুসাধ্য করতে পেরেছেন। তবে সর্বদা এইসব কাজে তাঁর সেবায় আমাকে হাজির থাকতে হয়েছে। তিনি বার বার বলতেন, "পুরাতন শাস্ত্র ও গ্রন্থ সব জীর্ণ হয়ে এসেছে এইসব নিরক্ষর সাধকদের জীবন্ত বাণী ম্রিয়মাণ জগতে নবজীবন সঞ্চার করবে। এই কাজের ভার আপনাদের উপর। আপনারা যদি তাতে গ্রন্থ ভোলেন শাস্ত্র ভোলেন, ক্ষতি নেই। কিন্তু এইসব জীবন্ত আলোকশিখা হারালে আমাদের কপালে ভবিষ্যতে প্রলয়ের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসবে।" তাই অমাদের প্রতি তাঁর তাগিদের অন্ত ছিল না। আমরা তো সামান্য উপলক্ষ মাত্র, আসল শক্তি ছিলেন তিনি।' [২৩]

শুধু বাউল বা সন্তবাণী প্রচারেই নয়. রবীন্দ্রবাণী প্রচারেও তাঁর অক্লান্ত উদ্‌যোগ ও প্রয়াস স্মরণীয়।

ক্ষিতিমোহন সেনের এই দিকটির প্রসঙ্গে 'শান্তিনিকেতনের এক যুগ' গ্রন্থে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন :

'শান্তিনিকেতনের বাণী এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ক্ষিতিমোহনবাবু এক সময়ে যেভাবে দেশময় প্রচার করেছেন এমন আর কেউ নয়। গ্রীষ্মাবকাশ বা পূজাবকাশ তিনি শান্তিনিকেতনে বসে কাটাননি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে ঘুরে নিজস্ব গবেষণাকার্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই রবীন্দ্রকাব্য এবং রবীন্দ্রজীবনদর্শনের পর্যালোচনা করেছেন। অ্যান্ড্রুজ সাহেবও দেশেবিদেশে যেখানেই গিয়েছেন এ কর্তব্যটি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।'

আমার মনে হয় বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগতে অন্তরঙ্গ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন ক্ষিতিমোহন। ক্ষিতিমোহনের কথা নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বারে বারেই উল্লেখ করে গিয়েছেন। একদিকে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার

জগতে, আর একদিকে বিশ্বভারতী কর্মস্রোতধারায় ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য।

ক্ষিতিমোহনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন আছে ক্ষিতিমোহনের বিভিন্ন বইতে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'ভূমিকা'গুলির মধ্যে।

ক্ষিতিমোহনের সুবৃহৎ 'দাদূ' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'ক্ষিতিবাবুর কল্যাণে ক্রমে হিন্দুস্থানের আরো কোনো কোনো সাধক কবির সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় হল। আজ আমার মনে সন্দেহ নেই যে হিন্দী ভাষায় একদা যে গীত-সাহিত্যের আবির্ভাব হয়েচে তার গলায় অমরসভার বরমাল্য। আমাদের আড়ালে আজ তার অনেকটা আচ্ছন্ন ; উদ্ধার করা চাই, আর এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যাতে ভারতবর্ষের যারা হিন্দী ভাষা জানে না তারাও যেন ভারতের এই চিরকালের সাহিত্যে আপন উত্তরাধিকার গৌরব ভোগ করতে পারে।' [২৪]

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে 'দাদূ' প্রকাশিত হয় ১৩৪২ বৈশাখে।

'দাদূ' বইয়ের 'নিবেদন'-এ রবীন্দ্রনাথের প্রতি ক্ষিতিমোহনের নিবেদিত কৃতজ্ঞতা :

'আমার একান্ত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি পূজনীয় কবিগুরু শ্রীমদ্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্দেশে। তাঁহার উৎসাহেই এই কার্যে হাত দিয়াছিলাম, তাঁহার সহায়তাতেই এই সংগ্রহ বাহির করা সম্ভব হইয়াছে এবং তাঁহার কাছে আমি এই জন্য কত যে ঋণী তাহা কহিয়া বুঝাইবার নহে।'

বইটি উৎসর্গ রবীন্দ্রনাথকেই :

এক যুগের কবি-গুরু
শ্রীশ্রীদাদুর বাণী
অন্য যুগের কবি-গুরু
শ্রীশ্রীরবীন্দ্রনাথকে
তাঁহার ৭৫তম জন্মদিনে
শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিলাম।

২৫শে বৈশাখ
১৩৪২ বাং গ্রন্থকার

ক্ষিতিমোহনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'ও 'কবিগুরুর শ্রীচরণে' উৎসর্গ। এমন একটি গ্রন্থ বুঝি কেবলমাত্র ক্ষিতিমোহন সেনের মতো রসজ্ঞ বোদ্ধা মানুষের পক্ষে নির্মাণ করাই সম্ভব ছিল, অপর কারও পক্ষেই নয়।

রবীন্দ্রসাহিত্যের কীরকম সমঝদার পাঠক ও ভাষ্যকার ছিলেন ক্ষিতিমোহন—সে বিষয়ে চমৎকার উল্লেখ পাই প্রমদারঞ্জন ঘোষের লেখায়। প্রমদারঞ্জন লিখছেন :

'বস্তুত একমাত্র স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী ব্যতীত শান্তিনিকেতনের অপর কোনো অধ্যাপকই ক্ষিতিবাবুর মতন রবীন্দ্রকাব্যের অত বড় সমঝদার ছিলেন না রবীন্দ্রনাথের সমক্ষে যখন সাহিত্য-বিষয়ক কোনো গভীর আলোচনা হতো তখন

ক্ষিতিবাবুর জ্ঞানের গভীরতা ও সাহিত্য রসবোধ আমাদের মুগ্ধ করত। সেই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিবাবুর ভূমিকাই হতো মুখ্য ; আমরা হতাম শুধু নীরব শ্রোতা। রবীন্দ্র-প্রতিভার সমক্ষে আমাদের বুদ্ধির দীনতা তখন খুবই স্পষ্ট হতো ; এবং এ কথাও মনে হতো ওই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হবার যোগ্যতা যদি কারো থাকতো তবে তা ছিল ক্ষিতিবাবুর। অধ্যাপকদের অপর কেউ ক্ষিতিবাবুর ন্যায় এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের "সহযোগী" ছিলেন না।'[২৫]

শুধু 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' বইটি (১৯৬১) নয়, ক্ষিতিমোহন তাঁর আশি বছরের কর্মময় দীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ-ভাষ্য রচনা করে গেছেন। সেগুলি সব একত্র করে সুসম্পাদিত আকারে প্রকাশ করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে প্রায় শ-খানেক চিঠি লেখেন ক্ষিতিমোহনকে। সেই সব অপ্রকাশিত চিঠি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'চিঠিপত্র' সিরিজে এই চিঠিপত্র বিশ্বভারতী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাঁর অপ্রকাশিত দিনলিপিও 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই দিনলিপির সবটাই মুখ্যত রীবন্দ্রনাথকে ঘিরে।

শুধু ক্ষিতিমোহনকে লেখা চিঠিই নয়, বহুজনকে লেখা অজস্র চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনের কথা বলেছেন, তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। যাঁদের উদ্দেশে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে ক্ষিতিমোহনের নাম বা প্রসঙ্গ এসেছে তাঁরা হলেন : অজিতকুমার চক্রবর্তী, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, যদুনাথ সরকার, মনোরঞ্জন চৌধুরী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নেপালচন্দ্র রায়, সন্তোষকুমার মজুমদার, কালিদাস বসু, প্রমথ চৌধুরী, রাণু অধিকারী, বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য, মীরা দেবী, অমিয় চক্রবর্তী, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, ইন্দিরা দেবী, হেমবালা সেন, দিলীপকুমার রায়, হেমন্তবালা দেবী প্রমুখ।[২৬]

এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ-ক্ষিতিমোহনের অন্যোন্য সম্পর্কের কথাই শুধু বিবৃত হল ; রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সঙ্গে ক্ষিতিমোহনের সম্পর্কের ইতিবৃত্ত আমরা এই নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিনি। সেটি আর এক দীর্ঘ অধ্যায়।

পাদটীকা

১. ক্ষিতিমোহন সেনের জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৮৮০, মৃত্যু ১২মার্চ ১৯৬০। ভবতোষ দত্ত লিখিত ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া থেকে প্রকাশিত 'ক্ষিতিমোহন সেন' শীর্ষক জীবনী-পুস্তকে মুদ্রিত আচার্য সেনের তিরোধন তারিখ ১২ মার্চ ১৯৬১। এই তারিখ সঠিক নয়।

২. 'পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়কে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক সশ্রদ্ধ অর্ঘ্যদান উপলক্ষে আচার্যের প্রতিভাষণ', শান্তিনিকেতন ৭ পৌষ ১৩৫৯। পুস্তিকাটি বন্ধুবর অনাথনাথ দাস সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩. *'আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন'—বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, আনন্দবাজার পত্রিকা ২০ মার্চ ১৯৬০।*

৪. *'আচার্যের প্রতিভাষণ'।*

৫. ঐ।

৬. দেশ ৩ মাঘ ১৩৯৩।

৭. ক্ষিতিমোহন সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র। দেশ, ২২ কার্ত্তিক ১৩৯৩।

৮. ঐ।

৯. অমৃত ১০ ফাল্গুন ১৩৮৫।

১০. অনাথনাথ দাস সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১১. 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন'—প্রমদারঞ্জন ঘোষ।

১২. 'আচার্যের প্রতিভাষণ'।

১৩. ঐ।

১৪. ক্ষিতিমোহন সেন সংকলিত 'কবীর'-এর চারটি খণ্ডের প্রথম সংস্করণ বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে 'কবীর'-এর অখণ্ড সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৯৫ সালে।

১৫. সুন্দরদাস কাব্যসংগ্রহের (প্রথম খণ্ড) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য। দ্র, 'রবীন্দ্রদৃষ্টিতে তুলসীদাস'—রামবহাল তেওয়ারী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৮৪।

১৬. সম্প্রতি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে অধ্যাপিকা ডঃ ব্রততী চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে ডঃ সোমা দত্ত 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী সন্ত সাহিত্য' শীর্ষক তথ্যসমৃদ্ধ এক অতি মূল্যবান গবেষণাসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন। সন্দর্ভটি পড়ার সুযোগ আমার ঘটে। এটি শুধু বাংলায় নয়, হিন্দী ভাষাতেও মুদ্রিত হওয়া উচিত।

১৭. দেশ ২৯ কার্ত্তিক ১৩৯৩।

১৮. ঐ।

১৯. ঐ।

২০. 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী', মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৫৩।

২১. 'আচার্যের প্রতিভাষণ'।

২২. দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৮।

২৩. 'আচার্যের প্রতিভাষণ'।

২৪. প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩২।

২৫. 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন'।

২৬. দ্র. 'রবীন্দ্র পত্রাবলী : তথ্যপঞ্জী'—গৌরচন্দ্র সাহা।

এই প্রবন্ধ রচনায় যেসব গ্রন্থের সাহায্য পেয়েছি সেগুলি হল : 'রবীন্দ্রজীবনী'— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবিজীবনী'—প্রশান্তকুমার পাল, 'ক্ষিতিমোহন সেন'—ভবতোষ দত্ত, 'স্মরণীয়'—সুশীল রায়, 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন'—প্রমদারঞ্জন ঘোষ, 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন'—প্রমথনাথ বিশী, শান্তিনিকেতনের এক যুগ'—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

পরিশিষ্ট

বঙ্কিমচন্দ্রকে নিবেদিত লুপ্ত কবিতামালা

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালেই তাঁকে ঘিরে, তাঁর সৃষ্ট উপন্যাস বা উপন্যাসের অন্তর্গত নায়ক-নায়িকা বা অন্য কোনো চরিত্রকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কাব্য-কবিতা রচিত এবং সাময়িকপত্রের পাতায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া তাঁর মৃত্যুর পরে বিভিন্ন সময়ে তাঁকে উপলক্ষ করে বহু কবিতা রচিত হয়েছে। তাঁর তিরোধানে শোকাহত বাঙালী অনেক শোকগাথা রচনা করেছিলেন ; প্রকাশিত হয়েছিল তৎকালীন সাময়িকপত্রে সাহিত্যসম্রাটের স্মরণে। তাছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রকে নিবেদন করে বাংলা ভাষায় অনেক কবিতা রচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক কবিতাখানি বিখ্যাত হয়ে আছে। শুধু বাংলা কেন, ইংরেজি ভাষাতেও বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে কবিতা রচিত হয়েছে। স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দই বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে কবিতা রচনা করে গেছেন ইংরেজিতে। শুধু বঙ্কিম-প্রশস্তি বা বঙ্কিম-বন্দনা নয়, বঙ্কিমকে সমালোচনা করে—তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং কটাক্ষ করেও কিছু কিছু পদ্য-প্রহসন রচিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালেই। তাঁর কালে তাঁকে উপলক্ষ করে বা তাঁর প্রসঙ্গে যে-সব কবিতা রচিত হয়েছিল তার মধ্যে কোনো কোনো কবিতা পাঠ করে খোদ তাঁর মনে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তারও কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। নিজের সম্পর্কে কেউ কিছু ভাল বললে বা লিখলে কার না ভাল লাগে? বঙ্কিমচন্দ্রেরই বা ভাল না লাগবে কেন? তিনি নিষ্কামধর্মের প্রচারক হলেও তাঁরও ভাল লাগত!

সেকালে কবিতায় বন্দনা রচনা করা বা স্মরণ করা রীতিমত একটা প্রচলিত প্রথা ছিল। একালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত' বিভিন্ন কবির একগুচ্ছ কবিতার একখানি চমৎকার সংকলন প্রকাশ করে আমাদের সকলেরই অশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। ওই বই পড়তে পড়তে মনে হয়েছে বিদ্যাসাগর বঙ্কিম মধুসূদন দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্ত এবং অন্যান্য আরও বহুবিখ্যাত কবি-মহাকবি সম্পর্কে কত অজস্র কাব্য-কবিতাই না ছড়িয়ে রয়েছে সাময়িকপত্রের পুরাতন পৃষ্ঠাগুলিতে। সেগুলি একত্রে সংগ্রহ করতে পারলে বেশ একখানি দামি সংগ্রহ হয়। হারিয়ে যাওয়া কত কথা কত স্মৃতি কত কবিতাই না নতুন করে আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়বে। সৃষ্টিশীল বিখ্যাত মানুষদের সম্পর্কে একটা যুগ বা একটা কালের পাঠকসমাজের কৌতূহল অনুভব জিজ্ঞাসা কেমন করে ছন্দে গাঁথা হয়েছিল—তার অনুসন্ধান অবশ্যই আবশ্যক বলে মনে করি। সাহিত্যসম্রাটের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলির নিদর্শনস্বরূপ তাঁর প্রতি নিবেদিত এক গুচ্ছ হারানো কবিতাকুসুম উনিশ শতকের কাব্যমালঞ্চ থেকে সংগ্রহ করে এখানে সংকলিত হল। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে নিবেদিত কবিতার সংখ্যা বিপুল। আমরা এখানে কেবল উনিশ

শতকে রচিত কবিতাবলীই সংকলন করলাম। এই কবিতামালার কিছু বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে রচিত—সেগুলি মূলত তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টির উদ্দেশে বিরচিত ; অপরগুলি তাঁর আকস্মিক তিরোধানে শোকাহত বাঙালীর বেদনগাথা।

নি বে দি ত ক বি তা মা লা

১

কপালকুণ্ডলা

[কবিতাটি কপালকুণ্ডলা শিরোনামে ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৭৩, ডিসেম্বর ১৮৬৬ সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬৬ খিস্টাব্দেই বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাস প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি পাঠ করেই বহরমপুর থেকে কোনো অভিভূত পাঠক বা কবি সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকট এই চতুর্দশপদী কবিতাটি রচনা করে পাঠান।]

কে তুমি যোগিনীবেশে বঙ্কিম নয়নে।
ত্রাণকর্ত্রী ভবানীরে ভাবিতেছ মনে ॥
যুবতী হইয়া কর ভৈরবী সাধন।
সংসারেতে প্রীতি নাই সদা ক্ষুণ্ণ মন ॥
পঙ্কজ বদনী বামা মুক্ত চারুকেশ।
পর্বত দুহিতা যেন ভাবেন মহেশ ॥
প্রশস্ত ললাট দেশ সরল হৃদয়।
পেয়েছ যবন হস্তে ক্লেশ অতিশয় ॥
পরে দ্বিজ কাপালিক বিজন কাননে।
পালিত তোমারে সতী অতি সযতনে ॥
কপালকুণ্ডলা তুমি চিনেছি এখন।
ভুলিবে না তব নাম যত গৌড়জন ॥
অক্ষিযুগে অশ্রুবিন্দু পড়ে ঘন ঘন।
স্মরিলে তোমার খেদ পূর্ণ বিবরণ ॥

২

THE POISON TREE

[বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাস বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক প্রকাশের অব্যবহিত পরেই ১৮৭৩ খিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ The Poison Tree প্রকাশিত হয়। অনুবাদক Miriam S. Knight. ভূমিকা লেখেন E. Arnold. ইংল্যান্ডের বিখ্যাত Punch পত্রিকা বিষবৃক্ষের অনুবাদ পাঠ করে ৩

জুলাই ১৮৮৫ তারিখে লেখেন নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি।)

You ought to read the Poison Tree
'Tis Fischer Unwin's copyright—
By Bankim Chandra Chatterjee!

'Tis taken from the Bengali,
Translated well by Mrs. Knight—
You ought to read the Poison Tree.

'Tis published in one vol.—not three—
A Story quaint and apposite ;
By Bankim Chandra Chatterjee.

As Mr . Edwin Arnold he—
A learned preface doth indite ;
You ought to read the Poison Tree.

Though bored by novels you may be—
Don't miss this tale, by oversight,
By Bankim Chandra Chatterjee.

'T will whet, this novel—noveltee.
The novel reader's appetite.
You ought to read the Poison Tree
By Bankim Chandra Chatterjee.

৩

ভ্রমর

[কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন রচিত। ১২৯৭ মাঘ ভারতী ও বালক পত্রিকার 'কবির অ্যালবম'-এর অন্তর্গত। এই সংখ্যায় এগারটি সনেট মুদ্রিত। কবিতাগুলির শিরোনাম : জুলিয়েট, মিরেন্ডা, বিএট্রীস, রসেলিন্ড, দ্রৌপদী ('Tyndall, Huxley, Spencer, Darwin প্রভৃতি জড়বাদীদিগের গ্রন্থ পাঠান্তে'), ডেসডিমনা, ইলা ('রবীন্দ্রবাবুর "রাজা ও রাণী" পাঠ করিয়া'), ভ্রমর ('বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণকান্তের উইল" পাঠ করিয়া') রোহিণী, ক্লিওপেট্রো,

অফিলিয়া। এখানে ভ্রমর ও রোহিণী উদ্ধৃত হল।]

ফলফুলে ভরা সেই মালঞ্চ মধুর
স্থানে স্থানে চন্দ্রাতপ শ্যামল পল্লবে ;
কোকিল কূজনে নাহি বিরহের সুর ;
গরল মাখান নাই কুসুম-আসবে,
মধু পিয়ে প্রাণ কভু হয় না আতুর ;
শিরে ব্যথা নাহি বাজে রবির কিরণে ;
ভ্রমরের গুঞ্জরণে হর্ষ ভরপুর ;
মলয়া ঝটিকা-স্বপ্ন হেরে না স্বপনে!
কে অই দাঁড়ায়ে হোথা শ্যামাঙ্গিনী ধনী
যেন রে অপরাজিতা সুনীল বসনে!
পুষ্পময়ী এ প্রহরী পুষ্পের উদ্যানে,
অনুপম অপরূপ মালঞ্চ মালিনী!
হে পান্থ, এ পুষ্প সেবা, দুচরণে দলি,
ত্যজি এ ভ্রমর-কুঞ্জ, গেলে কোথা চলি?

৪

রোহিণী

হেম শৃঙ্গ। —ইন্দ্রধনু বিচিত্র বরণে
মেঘের কাঞ্চন দেহ করিছে রঞ্জিত!
আপনি বাজিয়া উঠে, বিচিত্র বাদনে,
তরু দেহ, লতারাজি, বায়ু-আন্দোলিত!
সুখের আবেশে আর মোহের স্বপনে,
তরল পান্থের প্রাণ হইল মোহিত।
বাড়িল রূপের তৃষ্ণা মধ্যাহ্ন জীবনে ;
জল-অন্বেষণে পান্থ হইল ধাবিত!
উঠিল তুফান ঘোর!—পর্বত বিদারি,
শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে, নির্ঝরিণী ছোটে,
কুহকী অপ্সরী আসি, দুভুজ প্রসারি,
পথিকের ক্লান্ত দেহ ধরিল সাপটে!
পান্থ কহে 'প্রাণ যায়, দাও মোরে জল'
রোহিণী অপ্সরী দিল ঘোর হলাহল!!

৫

বঙ্কিমচন্দ্র

['বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে একসঙ্গে একগুচ্ছ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৯ ফাল্গুন, ১৮৯৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার সাহিত্য পত্রিকায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের প্রধান প্রধান নারীদের নিয়ে মহিলাকবির রচিত এই সনেটগুচ্ছ। মাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক তখন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। তরুণ সুরেশচন্দ্র প্রতি মাসে সাহিত্য প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে দিয়ে আসতেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেবার 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক কবিতাগুলি পাঠ করে খুব খুশি হয়েছিলেন। দুই ডজন উজ্জ্বল সনেট পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। কবিতাগুলির শিরোনাম : কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, শ্যামাসুন্দরী, ভ্রমর, রোহিণী, মৃণালিনী, মনোরমা, গিরিজায়া, শৈবলিনী, দলনীবিবি, কুন্দ, সূর্যমুখী, কমল, তিলোত্তমা, আয়েসা, বিমলা, শান্তি, কল্যাণী, চঞ্চলা, প্রফুল্ল, সাগর, শ্রী, রমা এবং জয়ন্তী। এই কবিতাগুলির শিরোদেশে বা শেষে কবির নাম ছিল না। মহিলা-কবি সরোজকুমারী দেবী এই সনেটগুচ্ছের রচয়িতা। কবিতার সঙ্গে কবির নাম না থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র ভেবেছিলেন এগুলি সম্পাদক সুরশচন্দ্রেরই রচনা। পত্রিকার মলাটে সরোজকুমারীর নাম অবশ্য মুদ্রিত ছিল ; বঙ্কিমচন্দ্রের তা চোখে পড়েনি এবং তাই এই সনেটগুচ্ছ সুরেশচন্দ্রের লেখা বলে মনে করেছিলেন।

একদিন বিকেলে সমাজপতি বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র আমার বেশ লাগিয়াছে। তুমি তো বেশ কবিতা লিখিতে পার। এ কথা ত আগে আমায় বল নাই।' সুরেশচন্দ্র বলেন, 'আজ্ঞে, আমি লিখি নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র তখন একটু হেসে বলেন, 'উহাতে নাম নাই দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম— সম্পাদকের লেখা ; না তুমি লজ্জা করিতেছ?' শেষ পর্যন্ত সুরেশচন্দ্রের নিকট থেকে বঙ্কিমচন্দ্র জানেন—এই কবিতাগুলির প্রকৃত রচয়িতা তরুণী সরোজকুমারী দেবী, যিনি পরবর্তী কালে উনিশ শতকের বিশিষ্ট মহিলাকবি রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুরেশচন্দ্রকে এই কবি প্রসঙ্গে বলেন, 'বেশ ক্ষমতা আছে, রীতিমত চর্চা রাখলে ভবিষ্যতে ভাল হবে। তুমি তাকে ব'লো আমার খুব ভালো লেগেছে।' বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেন, 'আমার বইগুলি এত ভাল করে পড়েছে ; আমার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে এতগুলি কবিতা লিখেছে, এতে আমার আনন্দ হবে এ কিছু বেশি কথা নয় ; আমার নিজের কথা এমন করে কেউ লিখলে, খারাপ হলেও হয়ত ভাল লাগত, কি বল? সেজন্য ত আহ্লাদ হবেই, আর তা বলতেই বা দোষ কি? কিন্তু আমি সেকথা বলছি না, সত্যই, এর কবিতা লেখবার ক্ষমতা আছে, কবিতাগুলি বেশ হয়েছে ; তুমি তোমাদের পুঁটিকে (সরোজকুমারীর ডাকনাম) ব'লো, আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার আশীর্বাদ জানিও।' বঙ্কিমচন্দ্রের সপ্রশংস মন্তব্য শুনে সুরেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে জানান—সারদামঙ্গলের কবি বিরাহীলাল চক্রবর্তীও এই কবিতাগুলির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত, কাব্যগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

চব্বিশটি সনেটের মধ্যে থেকে এখানে নির্বাচিত কয়েকটি সংগৃহীত হল। প্রথম কবিতার শিরোনাম মতিবিবি।]

বসন্ত কাননে সুখে খেলে প্রজাপতি
এ ফুলে ও ফুলে মধু মিটিছে পিয়াস,
কি মধুর জ্যোৎস্না ভায় কি মধুর রাতি,
পুলকিত প্রাণ মন মেটে না তিয়াস।
আলসে গুঞ্জন করি কহিছে লালসা
আরো ফুল ফুটে আছে নব অনুরাগে,
অমনি জাগিয়া প্রাণে উঠে শত আশা,
নব যৌবনের রাতি নব নব যাগে।
বর্তমান সুখে হায় ভুলেছ সকল,
জান না এ ধরা মাঝে সবি হয় শেষ,
বাকি রবে আঁখি-কোণে ম্লান অশ্রুজল
হৃদয় দহন মাত্র হবে অবশেষ।
চিরকাল সুধা পানে উঠিবে গরল,
জানিবে জীবন কি গো বুঝিবে সকল।

৬

রোহিণী

তুমি কি হইবে দোষী? তা ত কভু নয়।
প্রজাপতি-রূপ-ধন্ধে মোহান্ধ নয়ন।
সাধ তারে কাছে সদা বুকে টেনে লয়,
তারি মাঝে নেহারিবে স্বরগ-স্বপন।
ও ক্ষুদ্র হৃদয়ে ছিল যতটুকু বল
একেবারে সঞ্চিয়াত ডুবিলে অতলে
নব দীপ্তি লয়ে তব নয়ন রঞ্জিল,
তবু ত আঁখির আগে রূপশিখানলে।
জাগাইল যৌবনের প্রথম বাসনা,
রক্ত কুসুমিত সেই ফুল্ল বিম্বাধর।
সেই নিরজনে তাই হারালে আপনা
মগন হইলে প্রেম-সমাধির পর।
প্রথম যৌবনে সেই অনুরাগ নব,
কি করিবে, এ ত দোষ নয় কভু তব।

৭

মৃণালিনী

এমন পবিত্র প্রেম কোথা আছে আর?
কি চোখে দেখেছ তুমি বুঝিতে পারি না।
কত দিন সয়েছিলে কত দুঃখভার,
আশাপথ চেয়ে শেষে মিটিল বাসনা।
শিশিরেতে সিক্ত সেই অশোকের প্রায়
আপনার নম্রতায় আপনি বিলীনা।
তবু ত ফণিনী সম হৃদয়ের ছায়
সুপ্ত গর্ব লুক্কাইত, কেহ ত জানে না।
একটি বিশ্বাসে শুধু হৃদয় বাঁধিয়া
এক দৃষ্টে চেয়ে আছ ধ্রুবতারা পানে;
অবিশ্বাস-রেখা এক হৃদয়ে আসিয়া
কখনো ব্যথিত তব করেনিক প্রাণে।
সুকঠিন শিলাতলে উজল নয়নে,
তখনো বিশ্বাস বাঁধা মধু আলিঙ্গনে!

৮

শৈবলিনী

ক্ষুদ্র এক শৈল পার্শ্বে দুটি নির্ঝরিণী,
বহিয়া আসিতেছিল মিলায়ে মিশায়।
এক কলতান যেন দুটি কলধ্বনি,
চলিয়া যাইবে দোঁহে মিশিয়া দোঁহায়।
সহসা উপলখণ্ডে পাইয়া সে বাধা
চলে গেল নির্ঝরিণী সাগরের পানে।
অন্ধকার জীবনেতে আলো সেই আধা
চিত্রিত রহিল তবু কেন গো কে জানে?
সহস্র ঝটিকা বহে গিয়াছে ত তবু
সেই সুখ সেই প্রণয় তেমনি চিত্রিত।
পাষাণের রেখা হায় যায় কিগো কভু?
চিরজীবনের তরে হয় সে অঙ্কিত।
তবু সে মহান সেই সাগর মুরতি
অন্ধকার গেহে জ্বলে রবিকর ভাতি!

৯

কুন্দ

প্রথম দেখিনু তোমা মৃত্যু শয্যা পাশে
একেলা দীপের মত দীপহীন ঘরে।
তার পরে বাপী-তীরে বসিয়া নিরাশে
আপনাকে হেরেছিলে ভবিষ্য আঁধারে।
শেষ, সেই ভূমিতলে রয়েছ শয়ান,
বিষে ভরা সেই তব পাণ্ডু মুখ খানি।
সহসা সলিলে পূর্ণ হইল নয়ান,
খুলিলে গো হৃদয়ের সে রুদ্ধ কাহিনী।
দেখালে খুলিয়া হৃদি নিখিল সম্মুখে
হৃদয়ের প্রেম আর প্রতাপ তাহার।
মাথাটি রাখিয়া কোলে কি গভীর ঘুমে
ঘুমায়ে পড়িয়াছিলে মরণ মাঝার।
আধ-ফোটা কুন্দ ফুল না ফুটিতে হায়
নিঠুর সমীর স্পর্শে ওই ঝরে যায়!

১০

তিলোত্তমা

কি মধুর নম্রতায় আপনি বিলীনা,
ধুলি ধূসরিত মরি দলিত কুসুম!
আছিলে প্রেমের মোহে আপনি মগনা,
সহসা বজ্রের শব্দে ভাঙ্গিল সে ঘুম।
শেষ সেই নিভু নিভু মরণ-শয্যায়
অপলক আঁখে আছ আশা-পথ চেয়ে।
পাণ্ডুর মুখানি লয়ে শুকতারা হায়!
আকাশের প্রান্তে যাবে এখনি মিলায়ে।
নিশির শিশির সিক্ত আধ-ফোটা ফুল,
সমীরে চঞ্চল হয়ে যায় বুঝি ঝরে।
সহসা এ কি এ দৃশ্য নয়ন আকুল
হৃদি-গেহ ঝলকিত তীব্র রবি করে।
তাই বুঝি এখনও ম্লান দু অধরে
হাসিটি ফুটিয়া উঠে মুখে খেলা করে!

১১

কল্যাণী

দিয়াছ হৃদয় বলি নিখিল চরণে
পতি যে হৃদয় ধন দেছ উপহার।
কি কাজ রাখিয়া ছার এ ক্ষুদ্র পরাণে
তেয়াগিতে অকালেতে প্রাণ আপনার।
সহসা উঠিল জেগে নবীন ভুবনে
মূর্তিমতী ভক্তি যেন জগৎ মাঝারে।
মোহিলে সবার আঁখি আপন কিরণে।
পাপী সে মোহান্ধ হয়ে ত্যজে আপনারে।
জাগে সে পবিত্র মূর্তি মানস নয়নে
ক্ষুদ্র গৃহ হেরি সেই চিত্র লেখা তায়।
বিছায়ে যাদুর ক্ষুদ্র মগন ধেয়ানে
উদ্দেশ্যে দেবতা কাছে গেছে প্রাণ হায়।
ঈশ্বর পূজিতে গেলে আসে প্রাণেশ্বর,
এ দোষ কে দেবে বৃথা বল তোমা পর।

১২

চঞ্চলা

ক্ষুদ্র রাজকন্যা বটে, হৃদয়ের পরে,
কি তরঙ্গ খেলিতেছে সতত আবেগে,
কি গৌরব, কি মহত্ত্ব, ও হৃদয়ে ঝরে,
আপনাকে সঁপেছিলে তাই অনুরাগে।
বিচিত্র কক্ষের মাঝে বিচিত্র শয্যায়
সখী সবে মগ্ন নিজ রহস্যের মাঝে,
সহসা দেখিল তারা প্রতিমার প্রায়
দেবী কি মানবী হবে চেয়ে শুধু আছে!
সহসা জাগিল কক্ষ হাসির লহরে,
সখী সাথে কথা হল নয়নে নয়নে।
চিত্র লয়ে কি বিচিত্র মহিমা-শিখরে
দাঁড়াইয়া ভাঙ্গিলে গো সে রাঙা চরণে।
পুরিল কামনা তব, হলে রাজরাণী
থামিল উন্নত সেই প্রণয়-বাহিনী।

১৩

প্রফুল্ল

কি হৃদয়ে ছিল সাধ? এক বার হায়
পতি সে দেবতা, তারে হেরিতে নয়নে।
দয়াময় মিটালেন তব বাসনায়
হৃদয় পড়িল বাঁধা একটি চুম্বনে।
সহসা কপাল ক্রমে এ কি হল হায়
দীন ভিখারিনী উচ্চে ঐশ্বর্য মাঝার।
হৃদয়ের তৃষা তাহে মিটিবে কোথায়?
অনিবার হাহাকার সেই বাসনার।
তাই কি ভিখারী বেশে যেতেছ আবার
পূজিতে চরণ দুটি সোহাগ করিয়া?
এই ত উচিত কাজে সেজেছে তোমায়
কি ফল ঐশ্বর্য মাঝে রহিলে ডুবিয়া?
হৃদয়ের সে সৌন্দর্য হল প্রতিভাত,
মিশিলে আসিয়া যবে নিখিলের সাথ!

১৪

জয়ন্তী

স্নিগ্ধ সন্ধ্যা দাঁড়াইয়া স্তিমিত আলোকে
গেরুয়া বসন পরে করেতে ত্রিশূল।
কি তীব্র কোমল জ্যোতি নয়নে ঝলকে,
পবিত্রতা মূর্তিমতী, হল বুঝি ভুল।
সহস্র লোকের মাঝে সে সভামণ্ডপ,
অধোমুখে লাজময়ী ধ্যেয়ানে মগন।
মূঢ় তারা, জানেনাক তোমার প্রতাপ,
পাপের পঙ্কিল স্রোতে অন্ধ যে নয়ন!
তবু অন্তর্যামী তিনি সহায় তোমার,
দুরন্ত সমর হতে বাঁচাবার তরে
রাজরাণী সখী সাথে ঘিরে চারিধার
সে মধু অমৃত নাম আননেতে ঝরে!
এ জগতে কোন্ ব্রত করি উদ্‌যাপন,
যাবে মনোমত তব গেহেতে আপন?

১৫
বঙ্গীয় সমালোচক

[বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে তাঁর সৃষ্টিসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যেমন অনেক কবিতা রচিত হয়েছিল, তেমনি তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে কটাক্ষ-কটূক্তি করেও বেশ কিছু পদ্য-প্রহসন পত্রিকার পাতায় বা পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক পদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।" আমরা এখানে ১২৮৭ বঙ্গাব্দে (১৮৮০ খ্রি) প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করে লেখা একটি ক্ষুদ্র ব্যঙ্গপুস্তক থেকে নমুনাস্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত করবো। একটা যুগের ভাল মন্দ তো দুই-ই থাকে। চাঁদের আলো শ্রাবণের কালো মেঘে কখনো-কখনো ঢাকা পড়ে। ব্যঙ্গপুস্তকটির রচয়িতা কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। ইনি 'বাউল শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী' ছদ্মনামে 'বঙ্গীয় সমালোচক' শীর্ষক একখানি ক্ষুদ্র 'কাব্য' রচনা করেন। বইয়ের নামপত্র এরকম : "বঙ্গীয় সমালোচক/(কাব্য)/বাউল/শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী বিরচিত/বাবাজীর প্রবীণ চেলা কৃত টীকা/ও/দুইখানি চিত্র সমেত।/নিমতলা-গঙ্গাতীর।/সন ১২৮৭ সাল/মূল্য এক আনা।" বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা আঠারো। ব্যঙ্গপুস্তকের অন্তর্গত প্রথম ছবিতে সাহিত্যসম্রাটকে বানররূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। একটি ফলন্ত কাঁঠাল গাছ (বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ার লোক তো), গাছের তলায় এক দীর্ঘ লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানর বঙ্গদর্শন-পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান। বানরের দক্ষিণ হস্তে লেখনী, আর অপর হস্তে পতাকার দণ্ডটি ধৃত। সেই পতাকায় লেখা : "আদ্যোপান্ত পাঠ করুন।/বঙ্গ। ভারত। স্বদেশ।/উন্নতি। সভ্যতা। স্বাধীনতা/সাহিত্য। বিজ্ঞান। দর্শন।" দ্বিতীয় ছবির বক্তব্য, বানরটি কাঁঠাল খাচ্ছে, আর তার কোয়াগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রথম ছবিটি কাব্যের গোড়াতেই মুদ্রিত এবং ছবির নীচ থেকে 'কাব্যে'র যথার্থ সূচনা। আমরা এই বই থেকে কালের কলঙ্কের নমুনাস্বরূপ সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করলাম।]

অথ সমালোচকাখ্য

বানরের রূপ বর্ণনা।

অঙ্কিত প্রতিকৃতির সহিত মিলাইয়া দেখুন।

কাঁঠাল গাছের কাছে বানর বসিয়া আছে
[বসে কি দাঁড়ায়ে কেবা করিবে নির্ণয়?]
কি বাহার মরে যাই! চরণে পাদুকা নাই
চাপকানে অঙ্গঢাকা দেখে দুঃখ হয়।
মরি কি রূপের ছটা কোমর বন্ধক আঁটা
বিলোলিত লাঙ্গুলের কি সুষমা হায়!
শোভিয়া হৃদয় রাকা ও চাঁদ বদন বাঁকা
কলঙ্ক বিষম গোঁফ আঁকা আছে তায়।

জগতে ভাবিয়া তুচ্ছ ধরেছে হংসের পুচ্ছ
বাম হস্তে ধরিয়াছে যশের নিশান,
কি বাহার আদ্যোপান্তে দেখ বিদ্যমান!
সুশোভিত শিরস্ত্রাণ বর্ধিত করেছে মান
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা মরি নিশানের ভরে!
তুলনা মিলেনা আর ভারত ভিতরে ॥

অথ গুণ বর্ণনা।
হে বঙ্গ দর্শন কর বঙ্কিম বানর,
[যশের নিশান ধরি শীর্ষের উপর]
হে বঙ্গের আশাভূমি, ভেবোনা ভেবোনা তুমি
আপনারে অদ্বিতীয়, তব সম আর
শাখামৃগ অবতংশ দেখেনি সংসার।
কাঁঠাল তলায় বসি বঙ্গের গৌরব শশী
কি ভাবিছ মনে মনে? দৃষ্টান্তে তোমার
হয়েছে এ বঙ্গদেশে সুরস সঞ্চার।

অথ সমালোচকের কীর্তি বর্ণনা।
(অথবা সমালোচনার নমুনা।)
কে লিখেছে—হেমচন্দ্র বলিহারি যাই,
এমন সুন্দর বই আর দেখি নাই ॥
পদের লালিত্য হেন— শুধু তাই বলি কেন?
ভাবের গৌরব আর সুন্দর সমাস
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।
এ গ্রন্থ অমূল্য বলি মিলটন যাও চলি
স্বর্গ মর্ত রসাতল—নরক সংসার
এক কালে এক গ্রন্থে প্রবেশ সবার।
এ কি বই? কে লিখেছে? সুহৃদ্ আমার?
উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বলি—কি বলিব আর?
দোষগুণ দুই (ই) আছে; উচিত সবার কাছে
এক এক খানা রাখা; মনোহর অতি,
কল্পনার প্রতিকৃতি মোহন মুরতি।
ঐটি কার লীলা খেলা—গ্রন্থে নাম নাই
এই বার কি বলিব ভাবিতেছি তাই

বুঝিয়াছি প্রিয়তম   অমুকাখ্যমিত্র মম
করেছেন এই চারু গ্রন্থ প্রণয়ন
তবে এ অবশ্য ভাল বুঝিনু এখন।
আশা করি ভবিষ্যতে   গ্রন্থকার এ ভারতে
প্রকাশিয়া নিজ নাম, যশের নিশান
উত্তোলিয়া লভিবেন অশেষ সম্মান।...

কবিতা পুস্তক
উপন্যাসে মজা লুটে কাব্যের বাজারে,
সুরসিক কোন কবি উঁকি-ঝুঁকি মারে।
ইনি যে সমালোচক   সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক
লিখেছেন বঙ্গদেশে বহু উপন্যাস।
কবিতা পুস্তকে এঁর বিদ্যার প্রকাশ,
বিশ্বকর্মা শিল্পকর   জগন্নাথে চরাচর
সহজেই বুঝিয়াছে ; ওগো সম্পাদক !
সব হ'লো বাকি কেন বাঙ্গালা নাটক ?

১৬

থাক' ভোর

(গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমর)

[এই কবিতাটির রচয়িতা স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বর্ণকুমারী ও তাঁর কন্যা সরলা দেবী দুজনেই বঙ্কিমচন্দ্রের দারুণ ভক্ত ছিলেন। শুধু তাই কেন, বিরোধ-বিবাদ সত্ত্বেও সমগ্র ঠাকুর-পরিবারই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ—সবাই বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচারণ করে গেছেন পরবর্তী কালে। স্বর্ণকুমারী তাঁর ভারতী পত্রিকার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে লেখা চাইতে প্রায়ই আসতেন ; এবং শেষ পর্যন্ত তিনি লেখা সংগ্রহে সফলও হয়েছিলেন। এই কবিতার রচনাকাল আমাদের জানা নেই ; তবে এটি তাঁর 'কবিতা ও গান' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত হয় ১৮৯৫ ডিসেম্বরে।]

তুমি রূপসী বালা নিয়ে, বিলাসে থাক' ভোর,
তোমার তরে মোর ঝরুক আঁখি-লোর।
তুমি তাহার কানে ঢাল মধুর প্রেম-ভাষ!
হেথা বিরহে আমি ফেলি আকুল দুখ-শ্বাস।
তুমি বিহ্বলে থাক ভুলে, শোন হে মধু গান,
তোমায় স্মরি আমি হুতাশে ধরি প্রাণ।

তুমি দিবস যামী স্বপনে থাক লীন,
জীবন যাপি আমি গণিয়ে পল দিন!
ডেকো না কাছে শুধু একটু দূরে থাকি,
ছুঁয়ো না, সখা, শুধু উহাই রাখ বাকি।
আমি ত সেই আমি, তেমনি আছি তব,
শুধু সে প্রেমাদর স্বামি গো, নাহি স'ব।
পরিপূর্ণ বিশ্বাসের করেছ অপমান,
তোমার সেই আমি, শুধু দেহের ব্যবধান!
এ হৃদি ভাঙ্গাচোরা, তবুও তোমা রত,
শুধু সে মিলনের হয়েছে দিন গত।
সুখেতে শুধু নহি, দুঃখেতে সেই আমি,
জীবনে নহি আর, মরণে অনুগামী।

১৭

বঙ্কিমচন্দ্র

[বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান ঘটে 'সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন' ; ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র, ৮এপ্রিল ১৮৯৪। তাঁর লোকান্তরের পরেই তৎকালীন বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর স্মরণে অনেক কবিতা ও শোকগাথা রচিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবিরাও সেই মুহূর্তে তাঁদের ছন্দের কলমে সদ্য পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এই শ্রেণীর কবিতাবলীর মধ্যে আমরা এখানে চারটি কবিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো। শোক যত প্রগাঢ়, শোকগাথাগুলিও আয়তনে ততই দীর্ঘ। সপ্তদশ সংখ্যক কবিতার রচয়িতা গোবিন্দচন্দ্র দাস। নব্যভারত পত্রিকার ১৩০১ বৈশাখ (১৮৯৪ মে) সংখ্যায় প্রকাশিত।]

এক

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন,
এক পায় দুই পায়, বসন্ত চলিয়া যায়,
শ্যাম-মমতায় মেখে বন উপবন!
তার সে বিদায় ভোজ, মধু খায় রোজ রোজ,
ফুলের গেলাস ভরি মধুকরগণ!
তরুণ তমাল গাছে, কি জানি কি লিখা আছে,
কোকিল করিছে পাঠ সে অভিনন্দন।
উড়ায়ে রুমাল ছাতা, নূতন পল্লব পাতা,

আনন্দ জানায় যেন নীরবে কানন!
বসন্ত বিদায়—কাজ, সভাপতি দ্বিজরাজ,
সুধাকরে করে তার শেষ সম্ভাষণ!
সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন!

দুই

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—হায় হায় হায়!
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায়!
লইয়ে নবীন, হেম,—অক্ষয়ে অক্ষয় প্রেম—
চন্দ্রনাথ, প্রিয়বন্ধু দীনবন্ধু রায়,
ধরে সবে হাতে হাতে, লইয়া আসিলে সাথে,
পারিজাত বন থেকে শ্যামা পাপীয়ায়!
ছিন্ন আশা, ছিন্ন বাসা, সাজাইলে বঙ্গ ভাষা,
শীতের শিশির মুছে মলয় হাওয়ায়!
এখনো পূরেনি তার, সময়ের অধিকার—
সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—হায় হায় হায়!
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায়!

তিন

বাঙ্গালার মহা কবি—ভারত-ভূষণ,
সাজাইলে কত সাজে কাব্য-উপবন!
কমল কমলমণি, পবিত্র প্রেমের খনি,
'কানা কড়ি' দিয়ে সে যে কিনে রাখে মন!
'সতু'রে সারথি করি, আরক্ত কপোলে মরি,
আপনি সমরে ধরে ফুল শরাসন!
সূর্যমুখী 'সূর্যমুখী', স্বামীর সুখেই সুখী,
স্নেহে প্রেমে মমতায় কোথায় এমন?
কোমল 'কুন্দের' মালা, প্রীতির নৈবেদ্য বালা,
কি সুন্দর করিয়াছে আত্ম-নিবেদন!
'বিষ' নহে 'সুধা' বৃক্ষ, পরশিছে অন্তরীক্ষ,
তারকা 'হীরার' ফুলে তীক্ষ্ন কিরণ,
জগতের একধারে, সুদূর সাগর পারে,
আলো করিয়াছে সে যে বৃহৎ বৃটন!

কত ফুলে সাজাইলে বঙ্গ উপবন!
পূজনীয় প্রিয় কবি, ফুটাইলে যে মাধবী—
বিমল 'বিমলা'রূপে গড় মান্দারণ!
হৃদয়ে লুকায়ে শূল, হাসে কাঁদে চাঁপাফুল,
আকুল 'আয়েসা' চির আনত-আনন!
'রজনী' রজনীগন্ধা, আলো করে দিবা সন্ধ্যা,
প্রেম-পূর্ণিমায় তার বেলফুলবন!
ফুল দিয়ে সিঁদ কাটে রমণী কেমন!

চার

বঙ্গের বসন্ত কবি—ভারত-ভূষণ,
কত ফুলে সাজাইলে ভাষা উপবন!
'রোহিণী'র সমতুল, বিধবা বকুল ফুল,
কোন্ দেশে ফোটে হেন মধুমাখা মন?
কি শোভা পুকুর পাড়ে, গোবিন্দ তুলিলা তারে,
ইন্দিরা লভিলা যেন নিজে নারায়ণ!
অভিমানে উচ্ছ্বসিতা, অপূর্ব অপরাজিতা,
কি সুন্দর 'ভ্রমরের' মধুর মরণ!
না উঠিতে রাঙ্গা রবি, নির্মল সরল ছবি,
ফুলদলে শিশিরের ধীরে পলায়ন!
কত সাজে সাজাইলে ভাষা উপবন!

পাঁচ

তুমিই আনিয়া দিলে সুষমা শ্যামল,
আগে ছিল রুখু রুখু, না ছিল লাবণ্যটুকু,
মরা গাঙ্গে ছুটাইলে জোয়ারের জল!
দুইজনে চুবাচুবি, দুইজনে ডুবাডুবি,
'প্রতাপ' 'শৈবালে' যুদ্ধ কাঁপে দেবদল!
এমন আদর্শবীর, কোথা আছে পৃথিবীর,
পিনাকীর চেয়ে এ যে 'প্রতাপ' প্রবল!
তুমি ফুটাইলে এই অনল-কমল!

ছয়

তুমি সাজালে ভাষা শ্যাম সুষমায়,
বালিকা 'প্রফুল্ল' আনি, গড়াইলে দেবীরাণী,
বিদ্যুতে মাখিয়া ফুল দেব-প্রতিভায়!
কল্পনা-কালিন্দীতটে, গড়িলে আনন্দ মঠে,
ভারত ভবিষ্য স্বর্গ সুমেরু ছায়ায়!
শিখালে সন্তান ধর্ম, জননীর প্রিয় কর্ম,
মহাবীর সত্যানন্দ মহাপ্রাণতায়!
তুমি সাজাইলে ভাষা অনন্ত শোভায়!

সাত

তুমি সাজাইলে ভাষা নানা আভরণে,
কত রঙ্গ কত রস, কমলাকান্তের বশ,
শিখিলে রহস্য কত বিজ্ঞানে দর্শনে!
বুঝাইলে যোগভক্তি, কৃষ্ণের অসীম শক্তি
দেখালে আদর্শ নর দেব নারায়ণে!
ঝেড়ে পুছে ধুলা মাটি, হিন্দুর আসল—খাঁটি,
বুঝাইলে দয়াধর্ম দেশবাসীগণে।
তোমার স্বাধীন মত, শরতের রৌদ্রবৎ,
জ্বলিতেছে ভারতের গগনে গগনে!
প্রতিভার দীপ্তরবি, বাঙ্গালীর মহাকবি,
কেন অস্ত যাও আজ অগস্ত্য গমনে,
ঢালিয়া আঁধার ঘন ভাষাফুলবনে?

আট

যাবে তুমি? এ জগতে কে না বল যায়?
কেহ গেলে হাসে লোকে, কেহ গেলে কাঁদে শোকে,
পাষাণ বিদরে কারে করিতে বিদায়!
বসন্ত বাঁচিয়ে থাক্, নিদাঘ শিশির যাক্,
কুলার বাতাসে আর তুষের ধুঁয়ায়!
বার মাস নিতি নিতি, থাকুক্ পূর্ণিমা তিথি,
চলে যাক্ অমা রাহু, ক্ষতি নাহি তায়!
তুমি থাক, মোরা যাই, আমরা যে ভস্ম ছাই,
কি হবে এ কোটি কোটি রেণু-কণিকায়?

আমরা পথের ধূলি, কর্দম কঙ্কর গুলি,
আমরা নীচের নীচ পড়ে থাকি পায়!
বিধির অপূর্ব দান, দেশের গৌরব মান,
তুমি কবি-কহিনুর কিরীট চূড়ায়!
মোরা যাই, তুমি থাক, সুখী কর মায়!

নয়

গভীর বসন্ত নিশি—গভীর গগন,
কলিকাতা—নিমতলে, দিতেছে গঙ্গার জলে
ধোয়াইয়া ভারতের বুকভরা ধন!
পাতিয়ে অঞ্চল ঢেউ—আঁধারে দেখেনি কেউ-
মহা যত্নে মন্দাকিনী করিছে গ্রহণ!—
পাইয়া কবির ছাই, আনন্দের সীমা নাই,
চলেছে পতিরে দিতে ডগমগ মন!
কত যুগ যুগান্তর, হৃতরত্ন রত্নাকর,
দেবতা লুঠিয়া নিছে করিয়ে মন্থন!
পরশে কবির ছাই, ফিরিয়ে পাইবে তাই,
লবণাক্ত জলে হবে সুধা অতুলন!
ইন্দিরা জন্মিবে শঙ্খে, পারিজাত হবে পঙ্কে,
শুকুতি পরশে হবে মুকুতা সৃজন!
শৈবাল প্রবাল হবে, সুধাকর ফেন সবে,
হইবে কল্পতরু তৃণতরুগণ!
পাষাণে পড়িলে দাগ, হবে মণি পদ্মরাগ,
অঙ্গারে হইবে হীরা কৌস্তুভ রতন!
সত্যই কবি কি মরে? বোঝে না অবোধ নরে,
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন!
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ!

১৮

প্রতিভা-পূজা

[নব্যভারত পত্রিকায় ১৩০১ বৈশাখ (১৮৯৪ মে) সংখ্যায় মুদ্রিত। 'প্রতিভা-পূজা' এই শিরোনামের নীচে লেখা ছিল : '(শ্রীবঙ্কিমের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত)'। এটি অতি দীর্ঘ কবিতা। কবি—দেবেন্দ্রবিজয় বসু। কবিতাটি 'আবাহন' 'উদ্বোধন' 'প্রতিষ্ঠা' 'পূজা' 'বিসর্জন' এই পাঁচটি ভাগে সাজানো। কবিতার মোট স্তবক সংখ্যা তেত্রিশ। নব্যভারতের

দুই কলামের পাতায় ছাব্বিশ থেকে বত্রিশ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। আমরা এখানে কবিতার 'পূজা' পর্যায় থেকে উনিশ থেকে পঁচিশ স্তবক উদ্ধৃত করছি।]

প্রতিভার হের বীরসাজ,
মাতৃ অরি করিতে দমন ;
লেখনীর তীব্র বজ্র তেজে,
অরি দূরে করে পলায়ন।
কুশিক্ষা কুধর্মের প্রভাবে,
কুকবির বিকৃত অঙ্কনে,
হেরি চিত্র ইষ্টদেবতার,
হ'তেছে মলিন প্রতিক্ষণে।
প্রতিভা জ্বালিল কি অনল!
দগ্ধ তরে মুর্খতা-খাণ্ডব ;
করি দূর ভ্রম অন্ধকার,
প্রচারিল ধর্ম অভিনব।

প্রতিভার হস্ত প্রসারিয়া,
কভু হের কত যত্ন করি,
পুঁছাইছে কলঙ্ক ভা'য়ের,
বীরত্বের পশরা বিস্তারি।
সপ্তদশ অশ্বারোহী কথা,
বাতুলের অলীক স্বপন—
কেবল বিশ্বাস-ঘাতকতা,
শুধু অন্ধ স্বার্থের ছলন।
অন্ধ ইতিহাস-কক্ষ হতে,
মা'র এ কলঙ্ক উপাখ্যান,
পুঁছে ফেলি অতি সযতনে,
কভু গায় মাতৃযশ গান।

শুন পুনঃ গভীর ঝঙ্কার—
হৃদয়-বিদারী আর্তরব!
মা মা রবে জগৎ ভাসায়,
একি তান ধরে অভিনব!
মা বুঝি লুকাল সিন্ধুকোলে,
অকৃতি সন্তান দুঃখ হেরে,

তাই করে অদ্ভুত সাধনা,
মাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার তরে।
সপ্তকোটি গলা ধরি কাঁদে,
ভিক্ষা যাচে হৃদয়ের বল ;
বুঝাইছে সন্তানের ব্রত,
সাধে—ব্রত করিতে সম্বল।

বলে—কর স্বার্থ আত্ম-ত্যাগ,
পণ কর প্রাণ বলিদান,
লহ মাতৃভক্তি মন্ত্র কাণে,
সদা কর সে মন্ত্র সাধন।
ত্যাগ কর পুত্র পরিবার,
দূর কর বিষয়-বাসনা,
যতদিন না পার করিতে,
এই মহা ব্রত উদ্‌যাপনা।
যে দিন মহিমা বেদীপরে
স্থাপিবে মায়ের সিংহাসন,
প্রতিষ্ঠিবে দশভুজা রূপে,
হবে তবে ব্রত উদ্‌যাপন।
কি অদ্ভুত মাতৃভক্তি এই,
শিখাইলে মা-সোহাগী ছেলে!
কিবা মহা পূজা আয়োজন,
ল'য়ে মা'র সন্তান সকলে!
"বন্দে মাতরং" মন্ত্র-বলে
করিল যে শক্তি আবাহন,
কাল-গর্ভে সেই শক্তি-বলে
যেই বীজ হইবে বপন ; —
অহ দূর ভবিষ্যৎ-পটে,
বঙ্গ-ভাগ্য কর বিলোকন,
দেখিবে সে বীজ অঙ্কুরিত,
ফল তার অনন্ত জীবন!

কালের ভবিষ্য রঙ্গভূমে,
হবে যে নাটক-অভিনয়,

প্রতিভা দেখালে ছায়া তার,
যোগবল করিয়া আশ্রয়।
এস ভাই বঙ্গের সন্তান!
ওই মন্ত্র করিয়া গ্রহণ,
করি যত্ন—সেই ভবিষ্যৎ
করিতে নিকটে আনয়ন!
প্রতিভার এ মাতৃ-পূজায়,
এস সবে করি যোগদান,
হবে না হবে না অন্যরূপে,
জননীর মঙ্গল সাধন।

এ অদ্ভুত প্রতিভার তরে,
এস পাতি রত্ন-সিংহাসন,
এস ভাই সকলে মিলিয়া,
করি তার পূজা আয়োজন।
এ যে নর-দেবতার পূজা,
প্রতিভার বিহিত সম্মান,
এ পূজার তরে এস সবে,
করি "বন্দে মাতরং" গান।
এ পূজার ফলে অবহেলে,
মাতৃভক্তি করিব অর্জন,
বুঝিব ধর্মের গূঢ় কথা,
মনুষ্যত্ব করিব সাধন।

১৯

বঙ্কিম বিয়োগ

[বামাবোধিনী পত্রিকায় ১৩০১ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৪ জুন) সংখ্যায় এই 'বামারচনা'টি প্রকাশিত। কবিতার শেষে কবির নাম স্বাক্ষরিত 'শ্রীমতী গিরিবালা'। এই সংখ্যায় বঙ্কিমবিষয়ক আরো কবিতা আছে। এখানে গিরিবালা দাসীর লেখা 'বঙ্কিম বিয়োগ' শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত হল।]

শুয়েছে শ্মশানে নাকি মুদিয়া নয়ন
সুকবি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের ধন!
কবির লাগিয়া আজি প্রতি ঘরে ঘরে
ভাসে শোকে বঙ্গবাসী নয়নের নীরে ॥

অস্তমিত হ'ল হায়! কবির জীবন,
নিবিল সুবর্ণ দীপ জন্মের মতন ॥
বাঙ্গালা সাহিত্য আজি হইল রে দীন,
ভারতবাসীর প্রাণ হ'ল অর্ধক্ষীণ ॥
বঙ্গমাতা দুঃখে আজি ফেলে অশ্রুধারা,
হারায়ে সে পুত্রবরে পাগলিনী পারা ॥
কে আর ছড়াবে মধু মধুর সে বোলে,
বসন্ত রাগিণী রাগ ভাসায়ে দুকুলে ॥
শেফালিকা যুঁই যাতি কতই ফুটিত।
মধুর বহিয়া বায়ু মধু ছড়াইত ॥
বিরহ মিলন মধু বঁধুর সে প্রাণ,
এক সুরে গেছে গেয়ে কবির সে গান ॥
জুড়াত মানব প্রাণ নব কল্পনাতে,
আনি দিত ধরা পরে স্বর্গ হাতে হাতে।
যে মধু ছড়ায়ে কবি গেছে ফুলে ফুলে,
রয়ে যাবে চির দিন অনন্তের কোলে ॥
বিষবৃক্ষে ফুটিয়াছে সূর্যমুখী ফুল,
ম্লানমুখী কুন্দকলি সৌন্দর্যে অতুল ॥
করেছিল বনমাঝে কুটিরেতে আলা,
স্নেহের পালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলা ॥
না ফুটিতে মনোরমা খসিল মুকুল,
ভিখারিণী গিরিজায়া হাসিয়া আকুল ॥
ভ্রমররূপিণী বালা ভ্রমরার প্রেম।
মণিতে জড়িত যেন সমুজ্জ্বল হেম ॥
একবৃন্তে দুটি ফুল দেখায়েছে কবি।
প্রতাপের ভালবাসা—শৈবলিনী ছবি ॥
কবির কবিত্ব হৃদি বহিছে ধরায়,
প্রেমের সৌন্দর্য ছবি মাধুর্য ছড়ায় ॥
কখন গাম্ভীর্যভাব, কখন নবীন।
ধর্মেতে গঠিত হৃদি কখন প্রবীণ ॥
লোকেরে হাসায়ে গেছে রহস্য কথায়,
এমন রসের কবি দেখিনে কোথায় ॥
তেত কটু কসা মিঠা জগতের কাছে।
অম্বল মধুর রস ছড়ায়ে গিয়াছে ॥

কাঁদরে ভারত মাতা কাঁদ অনিবার।
গিয়েছে তোমায় ছেড়ে বঙ্কিম কুমার ॥
আর কি পূরাবে এসে কেহ তাঁর স্থান।
বাড়াও তাঁহার খ্যাতি কবির সম্মান ॥
গাওরে ভারত তুমি চিরদিন তরে,
সুকবি বঙ্কিম নাম জগতের পরে ॥

২০

কেন কাঁদ

[কবিতার রচয়িতা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গের স্বনামধন্য কবি, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্বর্গের অন্যতম। বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকেই হেমচন্দ্র ছিলেন পত্রিকার নিয়মিত লেখক। বস্তুতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে হেমচন্দ্রই ছিলেন তাঁর কালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। এজন্য কবি নবীনচন্দ্র সেনের বেশ অভিমান ছিল। বঙ্গদর্শনের যুগের গোড়াতেই মধুসূদনের তিরোধান ঘটে। বঙ্গদর্শনে ১২৮০ ভাদ্র, ১৮৭৩ আগস্ট সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন 'বঙ্গদর্শন-সম্পাদক' স্বাক্ষরে। এই নিবন্ধের সঙ্গে হেমচন্দ্রের রচিত একটি স্মরণ-কবিতা ও নবীনচন্দ্রের লিখিত একটি স্মরণ-কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতা দুটির শেষে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, "কিন্তু 'বঙ্গকবি সিংহাসন' শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা রোদন করিব না।" যেন বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথার রেশ টেনেই ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে রোরুদ্যমান দেশবাসীর প্রতি হেমচন্দ্রের বক্তব্য 'কেন কাঁদ?' বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর একখানি সুন্দর ছবি ছাপিয়ে 'সখা' পত্রিকা লেখেন : "প্রতিদিন কত লোকের মৃত্যু হয়,—মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনেরাই তাহার জন্য কাঁদিয়া আকুল হয়, অন্য কেহ তাহার বড় সংবাদ রাখে না। কিন্তু এক এক জন লোকের মৃত্যুতে একেবারে দেশময় হাহাকার পড়িয়া যায়। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেশের লোক কাঁদিয়া আকুল হয়, আত্মীয় স্বজনের হাহাকারের সঙ্গে দেশের লোক হাহাকার করিতে থাকে ; যে কখনও চক্ষে দেখে নাই, সেও কাঁদে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে, দেশে আজ এমনি হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, দেশের লোক এমনি করিয়া কাঁদিতেছে!" হেমচন্দ্র তাঁর কবিতায় দেশের লোককে ডেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—কেন কাঁদো? বঙ্গদর্শনে এই হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা লিখেছিলেন বলে বঙ্কিমকে কি আর-পাঁচজনের কাছ থেকে কম বিরুদ্ধ-মন্তব্য শুনতে হয়েছিল? বৃত্রসংহারের তৃতীয় সর্গের একটি ছত্র : 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।' এই ছত্রটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সপ্রশংস মন্তব্য ছিল, "ইহা প্রথম শ্রেণীর

কবির উক্তি—মিলটনের যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্য মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।"
হেমচন্দ্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এতখানি প্রশংসায় নবীনচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই বেশ ঈর্ষাকাতর হয়েছিলেন, কেউ কেউ বা কিছু ক্ষুব্ধও। সেই ক্ষোভের প্রকাশ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'বঙ্গীয় সমালোচক' গ্রন্থেও স্পষ্ট দেখা যায়।

এমন যে অন্তরঙ্গ কবি হেমচন্দ্র, তিনি তাঁর প্রিয় সুহৃদ্ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানে শোকাহতচিত্তে কেমনতর কবিতা রচনা করেছিলেন দেখা যাক।]

এক

বহিল বসন্ত অনিল বঙ্গেতে
আহা কি মধুরতর!
বাজিল বাঁশরী বঙ্কিম অধরে
কি সুন্দর মনোহর!
কল্পনা-প্রসূত প্রসূন কতই
স্বর্গের সুষমা ধরি,
ফুটিতে লাগিল অতুল ছটায়
বঙ্গ প্রাণ মন হরি।
উল্লাসে উৎসাহে মাতিয়া উঠিল
বঙ্গ নরনারীগণ।
ছিল মরুময় বঙ্গের সাহিত্য
হল সে নিকুঞ্জবন!

দুই

যাদুকর যেন কৌশলে দেখায়
কতই বিচিত্র ছবি
তেমতি বিচিত্র চিত্র নব নব
ভাষায় আঁকিল কবি।
প্রতিভা-ছটায় অপূর্ব শোভায়
গাঁথিয়া ঘটনাবলি,
নভেলে'র ছলে নব রসে খেলে
করে কত চতুরালি!

কখন(ও) হাসায়   কখন(ও) কাঁদায়
কখন(ও) আশায় ছলে,
মাতাইয়া প্রাণ   গায় বীরগান
'বন্দে-মাতরং' ব'লে ॥

তিন

কভু ধর্মসার   কভু কর্মভার
নিগূঢ় তত্ত্বের কথা—
বাখানে সুচারু   সরল ভাষায়
ধরিয়ে নূতন প্রথা।
বাখানে আবার   ইতিহাসবাণী
ভারত নির্ঘণ্ট করি—
কিবা অকলঙ্ক   পূর্ণ নরদেব
ভারত কাণ্ডারী হরি।
নাহিক এমন   সাহিত্য ভাণ্ডার
সুদৃষ্টি ছিল না যায়,
একা ছিল এক   সহস্র জিনিয়া
ধীরেন্দ্র বীরেন্দ্র প্রায়।

চার

কোথা আজ তুমি   কোথা সে তোমার
জ্ঞান পারিষদ যত,
গেলে কি ছাড়িয়া   প্রিয় জন্মভূমি
পূরণ না হতে ব্রত?
কে পারিবে তব   রাজদণ্ড নিতে
তিলক ধরিতে ভালে?
তোমার মতন   সাধক রতন
পাব আর কত কালে?
বিহনে তোমার   করে হাহাকার
বঙ্গ নর নারী আজ,
হে বঙ্গভূষণ   প্রিয় অতুলন
বঙ্গের সাহিত্য-রাজ।

পাঁচ

ধন্য ক্ষণজন্মা জনমিলে ভাই
আজন্ম দুখিনী কোলে
ভুলালে বঙ্গের নর নারীগণে
অমিয়া মধুর বোলে ;—
গেলে কীর্তি রাখি চিরদিন তরে
এ ভারত মহীতলে!
দিয়ে জীবদান বাঙ্গালীর দেহে
জ্বালাইলে শিখা তায়,
জাগ্রত করিয়া বঙ্গ নারী নরে
ভাতিলে নব বিভায়।
আপনি গঠিলে আপনার দল
সোদর সদৃশ প্রেমে,
শত ডোর দিয়া হৃদয়ে বাঁধিলে
কত রবি চন্দ্র হেমে!

ছয়

সে মলয়ানিল সহসা থামিল
ফুরাল বঙ্কিম-আয়ু,
সমূহ বাঙ্গালা কাঁদিয়ে আকুল
যেন হারা প্রাণ বায়ু!
কেন কাঁদো বঙ্গ এ প্রাণীর তরে
এঁর যে মরণ নাই,
ধরার বিজলি এ জীবমণ্ডলী
এ নহে এঁদের ঠাঁই!
যে দেবমণ্ডলে মহাপ্রাণী দলে
জ্বলে চির জ্যোতির্ময়,
হের কি শোভায় সেই দেবধামে
বঙ্কিম উদয় হয়!
পেয়ে যাঁর সঙ্গ পবিত্র এ বঙ্গ
গাও তাঁর চির জয়।

পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের শততমবর্ষে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক কবিতার শেষ ছত্র দুটি উদ্ধৃত করে বলি : বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি,/তাই তব করি জয়ধ্বনি।